প্রেরণার বাতিঘর

শহীদ আবদুল মালেক স্মরণিকা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

প্রেরণার বাতিঘর

শহীদ আবদুল মালেক স্মরণিকা

প্র কা শ না য়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

www.icsbook.info

প্রেরণার বাতিঘর

শহীদ আবদুল মালেক স্মরণিকা

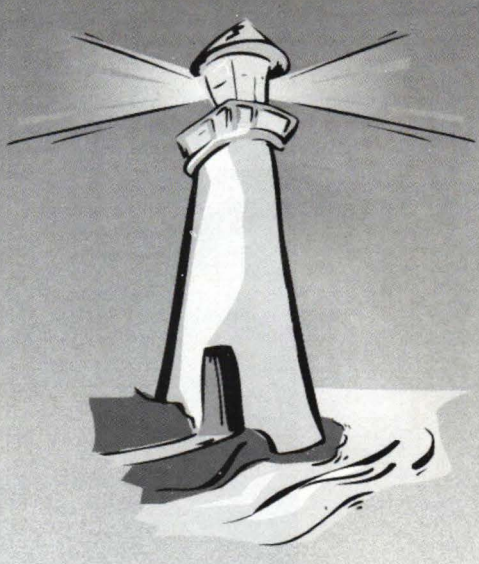

উপদেষ্টা পরিষদ

আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের
মীর কাসেম আলী
অধ্যাপক এটিএম ফজলুল হক
অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান
নূরুল ইসলাম বুলবুল

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি

মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান

প্রধান সম্পাদক

মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূইয়া

সম্পাদক

মিয়া মুহাম্মদ তরুন

সম্পাদনা সহযোগী

মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন
মাকসুদুল হক কানন
শেখ মাহাবুব রহমান
মুহা: রফিকুল ইসলাম
এস.এম. নূর-ই-ইলাহী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

ফরিদী নুমান

আলোকচিত্র

মোস্তাফিজুর রহমান নোমানী

গ্রাফিক্স

বুরহান জামান
ডিজিটাল ক্যানভাস, ঢাকা
ফোন : ৯০১৬৬১৪, ০১৮২১৯৩৪৫

মুদ্রণ

মাসরো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লি:
ফোন : ৮৮১৭৫৩২

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০০২

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা
ফোন : ৮৬১৭৩৯২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬৯ টাকা

www.icsbook.info

উৎসর্গ

শহীদ আবদুল মালেকের
সেই সব চিরঞ্জীব
উত্তরসূরীদের প্রতি,
যাদের সতেজ রক্ত
অত্যাসন্ন বিপ্লবের
প্রেরণা জোগায়
লক্ষ তরুণের
সাহসী হৃদয়ে

www.icsbook.info

কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত .....

শহীদ আবদুল মালেক একটি ইতিহাস। সে ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা **'প্রেরণার বাতিঘর'** প্রকাশ করছে। আনন্দের বিষয়তো বটেই, এটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের আনাচে কানাচে শহীদ আবদুল মালেকের নিরব কর্মতৎপরতার উজ্জ্বল ইতিহাস আজ ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর প্রেরণার এক সজীব উৎস।

শহীদ মালেক শুধু তুখোড় ছাত্রই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মী পুরুষ, তাঁর লেখনীও ছিল ক্ষুরধার। কিন্তু সকল কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ছাত্রসংঘের অফিস। স্রষ্টার পরম সান্নিধ্যের অনিবার্য আকর্ষণে ইসলামী আন্দোলনকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি পিছিয়ে থাকেননি। আর এই সকল কাজের মাঝেই অনুপম সমন্বয় সাধন করেই প্রজ্জ্বোল হয়ে ওঠেন আমাদের প্রিয় মালেক ভাই। আজ আন্দোলন ও পড়াশুনার মাঝে সেই সুষম সমন্বয় গড়ে তোলাই হবে শহীদ মালেকের উত্তরসূরীদের যোগ্যতার পরিচয়।

শহীদ আবদুল মালেক আমাদের শিখিয়েছেন জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞায় সজ্জিত হতে। বাতিলের সর্বপ্লাবী সয়লাবের সমুদ্রে এ অস্ত্রই হতে পারে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কর্মপ্রচেষ্টার তাৎক্ষণিক ফল তাঁর কাম্য ছিল না। তবে তিনি হতাশাবাদীও ছিলেন না। অবিচল ধৈর্য্যের সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সর্বোপরী তিনি শিখিয়েছেন মিথ্যার প্রতিবাদ করতে। সত্যের উচ্চারণে জীবন যে কত মূল্যহীন তা নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন শহীদ আবদুল মালেক।

জ্ঞান, যুক্তি আর আর্দশের যুদ্ধে যারা পরাজিত তারা অস্ত্র, সন্ত্রাস আর হত্যার পথ বেছে নেয়। অসত্যাশ্রয়ীগণ তাই সন্ত্রাসের মাধ্যমে আবদুল মালেকের কণ্ঠ ও মিশনকে চিরতরে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আবদুল মালেককে তারা হত্যা করেছে ঠিকই, কিন্তু আবদুল মালেকের লক্ষ উত্তরসুরীরা আজ সেই মিশন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর এই শাহাদাত বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের জন্য এক আলোক মশাল, এক অনাগত বিপ্লবের অগ্রিম সুসংবাদ। তাঁর রক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে কালেমার নিশান উড়ার এক সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

এই সংকলন শহীদী রক্তের স্পন্দন জাগাবে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর হৃদয়ে সেই প্রার্থণা জানাই মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে।

পরিশেষে আমি এ সংকলনটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

নূরুল ইসলাম বুলবুল
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

সভাপতির বক্তব্য

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

শহীদ আবদুল মালেক নিকষ কালিমা ভরা আকাশে এক ধ্রুব তারার নাম। মালেকের সাথীরা তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমরা সাহাবীদের দেখিনি কিন্তু আবদুল মালেক ভাইয়ের অনাড়ম্বর জীবন যাপনের দিকে তাকালে সাহাবীদের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে ভেসে উঠতো।'

আলহামদুলিল্লাহ সেই কীর্তিমান পুরুষের জীবন ও কর্ম নিয়ে এই স্মরণিকা **প্রেরণার বাতিঘর** আমাদের বহুদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

মালেক ভাই ছিলেন তুখোড় মেধাবী ছাত্রনেতা। তাঁর শাহাদাতও হয়েছে মেধা বিকাশের সঠিক পন্থা আবিষ্কার করা তথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। শহীদ আবদুল মালেক ১৯৬৯ এর ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিপা আয়োজিত মুক্ত আলোচনা সভায় Milton প্রদত্ত শিক্ষার সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করে বলেন, 'Harmonious development of body, mind and soul কখনো কোন আদর্শের ভিত্তি ছাড়া হতে পারে না।' এই উন্নয়ন যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে হবে সে অনুযায়ী শিক্ষিত সমাজ সংশ্লিষ্ট আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটায়।

Oxford Dictionary প্রদত্ত অর্থানুযায়ী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানার্জন করা। আমরা মনে করি একটি সভ্য জাতি গঠনের জন্য সেই জাতির শিক্ষার ভিত্তি ইসলামী মূল্য বোধের উপর গড়ে ওঠা উচিত। তা না হলে মানুষের সমাজ হয়ে যায় Brutal Society. আমাদের সমাজের মানিক, বাঁধন-রাসেল, অফিসগামী কর্মকর্তার দিগম্বর হয়ে যাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে নামাজী ছাত্রদের নির্যাতন তার-ই বাস্তব প্রমাণ।

এ কথাগুলোই বলতেন শহীদ আবদুল মালেক তাঁর কথায় ও লেখনীতে। মালেক ভাইয়ের সেদিনের সেই দুঃসাহসী ঘোষণা আজো ইথারে ভাসছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার প্রিয় ক্যাম্পাসের ছাত্রদেরকে ইসলামের দিকে আমার ডান হাত দিয়ে ডাকবো, ইসলামের শত্রুরা যদি আমার ডান হাতটি কেটে ফেলে তাহলে বাম হাত দিয়ে ডাকবো। ওরা যদি আমার বাম হাতও কেটে ফেলে দুটো পা দিয়ে হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে ডাকবো। ওরা যদি আমার দুটো পাও কেটে ফেলে তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই ক্যাম্পাসের প্রতিটি ছেলেকে ইসলামের দিকে ডাকবো। ওরা যদি আমার চলার গতিকেও স্তব্ধ করে দেয় তাহলে আমার যে দুটি চোখ বেঁচে থাকবে সে চোখ দুটি দিয়ে হলেও ছাত্রদেরকে ইসলামের প্রতি ডাকবো। আমার চোখ দুটিকেও যদি ওরা উপড়ে ফেলে তাহলে হৃদয়ের যে চোখ রয়েছে তা দিয়ে হলেও আমি আমার জীবনের শেষ গন্তব্য জান্নাতের দিকে তাকিয়ে থাকবো।"

শহীদ মালেকের রেখে যাওয়া সে কাজ আমার, সে কাজ আমাদের সকলের। সচেতন ছাত্রসমাজের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আসুন মালেক ভাইয়ের সেই অকুতভয় বিপ্লবী ঘোষণার সাথে কণ্ঠ মিলাই–তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকেরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না।'

মু: জাহিদুর রহমান
সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

www.icsbook.info

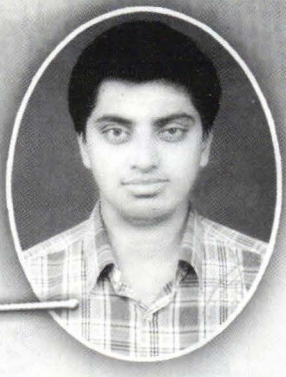

প্রধান সম্পাদকের কথা

ষাটের দশক। যুব সমাজ মুক্তির অন্বেষায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদসহ সকল মানব রচিত জীবন ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনসহ অনেক দেশেই সমাজতন্ত্র অথবা কম্যুনিজম চাপিয়ে দেয়া হল শত-সহস্র বনি আদমের লাশের স্তুপের উপর। মুসলিম বিশ্বের কিছু কিছু নব্য জাহেল তখন প্রগতিশীলতার নামে আল্লাহর বিধানকে দূরে সরিয়ে এইসব মন্ত্র-তন্ত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

শাহজালাল-শাহ মাখদুম আর হাজী শরীয়তুল্লাহর পবিত্র স্মৃতিধন্য শ্যামলিমা এই জনপদের গর্ব, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তখন সেই অশুভ শক্তির ছোঁয়া লাগে। দশতলা আর গাছতলার প্রভেদ গুছানোর মুখরোচক বুলি বাজারে ছেড়ে দেয়া হল। সাম্যবাদ আর সমাজতন্ত্রের বক্তৃতার খই ফুটিয়ে আবহমান বাংলার মুসলিম ঐতিহ্যে লালিত ছাত্র-তরুণ-যুব সমাজের ঈমান আকীদা ও দৃষ্টিভংগীকে নাস্তিক্যবাদ, উচ্ছৃংখলতা, বেলেল্লেপনা আর সর্বহারা মতবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন চলছিল। পবিত্র ইসলামসহ সকল ধর্মের বিরুদ্ধে না জেনে, না বুঝে, বিষোদগার ছড়ানো হচ্ছিল। গোয়েবলসীয় কায়দা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হচ্ছিল ছাত্রসমাজ। আবেগের বশীভূত হয়ে তারা উইপোকার ন্যায় জাহান্নামের আগুনে আত্মহুতি দিচ্ছিল।

মিথ্যার এই প্রবল স্রোতে বৃহত্তর ছাত্রসমাজ যখন জাহান্নামের মোহনায় মিলিত হচ্ছিল তখন হেরার রশ্মি তথা আল কুরআন হাতে নিয়ে প্রচন্ড হিম্মত নিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল একটি তরুণ; আর বলতে লাগল-'হে তরুণ মুক্তি চাও কি? আল কুরআন তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

কে এই মানব? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ন বিভাগের সেরা ছাত্র ও ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের ঢাকা শহর সভাপতি। আবদুল মালেক নামতাঁর। মেধা, যোগ্যতা, সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চারিত্রিক মাধুর্যে যিনি ছিলেন অনুপম, অনুকরনীয় ও আকর্ষণীয় তাঁরই পদচারণায় খুবই অল্প সময়েই প্রভাবিত ও সুরভিত হতে লাগল ক্যাম্পাস। সঞ্জীবনী ফিরে পেতে লাগল মৃত প্রায় ক্যাম্পাস। মাত্র কয়েক মিনিটের বক্তৃতায় ইসলামী শিক্ষার যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে। আদর্শ ও যুক্তির যুদ্ধে পরাজিত হায়েনারা বেছে নিল সন্ত্রাস। ওরা ভেবেছিল এই তরুণকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেই বুঝি সেই আদর্শ মুছে যাবে।

ওদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আবদুল মালেকের শাহাদাতের প্রভাব পড়েছিল ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই জনপদসহ সারা দুনিয়ায়। বিবেকের তাড়নায় ঘাতকদের প্রতি নিন্দাবাদ ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি ছাত্র-শিক্ষক ও সুধীসমাজ; উপরন্তু দীক্ষিত হতে লাগল এই মহামন্ত্রে। এক শহীদের রক্তের বদলায় আজ লক্ষ-কোটি তাজা প্রাণ সেই আদর্শের বাহক।

আল-কুরআন তথা ইসলামের নিশান বরদার আবদুল মালেকের সাথীরা আজ নিজেদেরকে গড়ে তুলতে চায় প্রিয় নেতার ছাঁচে। ইসলামী শিক্ষা দিবস ও শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'প্রেরণার বাতিঘর' শীর্ষক এই স্মরণিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সেটাই। কোন ব্যক্তির বন্দনা এক্ষেত্রে উপেক্ষনীয়। শহীদদের জন্য কোন স্মারক প্রয়োজন নেই। তারা শুধু আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা কামনা করেন। শহীদের যোগ্য উত্তসূরী হিসেবে তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ যেন আঞ্জাম দেয়া যায়, মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে সেই মিনতি জানাই।

www.icsbook.info

সম্পাদকীয়

১৯৯৯ সালের সদস্য সম্মেলনে জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের তৎকালীন নাজেমে আ'লা মোস্তাক আহমদ ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়। প্রথম পরিচয়েই তিনি মালেক ভাইয়ের কথা জানতে চাইলেন এবং বললেন–আমি তাঁর বাড়ি ও কবরের পাশে যেতে চাই। আমি তাঁর দু'চোখে আবেগ প্রত্যক্ষ করলাম এবং সংক্ষেপে বললাম, আপনি তাকে কিভাবে চিনেন? বললেন–তিনি তো আমাদের নেতা, প্রেরণার উৎস; পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের প্রত্যেকের অতি পরিচিত আপনজন। তখন থেকে মালেক ভাইকে বিশেষভাবে জানার তাড়না বোধ করি। এরপর তাঁর জীবনের যে অংশটুকুই জেনেছি; মনে হয়েছে একটুতো সমস্ত জনশক্তিরই জানা দরকার।

এ বছর প্রথম দিকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনশক্তিদের বিশেষভাবে তৈরীর তাগিদ যখন অনুভূত হয়; তখনই শহীদ আবদুল মালেকের কীর্তিময় জীবন উপস্থাপনের প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাবনা আসে তাঁর শাহাদাত দিবসে একটি স্মরণিকা অথবা সেমিনার করার। কিন্তু সদস্য ভাইয়েরা একই সাথে দু'টোকেই বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন। যথারীতি কয়েকটি বিভাগে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একাজ বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলদের অভূতপূর্ব তাগিদ ও পেরেশানী প্রত্যক্ষ করেছি। তারা অসংখ্যবার ফোন আর যাতায়াত করে লেখা, দূর-দূরান্ত থেকে সাক্ষাৎকার, বহু পুরনো নথিপত্রের স্তূপ ঘেটে ছবি, ডকুমেন্ট আর পরীক্ষার ব্যস্ততার মাঝেও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছেন। আর এরকম নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কারণে স্মরণিকাটি তথ্যবহুল ও সুদৃশ্য হয়েছে।

এ উদ্যোগের কথা যারাই শুনেছেন তারাই উৎসাহ যুগিয়েছেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। বিভিন্নভাবে এ স্মরণিকার সাথে যারাই সংযুক্ত হয়েছেন সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

মুসলিম বিশ্বসহ সারা দুনিয়ায় মানুষের সমাজ ও ব্যক্তি জীবন চরম সংকট অতিক্রম করছে। নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তি ছাড়া এ সঙ্কট উত্তোরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। ইসলাম তথা ইসলামী শিক্ষাই পারে মানুষের মধ্যে সেই ভিত রচনা করতে। আর তাই আমরা আজ আবারো শহীদ আবদুল মালেকের সে দাবীই উচ্চকিত করছি- ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই হবে বাংলাদেশের একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা।

শহীদ শাহ মখদূম, শহীদ তিতুমীরের রক্তস্নাত এ পূণ্যভূমিতে পূর্ণ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে আরো কিছু মালেক প্রয়োজন। শহীদ আবদুল মালেকের জীবন পঠনে সে সকল মালেক বেরিয়ে আসুক এ আমাদের প্রত্যাশা।

অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আশা করা যায় স্মরণিকাটি সম্পূর্ণতার দিকে যেতে পারবে। পরিশেষে এটি প্রকাশিত হতে পারায় মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

সম্পাদক

www.icsbook.info

সূচীপত্র

বিশেষ রচনা

• শহীদ আবদুল মালেক –অধ্যাপক গোলাম আযম : ৯
• শহীদ আবদুল মালেক ও তৎকালীন পরিস্থিতি –মুহাম্মদ কামারুজ্জামান : ১৭ • শহীদ আবদুল মালেক : আমাদের অনুপ্রেরণা –নূরুল ইসলাম বুলবুল : ২৩ • বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব ও শহীদ আবদুল মালেক –মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম : ২৯
• নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন –মোশারফ হোসেন মাসুদ : ৩৯

প্রবন্ধ

• ইসলামী শিক্ষার ক্রমবিকাশ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ –ড. এম. আতাউর রহমান : ৪১ • Islamic Education Movment : Recent History and Objectives –Shah Abdul Hannan : ৫৫ • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস –ওবায়দুল হক সরকার : ৬১ • Islamization of Education in the Primary and the Secondary Levels in the Perspective of Bangladesh –Sk.Sobdar Ali : ৬৯
• ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : বাংলাদেশের অনিবার্য বাস্তবতা–মুহাম্মদ আবদুল আজিজ : ৭৩

শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া

• একটি কলঙ্কজনক ঘটনা (দৈনিক আজাদ ১৮ আগস্ট ১৯৬৯) : ৮২ • একটি উদ্বেগজনক ঘটনা (দৈনিক হুরিয়াত) : ৮৩ • শুভবুদ্ধির জয় হউক (দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ আগস্ট ১৯৬৯) : ৮৪ • আবদুল মালেক (দৈনিক পাকিস্তান) : ৮৫ • বিবাদ নয়, ঐক্যমত গঠন করুন (দৈনিক সংবাদ) : ৮৫ • আবদুল মালেক শহীদের 'অপরাধ' (দৈনিক মাশরিক) : ৮৬
• আবদুল মালেক শহীদ, একটি নতুন প্রভাতের বার্তাবহ (দৈনিক নেদায়ে মিল্লাত) : ৮৭ • একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা (দৈনিক জং) : ৮৭ • ঢাকার বিয়োগান্তক ঘটনা (দৈনিক নাওবায় ওয়াকত) : ৮৯ • ঢাকার রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা (দৈনিক ভেফাক) : ৯০ • গুরুতর দুর্ঘটনা (দৈনিক ভেফাক) : ৯১ • আলোর দিশারী (দৈনিক জং) : ৯২ • খাঁটি শহীদ (ইয়ং পাকিস্তান) : ৯৩ • আবদুল মালেক শহীদ (সাপ্তাহিক চাটান) ৯৩ • ওদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে হবে (সাপ্তাহিক জাহানে নও) : ৯৪ • ইসলামের এক শহীদ (মাসি উসওয়া) : ৯৪ • এ সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে (মাসিক পৃথিবী) : ৯৫

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

• আদর্শ জীবন : ১০২ • প্রত্যয়ের আলোকে আমাদের জীবন
• মধ্যপ্রাচ্য : বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ক্রীড়ামঞ্চ : ১০৭
• সিরিয়ায় আবার সামরিক বিপ্লব : ১১২ • নাইজেরিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিণাম : ১১৫ • মধ্যপ্রাচ্য : বৃহৎ চতুঃশক্তির বৈঠক : ১২০ • সামরিক জান্তার কবলে সুদান : ১২৫ • দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি : ১৩০ • ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা : ১৩৫

স্মৃতিচারণ

• আমার প্রিয় সাথী –মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী : ১৫২ • মালেক ভাইকে যেমন দেখেছি –ড. এ. জামান : ১৬১
• আবদুল মালেক এবং আমি –ইঞ্জিনিয়ার ইসকান্দার আলী খান : ১৬৩ • শহীদ আবদুল মালেক : ক্ষণিকের স্মৃতি : ১৬৫

সাক্ষাৎকার

• আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ : ১৬৭ • আবু নাছের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের : ১৭১ • মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম : ১৭৩ • অধ্যাপক ফজলুর রহমান : ১৭৬ • আবু শহীদ মোহাম্মদ রুহুল : ১৭৯ • মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী : ১৮১ • মুহাম্মদ আবদুর রকিব : ১৮৩

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিদের অনুভূতি

• মীর কাশেম আলী : ১৮৫ • মুহাম্মদ কামারুজ্জামান : ১৮৫
• মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের : ১৮৬ • এনামুল হক মঞ্জু : ১৮৬ • আহমদ আবদুল কাদের : ১৮৭ • সাইফুল আলম খান মিলন : ১৮৭ • মুহাম্মদ তাসনীম আলম : ১৮৭ • ডা: সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের : ১৮৮ • মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম : ১৮৮ • ডা: আমিনুল ইসলাম মুকুল : ১৮৯ • আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ : ১৮৯ • হামিদ হোসাইন আজাদ : ১৯০ • মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান : ১৯১ • মুহাম্মদ শাহজাহান : ১৯১ • মতিউর রহমান আকন্দ : ১৯১ • এহসানুল মাহবুব যোবায়ের : ১৯২

নিবেদিত কবিতা : ১৯৩

নিবেদিত গান : ২০৫

নিবেদিত গল্প

• পনরই আগস্টের গল্প –আসাদ বিন হাফিজ : ২১০ • তবে কি রক্তেই সমাধান – মুহাম্মদ মিজানুর রহমান : ২১৪

উত্তরসূরীদের কলম

• গন্তব্য খোকসাবাড়ি –মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভুঁইয়া : ২১৮
• শহীদ আবদুল মালেক, আমাদের প্রেরণা –আনোয়ার সাদাত : ২২৩ • শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে –এস.এম. নূর-ই-ইলাহী : ২২৫ • হৃদয়ে লেখা যার নাম –শরীফ ইবনে মান্নান : ২২৭ • শহীদ আবদুল মালেক, আমাদের পূর্বসূরী –মুহাম্মদ আনিসুর রহমান : ২২৯ • এক নজরে শহীদ আবদুল মালেক –ওমর আল ফারুক : ২৩১ • Abdul Malek, A Luminous Star –Md. Mofidul Alam : ২৩৪ • A Tribute to Saheed Malek –Belal Rashid Chowdhury : ২৩৬ • মালেক ভাইয়ের বাড়িতে যেভাবে যাবেন –মুহাম্মদ আবু রায়হান : ২৩৮ • শহীদ আবদুল মালেক, এক আলোর দিশারী –মাহমুদা বিনতে মুত্তালিব মুক্তা : ২৪০

সেমিনার

• প্রতিবেদন : ২৪২ • ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও শহীদ আবদুল মালেক –আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ : ২৪৮ • Islamization in Higher Education, An Integrated Approach –M. Zohurul Islam FCA : ২৬৫

বিবিধ

• বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে : ৯৯ • এক নজরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১০০ • শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের একটি ভাষণ : ১৩৮ • পত্রাবলী : ১৪০ • এপার থেকে ওপারে : ১৪৭ • শহীদ আবদুল মালেকের মায়ের কামনা : ১৫০ • স্মরণিকা উপ কমিটি : ২৭২ • শহীদ আবদুল মালেক স্মৃতি এ্যালবাম (রঙীন) : ২৭৩

www.icsbook.info

বিশেষ রচনা

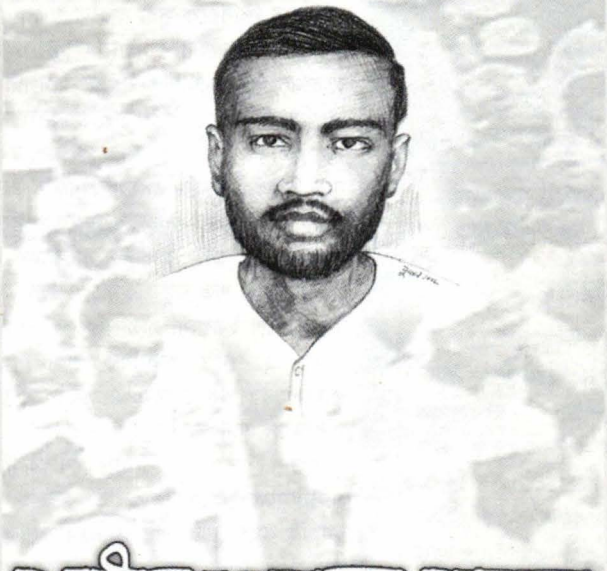

শহীদ আবদুল মালেক

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আমি 'শহীদি কাফেলা' বলে থাকি। এ দ্বীনি সংগঠনটি এ অভিধায়ই পরিচিত। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হিসেবে এখানে ইসলামের কাজ করতে গেলে শহীদ হবার কথা নয়। জনগণের ময়দানে যে সব ইসলামী দল আল্লাহর আইন কায়েমের আন্দোলন করছে তাদেরকে এমন ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না যেমন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে হতে হয়। এর কারণ এটাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ জনগণের পরিবেশ থেকে ভিন্ন।

দু'শ বছরের ইংরেজ শাসন ও পরবর্তীকালে ইংরেজদের তৈরি শোষকদের শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের অনেককেই ধর্মনিরপেক্ষ বানিয়ে ছেড়েছে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে যারা উগ্র তারাই সংগঠিত হয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে শিক্ষাঙ্গন থেকে উৎখাত করতে চায়।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের যুক্তির সামনে টিকতে না পেরে পেশী ও পশুশক্তির আশ্রয় না নিয়ে তারা শিবিরের মোকাবেলা করতে অক্ষম।

ইসলামী ছাত্রশিবির জ্ঞানচর্চা ও চরিত্র গঠনের আন্দোলন। ঐ ব্যাপারে এসব ছাত্র সংগঠন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবারই অযোগ্য। যে সব ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ক্ষমতার রাজনীতিতে লিপ্ত তাদের জ্ঞান চর্চা ও চরিত্র গঠনের কোন প্রয়োজন হয় না। সন্ত্রাসী পদ্ধতিতে হলে সিট দখল, হল দখল এবং বিশ্ববিদ্যালয় হল ও কলেজ ছাত্র সংসদ দখল

www.icsbook.info

ইত্যাদিই তাদের কর্মসূচী। আর ইসলামী ছাত্রশিবির নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠন, আন্দোলন ও নির্বাচনে বিশ্বাসী। তাই ঐ জাতীয় কোন ছাত্র সংগঠনই শিবিরকে সহ্য করতে পারে না।

পাকিস্তান আমলের শেষদিকে ১৯৬৯ সালে সন্ত্রাসী ছাত্রদের কাপুরুষোচিত নৃশংস হামলার শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেক শহীদ হন। তিনিই এদেশের শহীদি কাফেলার প্রথম শহীদ। যারা ইসলামী আন্দোলনকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা শহীদ হওয়াকেই সর্বোচ্চ সাফল্য মনে করে। তাই আবদুল মালেকের শাহাদাত ঐ সময়েই শত শত নতুন কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এ পর্যন্ত শতাধিক শহীদ হয়েছেন। এ শাহাদাতের পথ বেয়েই এ শহীদি কাফেলা মজবুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

এদেশের জনগণ এ পর্যন্ত যে কয়টি সরকারের শাসনামলের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাতে হতাশ হবারই কথা। চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থ শাসকের অভাবে মানুষ পেরেশান। দুর্নীতিমুক্ত শাসক কোথায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্ন সবার।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে চরিত্র ও সৎ লোক তৈরি হচ্ছে না। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর মাধ্যমে চরিত্রবান নেতৃত্ব সৃষ্টি করছে না।একমাত্র ইসলামী ছাত্রশিবিরই চরিত্র গঠনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই শিবিরের গড়া নেতৃত্বের উপরই জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। শহীদ আবদুল মালেকের উত্তরসূরী হিসেবে শহীদি কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের অগ্রগতি ও সাফল্যের উপরই বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এছাড়া আর কোন আশার আলো দেখা যায় না।

মঙ্গলবারের ঘটনা সম্পর্কে
গোলাম আজমের বক্তব্য
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম গত বুধবার এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছাত্র কেন্দ্রে গত মঙ্গলবারে সংঘটিত গোলযোগের জন্য 'ধর্ম' নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির সমর্থকদের দায়ী করেন এবং বলেন যে তাহারা ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার বিরুদ্ধে মন্তব্যের প্রতিবাদ জ্ঞাপনকারী ছাত্রদের উপর 'বর্বর হামলা' চালায়। তিনি তাহাদের নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "শিক্ষা নিঃসন্দেহে একটি প্রাদেশিক বিষয়; কিন্তু জাতীয় সংহতির স্বার্থে ইহা অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত হইবে। কাজেই আমি অবিলম্বে শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান

সূত্র : দৈনিক সংবাদ : ১৪ আগস্ট ১৯৬৯

শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের মূল্যায়ন

আবদুল মালেক তরুণ বয়সেই এমন এক উজ্জ্বল নজির রেখে গেছেন যা এদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে চিরদিন প্রেরণা যোগাবে। এতগুলো গুণ একজন ছাত্রের মধ্যে এক সাথে থাকা অত্যন্ত বিরল। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্র মহলে তার সুখ্যাতি সত্ত্বেও তার নিকট ছাত্রজীবন থেকে

www.icsbook.info

আন্দোলনের জীবনই বেশী প্রিয় ছিল। যথাসম্ভব নিয়মিত ক্লাসে হাজির হওয়াই যেন তার জন্য যথেষ্ট ছিল। পরীক্ষায় ভাল করার জন্য তার মধ্যে কোন ব্যস্ততা ছিলনা। ওটা যেন অতি সহজ ব্যাপার ছিল।

ক্লাসের বাইরে তাঁকে ইসলামী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন চিন্তাধারা বা আলাপ-আলোচনা করতে বড় একটা দেখা যেত না। তার সহপাঠী ও সহকর্মীরা তাকে পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করার দিকে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিলে মৃদু হেসে বলতেন, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ডিগ্রি নিতে হবে যাতে আয়-রোজগারের একটা পথ হয়। কিন্তু ওটাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বানিয়ে নিতে চাই না। খুব ভাল রেজাল্টের ধান্ধা করলে ক্যারিয়ার গড়ে তুলবার নেশায় পেয়ে বসবার আশঙ্কা আছে।

শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত সম্বন্ধে যে কথাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, এমন একটি পরিবেশে তিনি শাহাদাত বরণ করেন যেটা খুব রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিবেশ ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থা পাকিস্তানের এ সময়ে কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে টি.এস.সিতে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে বিতর্কে ইসলামের দুশমনেরা বিশেষ করে সমাজতন্ত্রীরা শিক্ষাব্যবস্থা সে আলোকেই করতে চেয়েছিল এবং মুসলমানদের এই দেশে বসে তারা এমন ধরনের কথা বলছিল যার প্রতিবাদ করা প্রত্যেকটা ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য ছিল। আবদুল মালেক সে সময় ইসলামী ছাত্র সংগঠনের ঢাকা শহরের দায়িত্বশীল ছিলেন। সে হিসেবে আবদুল মালেক ও তার সাথীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পর্যন্ত তাদেরকে দেয়া হচ্ছিল না। উদ্যোক্তারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে মনে হচ্ছিল এদেশটা মুসলমানদের দেশ নয় বরং কমিউনিস্ট দেশ। মালেক এবং তার সাথীরা বক্তব্য পেশ করার দাবী জানালো। শেষ পর্যন্ত তাকে বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুমতি দিতে বাধ্য হলো। কারণ, যুক্তির দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিতর্কের জন্য ডেকে কথা বলার সুযোগ দেবে না এটা সাধারণ ছাত্ররা পছন্দ করতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত কথা বলার সুযোগ দিল। যে কথা সেখানে আবদুল মালেক বললেন তা এতোই যুক্তিপূর্ণ ছিল যে তার বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হলো না। সাধারণ ছাত্রদের সামনে তার বক্তব্য এতটা প্রভাব বিস্তার করল যে, তাদের ঐ উদ্দেশ্য সফল হল না, যে উদ্দেশ্যে তারা অনুষ্ঠান করেছিল। যতদূর মনে পড়ে 'ডাকসু'র পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠান করা হয়েছিল অথবা ভিন্ন কোন সংস্থার পক্ষ থেকেও হতে পারে। তবে এটা আমার ভালো করেই মনে আছে যে এটার উদ্যোক্তা ও মঞ্চ নিয়ন্ত্রণ যারা করেছিল তারা ইসলামের দুশন ছিল। সভা শেষে যে যার মত চলে যাচ্ছে। সেখানে বিশেষ কোন

• • •

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে চরিত্র ও সৎ লোক তৈরি হচ্ছে না। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর মাধ্যমে চরিত্রবান নেতৃত্ব সৃষ্টি করছে না।একমাত্র ইসলামী ছাত্রশিবিরই চরিত্র গঠনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই শিবিরের গড়া নেতৃত্বের উপরই জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। শহীদ আবদুল মালেকের উত্তরসূরী হিসেবে শহীদি কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের অগ্রগতি ও সাফল্যের উপরই বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এছাড়া আর কোন আশার আলো দেখা যায় না।

• • •

www.icsbook.info

উত্তেজনাকর পরিবেশ ছিল না, যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আবদুল মালেকের সাথীরা তাকে একা যেতে দিত না বরং তারা একজোট হয়ে যেত। এই আলোচনার পর পরিবেশ এমন ছিল না যে সাধারণ ছেলেরা আবদুল মালেক বা তার সাথীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছিল, এমনকি যারা ক্ষিপ্ত হয়েছিল তারা তা প্রকাশ করারও সাহস পায়নি। সভা শেষে একাকী পথ ফিরছিল আবদুল মালেক। একা পেয়ে ছাত্র নামধারী একদল গুণ্ডা গিয়ে আক্রমণ করলো আবদুল মালেককে সে সময়কার রেসকোর্স ময়দানে (যেটা এখন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান)। নৃশংসভাবে তাকে তারা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করল। আরো কয়েকজন ছাত্রকে একা পেয়ে আক্রমণ করা হলো। এ সময় কোন উত্তপ্ত পরিবেশ ছিল না অথবা এমন কোন সংগ্রাম বা সংঘর্ষের পরিবেশও ছিল না যে কারণে এমন বর্বরোচিত আক্রমণ করা যেতে পারে। নিতান্ত যুক্তির ভিত্তিতে শহীদ আবদুল মালেক ও তার সাথীরা সেখানে তাদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন যেটা তাদের অধিকার ছিল দেশের নাগরিক হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে। কিন্তু যুক্তির মোকাবিলা করার মতো যুক্তি যাদের থাকে না তাদের শক্তি প্রয়োগ ছাড়া উপায় কি? তাই তারা শক্তি প্রয়োগ করে কাপুরুষের মতো একা পেয়ে তাকে হামলা করে মারাত্মকভাবে আহত করলো যার পরিণামে তাকে শাহাদাতবরণ করতে হলো। এর প্রতিক্রিয়া সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলনে যা হয়েছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে কোন আন্দোলনের কোন ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি যখন শহীদ হন তখন সে আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না বরং উল্টো সে আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে যায় এবং আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে যারা ভীরু এবং কাপুরুষ তারা পিছিয়ে যায়। আর যারা এ আন্দোলনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং ইসলামী আন্দোলনের স্পিরিটকে যারা বুঝে আগের চাইতে তারা আরো দ্রুত এগিয়ে যায়। তাছাড়া এ অবস্থায় আন্দোলনে নতুন নতুন লোকও এগিয়ে আসে। বাস্তবে এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো। আমি ঐ সময়ও কয়েক জায়গায় মন্তব্য করেছিলাম যে, এক আবদুল মালেককে শহীদ করে শত্রুরা শত শত আবদুল মালেক সাপ্লাই করেছে আন্দোলনে। এক আবদুল মালেকের শাহাদাতের ফলে আন্দোলন শত শত আবদুল মালেককে পেয়েছে যারা তার মতো মনে-প্রাণে শাহাদাত কামনা করে। এটা যে কোন আন্দোলনের জন্য সত্য আর ইসলামী আন্দোলনের জন্য আরো বেশী সত্য।

আমরা দেখেছি ওহুদের যুদ্ধের সত্তর জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। যদিও শাহাদাতের পেছনে তাদের একটি বড় ভুল ছিল। সে ভুল হলো নবী করীম (সা)

www.icsbook.info

যাদেরকে একটি বিশেষ জায়গায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অবস্থানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা জয় হয়ে গেছে মনে করে সে নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে দিলেন। এ ভুলের পরিণামেই যে এটা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, না হলে এত লোক হয়তো শহীদ হতো না। বস্তুত প্রথমে যুদ্ধে জয়ই হচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয়বরণ করতে হলো। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং অন্যান্যের হেফাজত করলেন। কিন্তু তাদের সত্তরজন শহীদ হয়ে গেলেন। এই শাহাদাতের পর থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোন যুদ্ধে এতো লোকের শাহাদাত বরণ করতে হয়নি। কারণ ঐ এক শাহাদাতের সময় তাদের মধ্যে এমন এক জযবা সৃষ্টি হয়েছিলো যে আমাদের এতো লোক শহীদ হলো যখন, তখন আমরা সবাই জান দিয়ে দেব। সবাই যখন জান দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তখন জানের কুরবানী বেশী দিতে হয় না। আর সবাই যখন জান দেয়ার জন্য প্রস্তুত না হয় তখন অনেককেই জান দিতে হয় অথচ আন্দোলনের অগ্রগতি হয় না। ওহুদের যুদ্ধের উদাহরণ থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে হযরত হামজা (রা) ছিলেন নেতৃস্থানীয় লোক যার শাহাদাতের কারণে নবী করীম (সা) অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং আন্দোলনে এটা তীব্র প্রভাব সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে আবদুল মালেকের মতো একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শহীদ হবার ফলে গোটা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি না হলে এতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো না।

এরপরও ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রসংগঠনকে আরো শাহাদাতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে, কিন্তু আবদুল মালেকের শাহাদাত আর পরবর্তী শাহাদাতের তুলনা করলে এটাই দেখি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শাহাদাতের ফলে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, ঐ ধরনের প্রতিক্রিয়া পরবর্তীদের ক্ষেত্রে হয়নি। আন্দোলন যখন শক্তি সঞ্চয় করেছে মাত্র তখন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শাহাদাত আন্দোলনের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটার সাথে তুলনা করা চলে হযরত হামজা (রা) এর শাহাদাত এবং এতে মুসলমানদের মধ্যে যে জযবা সৃষ্টি করেছিল, যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার সাথে। ইসলামে শাহাদাত একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার, একটা কামনার ব্যাপার। অন্যান্য আন্দোলনে কেউ যদি আন্দোলনের কারণে জীবন বিসর্জন করতে বাধ্য হয় তাহলে এটাকে ক্ষতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং যে মরে গেল, যে জীবন দান করলো তার জীবন দেয়ার কারণে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো এই মনোভাব থাকে। সে জীবিত থাকলে এটা করতে পারতো, সেটা করতে পারতো সর্বোপরি আফসোসটাই সেখানে বড় হয়ে দেখা হয়। এটা যে তার সৌভাগ্যের ব্যাপার, আল্লাহ যে তার শাহাদাতকে কবুল করেছেন, সে জযবা সেখানে পাওয়া যায় না। এই জযবা ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী আন্দোলনে যিনি শহীদ হলেন তিনি অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করলেন বলে মনে করেন আর অন্যরা মনে করে আমরা বঞ্চিত থেকে গেলাম, আমরা এই মর্যাদা পেলাম না, তিনি এ মর্যাদা পেলেন। ত্যাগ বা কুরবানী সব আন্দোলনের জন্য সাহায্যকারী এবং গতিদানকারী। কিন্তু এই কুরবানীতে প্রতিক্রিয়া সব ক্ষেত্রে সমান হয় না। ইসলামী আন্দোলনের কুরবানীর প্রতিক্রিয়া এভাবে হয় যে, যারা বেঁচে রইলো তারা নিজেদেরকে মনে করে আমরা বঞ্চিত হলাম এবং এ সাথে তারা আরো বেশী শহীদ হবার জন্য প্রেরণা লাভ করে। আন্দোলন থেকে তারা পালাবার চিন্তা করে না বরং আরো বেশী অগ্রসর হবার চিন্তা করে। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে, যারা শহীদ হতে পারলেন না তারা কি দুর্ভাগা? শহীদ হওয়াটা যদি সৌভাগ্য হয় আর শহীদ হতে না পারাটা যদি দুর্ভাগ্য হয় তা হলে এর ব্যাখ্যা কি? নবী করীম (সা) নিজেও শহীদ হলেন না ওহুদের যুদ্ধে, এবং বড় বড় সাহাবী হযরত আবু বকর (রা) , হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা)-এর মতো লোকেরা যারা পরবর্তীকালে ইসলামের বিরাট খেদমত করে গেছেন এবং তাদের খেলাফত আমলে রাসূলের আদর্শে ইসলাম কায়েমের নমুনা

www.icsbook.info

স্থাপন করে গেলেন, নবুওয়তের মানে খেলাফত চালিয়ে এতো বড় আদর্শ স্থাপন করে গেলেন তারাও ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হননি। তারা যদি শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে এই আদর্শ কি কায়েম হতো? তাহলে আমরা কি করে একথা বলতে পারি হযরত হামজা (রা) সৌভাগ্য লাভ করলেন শহীদ হয়ে ওহুদের যুদ্ধে, আর বড় বড় সাহাবীরা যারা পরবর্তীতে খলিফা হলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন বলে যাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাঁরা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেন? এজন্য এই বিষয়টাকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। কার ব্যাপারে তিনি শাহাদাতের ফয়সালা করেন আর কাকে গাজী বানিয়ে পরবর্তী সময়ে ইসলামী আন্দোলনের আরো বড় খেদমত নেবেন। এটা আল্লাহ তা'য়ালার এখতিয়ারে। এ ব্যাপারে এ ধারনা করা ঠিক হবে না যে, যিনি শহীদ হলেন তিনিই সৌভাগ্য লাভ করলেন আর অন্যরা বঞ্চিত হলেন। আল্লাহ যদি তাদেরকে শহীদ হিসেবে খেদমত নিতে চান তাহলে তাই নেবেন। আর শাহাদাতের জয্বা তাদের থাকা উচিত। আল্লাহ যদি তাদেরকে শহীদ হিসেবে খেদমত নিতে চান তাহলে তাই নেবেন। আর যদি গাজী বানিয়ে পরবর্তীকালে আরো বড় খেদমত নেবার জন্য আগ্রহ পোষণ করেন তাহলে তাই করতে পারেন। সেজন্য যারা শহীদ হলেন না তার জন্য হীনমন্যতা পোষণ করা ঠিক নয়, নিজেদেরকে দুর্ভাগা মনে করা ঠিক নয় তবে শাহাদাতের জয্বা তাদের মধ্যে থাকা দরকার এবং নিজকে আল্লাহর নিকট এভাবে সোপর্দ করা উচিত যে, 'দ্বীনের জন্য আমরা তোমার কাছে নিজকে সোপর্দ করলাম, তুমি শহীদ করে আমাদের থেকে খেদমত নিলে আমরা খুশি। আর যদি তুমি আমাদের শাহাদাতের সৌভাগ্য না দাও তাহলে বাঁচিয়ে রাখলে শুধু এই জন্য বাঁচিয়ে রাখ যে দুনিয়ায় দ্বীনের জন্য কাজ করতে পারি।'

• • •

'দ্বীনের জন্য আমরা তোমার কাছে নিজকে সোপর্দ করলাম, তুমি শহীদ করে আমাদের থেকে খেদমত নিলে আমরা খুশি। আর যদি তুমি আমাদের শাহাদাতের সৌভাগ্য না দাও তাহলে বাঁচিয়ে রাখলে শুধু এই জন্য বাঁচিয়ে রাখ যে দুনিয়ায় দ্বীনের জন্য কাজ করতে পারি।'

• • •

এরপর প্রশ্ন হতে পারে শহীদ হবার জন্য কি কোন শর্ত আছে যে এই গুণ যাদের থাকবে আল্লাহ তাদের শহীদ করবেন আর এই গুণ না থাকলে শহীদ করবেন না? এই ধরনের কোন পূর্বশর্ত জানার উপায় আমাদের নেই। আর আগের যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হলো তাতে একথা প্রমাণ হয় না যে, যিনি শহীদ হলেন তার মধ্যে কিছু এমন শর্ত পাওয়া গেল যা অন্যান্যদের মধ্যে পাওয়া গেলো না বলে তারা শহীদ হলেন না। ইসলামী আন্দোলনে নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ করে নিজের জান-মালকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করার সবগুলো শর্ত সমভাবে পূরণ হবার পরও আল্লাহ কাউকে শহীদ করতেও পারেন নাও করতে পারেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে অমুকের মধ্যে এই শর্ত বেশী পাওয়া গেছে অমুকের মধ্যে শর্ত কম পাওয়া গেছে।

এখন আমি শহীদ আবদুল মালেকের উত্তরসূরীদের ব্যাপারে একথা বলতে চাই যে শহীদ আবদুল মালেক এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, যেখানে যে দায়িত্ব আন্দোলন এবং ইসলামী আদর্শের মর্যাদার

www.icsbook.info

জন্য পালন করা উচিত তা পালন করতে হবে, তার প্রতিক্রিয়ায় যদি জীবন যায় তো যাবে, জুলুম অত্যাচার হলে সহ্য করতে হবে। এ যে আদর্শ তিনি স্থাপন করলেন পরবর্তীতে আন্দোলনে যারা এসেছে তাদের উপর এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা গেছে। আর তারই ফলে আরো কিছু ব্যক্তি শহীদ হতে আমরা দেখছি। যদি এ প্রভাব তাদের ওপর না পড়তো তাহলে তারা বাতিলের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে চলে যেতো এবং আন্দোলন বন্ধ করে কেটে পড়তো, যদি এ ঘটনার পর আন্দোলন থেকে সবাই সরে যেত তাহলে বুঝা যেত যে এর কোন ভালো প্রভাব আন্দোলনে পড়েনি। অথচ এক্ষেত্রে আন্দোলনের গতি আরো বেড়েছে। নতুন নতুন লোক উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আবদুল মালেকের উত্তরসূরীদের মধ্যে খুবই কল্যাণকর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার এ শাহাদাত থেকে এ শিক্ষাই কর্মীদের সামনে এসেছে যে, আবদুল মালেক জীবিত থেকে এই আন্দোলনের জন্য যে অবদান রাখতে পারতেন শহীদ হয়ে যেন তার চাইতে বেশী অবদান রেখে গেলেন। তার এ শাহাদাতের প্রেরণায় আন্দোলন যতদূর অগ্রসর হয়েছে, যত লোকের মধ্যে শাহাদাতের জযবা সৃষ্টি করেছে তার মতো যোগ্য কর্মী বেঁচে থাকলেও তিনি যতো যোগ্যই হোন না কেন তার একার জীবনে এতো বড় প্রভাব এবং আন্দোলনে এতটা গতি দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

তাহলে আমরা তার শাহাদাত থেকে এটাই শিক্ষা পেলাম যে, আমাদের কেউ শহীদ হয়ে গেলে তা আন্দোলনের জন্য ক্ষতির কারণ নয়, আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দেবার কারণ এটা হতে পারে না। আবদুল মালেকের শাহাদাত থেকে আমরা এই শিক্ষাও পেয়েছি যে, একজন লোক শহীদ হয়ে অগণিত লোকের মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং একজন লোক জীবিত থাকলে আন্দোলনকে যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার চাইতে বেশী এগিয়ে নিয়ে যায় তার শাহাদাত। একজন লোক সমস্ত প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করে আন্দোলনের জন্য যতটুকু অবদান রাখতে পারে তার শাহাদাত তার চাইতে অনেক বেশী অবদান রাখতে পারে। এটা আবদুল মালেকের শাহাদাতে প্রমাণিত হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই তার শাহাদাতের এক যুগ পরেও তার নাম ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এমন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, তার স্মৃতি রক্ষার প্রয়োজন মনে করে এবং তার কথা স্মরণ করে বই পুস্তক বের করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

• • •

তার শাহাদাত থেকে এটাই শিক্ষা পেলাম যে, আমাদের কেউ শহীদ হয়ে গেলে তা আন্দোলনের জন্য ক্ষতির কারণ নয়, আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দেবার কারণ এটা হতে পারে না। আবদুল মালেকের শাহাদাত থেকে আমরা এই শিক্ষাও পেয়েছি যে, একজন লোক শহীদ হয়ে অগণিত লোকের মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং একজন লোক জীবিত থাকলে আন্দোলনকে যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার চাইতে বেশী এগিয়ে নিয়ে যায় তার শাহাদাত। একজন লোক সমস্ত প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করে আন্দোলনের জন্য যতটুকু অবদান রাখতে পারে তার শাহাদাত তার চাইতে অনেক বেশী অবদান রাখতে পারে। এটা আবদুল মালেকের শাহাদাতে প্রমাণিত হয়েছে।

• • •

www.icsbook.info

আবদুল মালেক শহীদ হয়ে অমর হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলে এভাবে জীবিত থাকতে পারতেন না। তিনি আন্দোলনের মধ্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছেন যে এখনো তার জন্যে লেখা তৈরি হচ্ছে, বক্তৃতা দেয়া হচ্ছে। কর্মীদের মধ্যে প্রেরণা দেয়ার জন্য তার কথাগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক যুগ পর কেন, আরো অনেক যুগ পরেও দেখা যাবে তার শাহাদাত কতো মূল্যবান ছিল এবং এই শাহাদাতের মূল্য কেউ দিতে পারবেন না আল্লাহ ছাড়া। এ দুনিয়ার শাহাদাতের মূল্য এটাই যে আদর্শের জন্য তিনি শহীদ হলেন সে আদর্শের ধারক বলে যারা দাবিদার তারা শহীদ হবার জন্য প্রেরণা পাবে এবং এটা যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন শাহাদাতের মূল্যায়ন সঠিক হবে। তার কথা যেভাবে স্মরণ করা হচ্ছে, তার আদর্শের সবটা যেভাবে চর্চা হচ্ছে এর দ্বারা প্রমাণ হয় তার শাহাদাতের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে।

আবদুল মালেক শহীদ হয়েছিলেন পাকিস্তান আমলে। এখন বাংলাদেশ আমল। যারা এই আন্দোলনের ইতিহাস '৭৭ সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে এবং '৭৭ সালে সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মনে করে তারা দুর্ভাগা এবং তারা অতীতের ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে আবদুল মালেকের শাহাদাতের মূল্যায়ন তারাই করতে পারে যারা বর্তমানে ছাত্র অঙ্গনে আন্দোলন করতে গিয়ে আবদুল মালেককে তাদের পূর্বসূরী বলে বিশ্বাস করে। যারা তাকে পূর্বসূরী বলে বিশ্বাস করে তারাই তার উত্তরসূরী হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। অতএব এই আন্দোলনকে যারা সে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা করে তাদের মন দুর্বল, তারা বিভ্রান্ত। তারা বাংলাদেশ-পূর্ব আন্দোলনের ইতিহাস তালাশ করে গৌরবজনক কিছু পায় না। তারা হীনমন্যতায় ভুগে।

যারা ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইতিহাস ১৯৭৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে বলে ধারণা করে তারা আন্দোলনের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং শাহাদাতের মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত। সে শাহাদাতকে অস্বীকার করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। ইসলামকে এদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছাত্র অঙ্গনে পাকিস্তান আমলে যারা কাজ করেছিল তারা গোটা পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। আর বর্তমানে বাংলাদেশে যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করছে তারা বাংলাদেশেই ইসলামী আদর্শকে কায়েম করতে চায়। ইসলামী আদর্শ কায়েমের দিক দিয়ে ঐসময়ে বড় একটা রাষ্ট্র কায়েম করার চেষ্টা ছিল। আর দেশ ভাগ হবার পর এখনও চেষ্টা চলছে। তাই বলে কি এর অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলতে হবে? অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করতে হবে? এই আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরান, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলনের সূচনা। ১৯৬৯ সালে আবদুল মালেক শাহাদাত বরণ করেছেন। সেই '৬৯ সাল, '৭৭ সাল থেকে ৮ বছর আগে। এই বছরের ইতিহাস যারা ভুলে গেছে তারা এই আন্দোলনের স্বাভাবিক স্রোত থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। আর যারা ঐ আন্দোলনের সঙ্গী, ঐ আন্দোলনের ঐতিহ্যকে ধরে এগিয়ে চলেছে তারাই এই শাহাদাতের ধারক ও বাহক। তাই আজ শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের এতো বছর পরেও আরো বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার কথা স্মরণ করার। তার শিক্ষাকে, তার কুরবাণীকে, তার আদর্শকে, তার চরিত্রকে বর্তমানের ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা আগের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে, এ আন্দোলন থেকে কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত হয়ে ভুল ধারণায় পড়ে ঐ মহান ঐতিহ্য থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। এ দেশের ছাত্র মহলে যারা ইসলামী আদর্শের দিকে এগুচ্ছে তারা এ মহান আদর্শ থেকে যাতে বিচ্যুত না হয়, ঐ ঐতিহ্য থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় এবং শহীদ মালেক যেন তাদেরকে প্রেরণা যোগায় তার জন্য আজ শহীদ আবদুল মালেক সম্পর্কে এ আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার।

লেখক : সাবেক আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.icsbook.info

বিশেষ রচনা

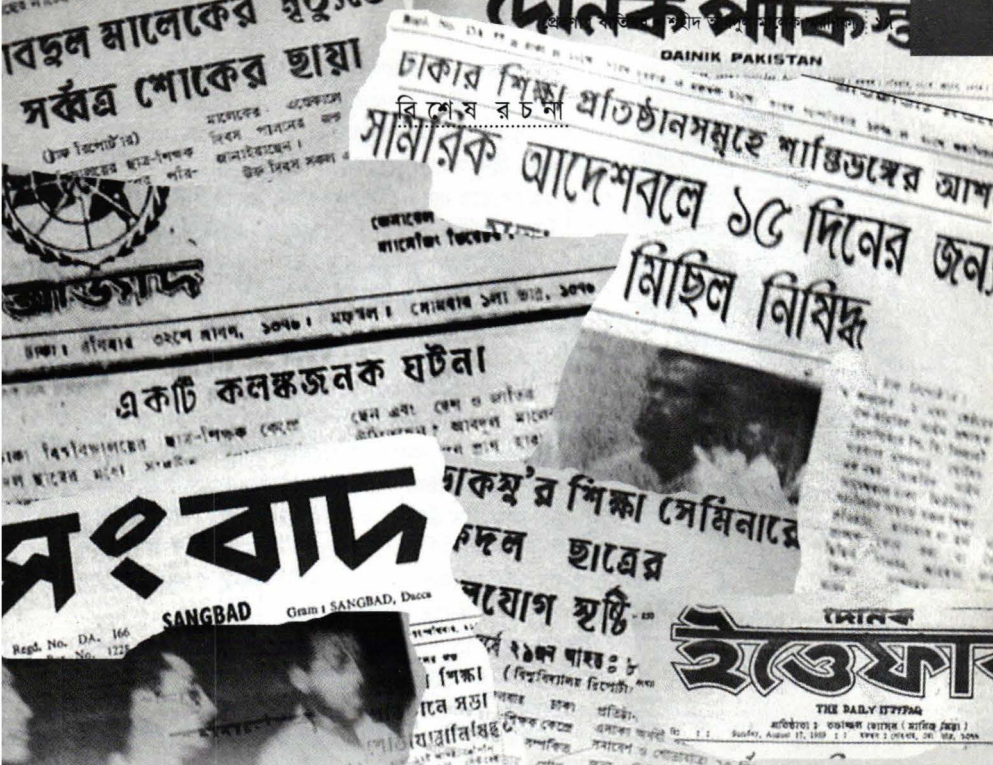

শহীদ আবদুল মালেক ও তৎকালীন পরিস্থিতি

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

১৯০ বছরের বৃটিশ দখলদারিত্বের শাসনামলে এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজ অনিবার্যভাবেই শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের সূচনাতেই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। একটি স্বাধীন জাতি গড়ে তোলার পরিবর্তে একদলীয় দেশীয় কেরানী তৈরিই এ শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল। শিক্ষার মাধ্যম বদলিয়ে ইংরেজি চালু করা হলে মুসলমানরা তা সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমাজ জীবনে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় এবং ভারত বিভাগের মাধ্যমে মুসলমান

www.icsbook.info

মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, ইংরেজ চলে যাবার পর যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আসলো তারা জাতিকে সঠিক আদর্শিক দিকদর্শন দিতে ব্যর্থ হলেন। ইসলামের শ্লোগান দিয়ে মুসলমানদের আলাদা আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার দাবীকে জনপ্রিয় করা হয়েছিল বটে, কিন্তু আযাদী লাভের পর একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা নীতির পুনর্গঠন করতে শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সাধারণ ধর্মপ্রাণ জনতার সমর্থন লাভের প্রয়োজনে ইসলামের কথা মুখে উচ্চারণ করলেও ইসলামী আদর্শের আলোকে জাতীয় পুনর্গঠনের সত্যিকারের কোন উদ্যোগ ক্ষমতাসীন মহল নিতে পারেননি বা নেননি অথবা বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আদৌ উপলব্ধিই করতে পারেননি।

ও হিন্দুদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। বৃটিশ শাসনকালে মুসলিম সমাজের জন্য যে আদর্শিক সংকট সৃষ্টি হয় হিন্দুদের জন্য তেমন কোন সংকট ছিল না। উপরন্তু হিন্দু সমাজ ইংরেজদের আনুকূল্য লাভ করায় শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যায়। বৃটিশ দখলদারিত্বের আগের চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম সমাজে অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, ইংরেজ চলে যাবার পর যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আসলো তারা জাতিকে সঠিক আদর্শিক দিকদর্শন দিতে ব্যর্থ হলেন। ইসলামের শ্লোগান দিয়ে মুসলমানদের আলাদা আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার দাবীকে জনপ্রিয় করা হয়েছিল বটে, কিন্তু আযাদী লাভের পর একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা নীতির পুনর্গঠন করতে শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সাধারণ ধর্মপ্রাণ জনতার সমর্থন লাভের প্রয়োজনে ইসলামের কথা মুখে উচ্চারণ করলেও ইসলামী আদর্শের আলোকে জাতীয় পুনর্গঠনের সত্যিকারের কোন উদ্যোগ ক্ষমতাসীন মহল নিতে পারেননি বা নেননি অথবা বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আদৌ উপলব্ধিই করতে পারেননি।

ইংরেজরা সুকৌশলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও বিভাজন সৃষ্টির জন্যই সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা এই দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে নিষ্ক্রীয় এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা থেকে মোল্লা তৈরির একটি ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার প্রবর্তন করেন। আযাদী লাভের পর পরই প্রয়োজন ছিল দুই বিপরীত ধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটানো এবং বহুমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। সরকারী ভ্রান্তনীতির কারণেই শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। বিশেষ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্য এটা খুবই বড় ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ ছিল। এ কারণেই শিক্ষা সংস্কারের জন্য পাকিস্তান আমলেই অনেকগুলো কমিশন গঠিত হয়। এসব শিক্ষা কমিশনের কোন রিপোর্টে জাতীয় আদর্শ ইসলামের প্রতিফলন ঘটেনি। পক্ষান্তরে সেকুলার, নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মবিমুখ সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিকভাবে খুবই সক্রিয় ছিল। তারা মুসলিম জাতিসত্তার বিলোপ সাধন করে সেকুলারিজম বা ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমাজ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তারা তা পরিকল্পিত অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশে কৌশলী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

তদানীন্তনকালে পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, পাঞ্জাবী আমলাচক্রের একদেশদর্শী নীতি এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬%) জনগণের বসবাস ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের যেসব দল ও ব্যক্তিবর্গ শাসন ক্ষমতায় ভূমিকা পালন করেছেন তারাও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের

www.icsbook.info

ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেননি। দেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসন স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। উপরন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে জনগণকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সকল রাজনৈতিক দল সোচ্চার ছিল। সেই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীও ছিল সকল দলেই, বলতে গেলে। পাকিস্তানের ২৪ বছরে অধিকাংশ সময় দেশে চলে সামরিক স্বৈরাচার। তবে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। এ সময় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ১৪ মাস এবং প্রদেশে ২২ মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর ঘোষণা করেছিল ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে মরহুম শেখ মুজিবও পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে গণতান্ত্রিক শাসন বেশী দিন টিকতে পারেনি। জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতা দখল করে প্রায় এক দশক স্বৈরশাসন পরিচালনা করেন। এ সময় প্রথমে পিডিএম এবং পরে ডেমোক্র্যাটিক একশন কমিটি রাজনৈতিক আন্দোলন চালায়।

এসব রাজনৈতিক জোটে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াত, নেজামে ইসলাম, পিডিপি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ সহ বিভিন্ন দল সক্রিয় ছিল। ছাত্র সংগঠনগুলোও রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। '৬৯ সালে দেশে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ফলে আইয়ুবের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে এবং আরেকজন সেনা কর্মকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণ করেন। এরই এক পর্যায়ে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দেখা দেয়। ছাত্র সমাজের একটি অংশ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের দাবী তুলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনের উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আয়োজিত বিতর্কে ইসলামী শিক্ষার পক্ষে ছাত্ররা মতামত ব্যক্ত করে। এ বিতর্কে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের নেতা আবদুল মালেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ইসলামের পক্ষে মতামত প্রকাশ করায় সেকুলার মহল মরিয়া হয়ে উঠে। ছাত্রদের এ মতামতকে বানচাল করার জন্য ডাকসুর উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের ১২ই আগস্ট এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় ইসলামপন্থী ছাত্ররা আলোচনায় অংশ গ্রহণের দাবী জানায়। কিন্তু তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়। উপরন্তু ইসলাম সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা শামসুদ্দোহা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর উক্তি করে। আবদুল মালেক তার সঙ্গী সাথীদের

বাম সেকুলাপন্থীদের নির্মম আঘাতে সোহরাওয়ার্দীর সবুজ ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়েছেন আবদুল মালেক

www.icsbook.info

নিয়ে টিএসসির আলোচনা সভা স্থলেই তার প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ সংঘর্ষে রূপ লাভ করে। সংঘর্ষ এক পর্যায়ে থেমে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে আবদুল মালেক ও তার কতিপয় সঙ্গীকে টিএসসির মোড়ে সেকুলারপন্থীরা হামলা করে এবং রেসকোর্সে এনে তার মাথার নীচে ইট দিয়ে উপরে ইট ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করে মারাত্মকভাবে জখম করে এবং অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, এই হামলার যাবতীয় রসদ সরবরাহ করা হয় জগন্নাথ হল থেকে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে এই পরিকল্পিত হামলার নেতৃত্ব দান করে।

আবদুল মালেক ভাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কিন্তু তার আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, ১৫ই আগস্ট তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সম্ভবতঃ মালেক ভাইয়ের মত মেধাবী ছাত্রনেতার শাহাদাত এর আগে আর ঘটেনি। গোটা দেশ স্তব্ধ হয়ে যায়। সর্বমহলে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আলেম সমাজ তথা সকল শ্রেণীর মানুষ এই মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেন। আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সভাপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানও বিবৃতি দিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ে প্রতিভাবান ছাত্রনেতা আবদুল মালেকের শাহাদাতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এ থেকেই বুঝা যায়, শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত কতটা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

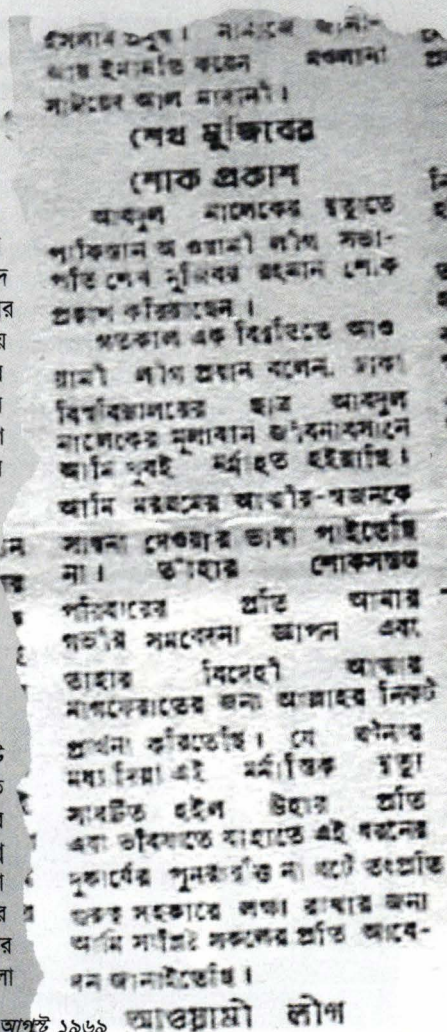

শহীদ আবদুল মালেকের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে। আওলাদে রাসূল (সা) সাইয়েদ মোস্তফা আল মাদানী জানাজার ইমামতি করেন। শহীদ আবদুল মালেকের কফিন নিয়ে যে শোভাযাত্রা কমলাপুর স্টেশন অভিমুখে রওয়ানা করে তাতে জনতার ঢল নামে। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনা ছিল মাইল ফলক। সারাদেশে শাহাদাতের এই ঘটনা ছাত্র সমাজের মধ্যে এবং সকল ইসলামপন্থীদের মাঝে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) তার শোক বাণীতে মন্তব্য করেন, "এক মালেকের রক্ত থেকে লক্ষ মালেক জন্ম নেবে।" তার এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। সত্যিই সেদিন জেগে উঠেছিল গোটা দেশ। গ্রাম গ্রামান্তর পর্যন্ত শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের ঘটনায় প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশিত হয়। আমি তখন ছিলাম মোমেনশাহীতে। ১২ আগস্ট টি.এস.সির আলোচনা সভাকে কেন্দ্র করে সংঘঠিত ঘটনার পর শহীদ আবদুল মালেকের উপর ন্যাক্কারজনক হামলার পর থেকেই আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। ১৫ তারিখ আমাদেরকে টেলিফোনে জানানো হলো মালেক ভাই আর নেই। তার কফিন ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হবে বগুড়ায় তার গ্রামের বাড়িতে দাফনের জন্য। আমাদেরকে বরফ যোগাড় করে রাখতে বলা

শেখ মুজিবের শোক প্রকাশ

আবদুল মালেকের মৃত্যুতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল মালেকের মূল্যবান জীবনাবসানে আমি খুবই মর্মাহত হইয়াছি। আমি মরহুমের আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা পাইতেছি না। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাঁহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছি। যে [illegible] মধ্য দিয়া এই মর্মান্তিক মৃত্যু সংঘটিত হইল উহার প্রতি এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরনের দুষ্কার্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটে তৎপ্রতি [illegible] সহকারে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

আওয়ামী লীগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র [illegible]

সূত্র : দৈনিক সংবাদ : ১৭ আগস্ট ১৯৬৯

www.icsbook.info

• • •

শহীদ আবদুল মালেক ছিলেন নিরহংকার এক অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকেই তার ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য করে নিয়ে ছিলেন তিনি। সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিল তার ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব এবং অতি সাধাসিধে জীবন যাপন। জ্ঞান চর্চায় তার অদম্য প্রেরণা ছিল। তিনি ইসলামী আন্দোলনে এক বিরাট গতি সঞ্চার করে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে আজ পরিবর্তন চাই। গোটা বিশ্বে পরিবর্তনের হাওয়া। মানবতার মুক্তির জন্য একটি পরিবর্তন অনিবার্য। মানুষের কাঙ্ক্ষিত শান্তির সমাজের জন্য বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে আজ প্রয়োজন মালেক ভাইদের। মালেক ভাইসহ শহীদের বিরাট কাফেলাই আমাদের আন্দোলনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। তবে একজন মালেক ভাইয়ের যেসব গুণ ছিল সে সব গুণসম্পন্ন লোক দরকার। ইসলামী ছাত্রশিবির যদি নতুন নতুন আবদুল মালেক তৈরি করতে পারে তাহলে এদেশে ইসলামের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না

• • •

হলো। মোমেনশাহী রেল স্টেশনে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অপেক্ষমান আমরা অসংখ্য ছাত্র। ট্রেন আসলো যখন সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত শহীদের লাশ দেখলাম আর ব্যাকুল হয়ে কাঁদলাম সবাই। ব্যক্তিগতভাবে শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের সাথে আমার অনেক স্মৃতি এবং অত্যন্ত আত্মিক সম্পর্ক ছিল।

আমি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন জিনজিরা (কেরানীগঞ্জ) পি.এম হাই স্কুলে আয়োজিত এক শিক্ষা শিবিরে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মালেক ভাই। আমিও যোগদান করেছিলাম সেই শিবিরে। আমার মনে হয় সেখানে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ কর্মী। রাতে খাবার পর হাত ধৌত করার সময় মালেক ভাইকে দেখলাম তিনি নিজে থালা বাসন পরিষ্কার করছেন। তিনি আমাকে একটি মগ হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বালতি থেকে পানি নিয়ে আমি হাত ধোয়ার ব্যাপারে কিছু সাহায্য করছিলাম। এ সময় কেউ একজন আমার হাত থেকে মগটি নিয়ে নেন। আমি আর মগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেকটা অসহায় হয়ে করুণভাবে আমি বলছিলাম, 'আমার মগ কই'। আমার কথার মধ্যে খানিকটা মোমেনশাহী এলাকার টান ছিল। আমার এই অবস্থাকে মালেক ভাই এবং আরও কয়েকজন (তাঁর সঙ্গী সাথী) খুব উপভোগ করেছেন। দেখা হলেই অনেক সময় আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন 'আমার মগ কই'।

১৯৬৭ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা শেষে সারাদেশ থেকে বাছাই করে একটি ছোট ব্যাচকে ঢাকায় আনা হলো। এতে আমরা ছিলাম মাত্র ১৪ জন। শহীদ আবদুল মালেক ভাই এই শিক্ষাশিবিরের পরিচালক ছিলেন। আমার এবং আমার এক সাথী, স্কুলকর্মী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর (পরবর্তীকালে সাংবাদিক) থাকার ব্যবস্থা হলো মালেক ভাইয়ের কক্ষে। ফজলুল হক মুসলিম হলের ১১২ নম্বর একক কক্ষটি ছিল মালেক ভাইয়ের। রাতে প্রোগ্রাম শেষে আমরা শয়ন করলাম মালেক ভাইয়ের সিটে। লক্ষ্য করলাম অনেক রাতে তিনি শুতে আসলেন। এর আগে তার এক জোড়া পায়জাম পাঞ্জাবী তিনি ধুয়ে নিলেন। তারপর কিছু পড়াশুনা করলেন। অতঃপর মাথায় পত্রিকায় কাগজ দিয়ে ফ্লোরে একটি চাঁদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। এক রাতের ঘটনা। আমার সঙ্গীটি হঠাৎ বিছানা থেকে পড়ে গেলেন। আর মালেক ভাই নীচে থেকে তাকে পাজাকোলে ধরে ফেললেন। ফলে সে ভাইটি কোন ব্যথা পায়নি। আমাদের বিভিন্ন দিন বিভিন্ন জায়গায় বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মসূচীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের স্কুলে পাঠানো হয়েছে দাওয়াতী কাজের জন্য। আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলে। সেখানকার ছাত্রদের আমরা সংগঠনের দাওয়াত দেই। তবে এ কথা স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করছি না যে, সেই শিক্ষাশিবিরে শহীদ আবদুল

www.icsbook.info

মালেক ভাই যে বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন তা আমার নিকট খুবই কঠিন মনে হয়েছে। তিনি প্রচুর রেফারেন্স ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন যা আমার পক্ষে ঐ বয়সে বুঝা ততটা সহজ ছিল না। তবে দ্রুত আলোচনা করতেন এবং বক্তব্যের মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল এবং আমাদের নিকট ভালো লেগেছে। মালেক ভাইয়ের ব্যক্তিত্ব দ্বারা আমরা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম।

রাতে ঘুমানোর আগে দেখতাম মালেক ভাই ইংরেজি একটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছেন। আবার কিছু কিছু নোট করছেন। তিনি মাসিক পৃথিবীতে চলমান বিশ্ব পরিস্থিতির উপর লিখতেন। বুঝলাম সেই লেখার জন্য মালেক ভাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তখন থেকেই বিদেশী ম্যাগাজিন পড়ার ব্যাপারে আমার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। মালেক ভাইয়ের অনেক স্মৃতি আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলোতে আমরা দারুণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ি। আমার নিজের পরীক্ষার প্রস্তুতিও ঠিকভাবে নেইনি। গোটা বৃহত্তর মোমেনশাহী এলাকায় সভা-সমাবেশ করে বেড়িয়েছি। জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সানাউল্লাহ আহমেদ ছাত্রাবাসে থাকি। উনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থানের এক সকালে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য উঠে দেখি আমার কক্ষের সামনের বারান্দায় একটি হালকা ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে মালেক ভাই। আবেগে অভিভূত হয়ে সালাম দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। খুব অভিমানে জিজ্ঞেস করলাম কতক্ষণ দাঁড়িয়েছেন, ডাক দিলেন না কেন? তিনি জবাবে বললেন, তিনটার দিকে পৌঁছেছি। ভাবলাম সকালে তো ফজরের নামাজ পড়তে উঠবেই। তাছাড়া চিন্তা করলাম অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়েছ, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে লাভ কি? দুইজনের বদলে একজন কষ্ট করাই ভালো। তাই এখানে দাঁড়ালাম। আমার কিছু অসুবিধা হয়নি। নামাজের পর মালেক ভাইকে নিয়ে প্রোগ্রাম সাজালাম। ঐ সময়টায় আন্দোলন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা কর্মসূচীতে ইসলামের পক্ষে একটা দফাও রাখেনি। এমতাবস্থায় ইসলামপন্থী ছাত্রদের দুটি সংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ৮দফা কর্মসূচী দিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেছি। গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মাঠে আসার আগে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এককভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগ্রাম জাতীয় আদর্শ ইসলামের পক্ষে শ্লোগান দিয়ে মাঠে নামার ফলে ব্যাপক সাড়া পায় এবং বিভিন্ন স্থানে ময়দানের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের হাতে চলে আসতে থাকে। ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে এই অবস্থানকে আরও দৃঢ় করার জন্য উদ্যোগে নেয়া হয়। তার অংশ হিসেবে বৃহত্তর মোমেনশাহী এলাকায় আসেন আবদুল মালেক ভাই। আমার ধারণা যদি ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারী না করতেন তাহলে সারাদেশে ইসলামী আদর্শের পক্ষে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়ে যেত।

মালেক ভাইকে নিয়ে আমরা সরিষাবাড়ি যাই। সেখানে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করে ঢাকাগামী একটি দ্রুতগামী ট্রেন থামিয়ে তাকে ট্রেনে তুলে দেই। জামালপুর থেকে তিনি বাসে টাঙ্গাইলের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। এর পর মালেক ভাইয়ের সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।

শহীদ আবদুল মালেক ছিলেন নিরহংকার এক অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকেই তার ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য করে নিয়ে ছিলেন তিনি। সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিল তার ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব এবং অতি সাধাসিধে জীবন যাপন।

জ্ঞান চর্চায় তার অদম্য প্রেরণা ছিল। তিনি ইসলামী আন্দোলনে এক বিরাট গতি সঞ্চার করে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে আজ পরিবর্তন চাই। গোটা বিশ্বে পরিবর্তনের হাওয়া। মানবতার মুক্তির জন্য একটি পরিবর্তন অনিবার্য। মানুষের কাঙ্ক্ষিত শান্তির সমাজের জন্য বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে আজ প্রয়োজন মালেক ভাইদের। মালেক ভাইসহ শহীদের বিরাট কাফেলাই আমাদের আন্দোলনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। তবে একজন মালেক ভাইয়ের যেসব গুণ ছিল সে সব গুণসম্পন্ন লোক দরকার। ইসলামী ছাত্রশিবির যদি নতুন নতুন আবদুল মালেক তৈরি করতে পারে তাহলে এদেশে ইসলামের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না ইন্‌শা আল্লাহ।

লেখক : সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা। সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.icsbook.info

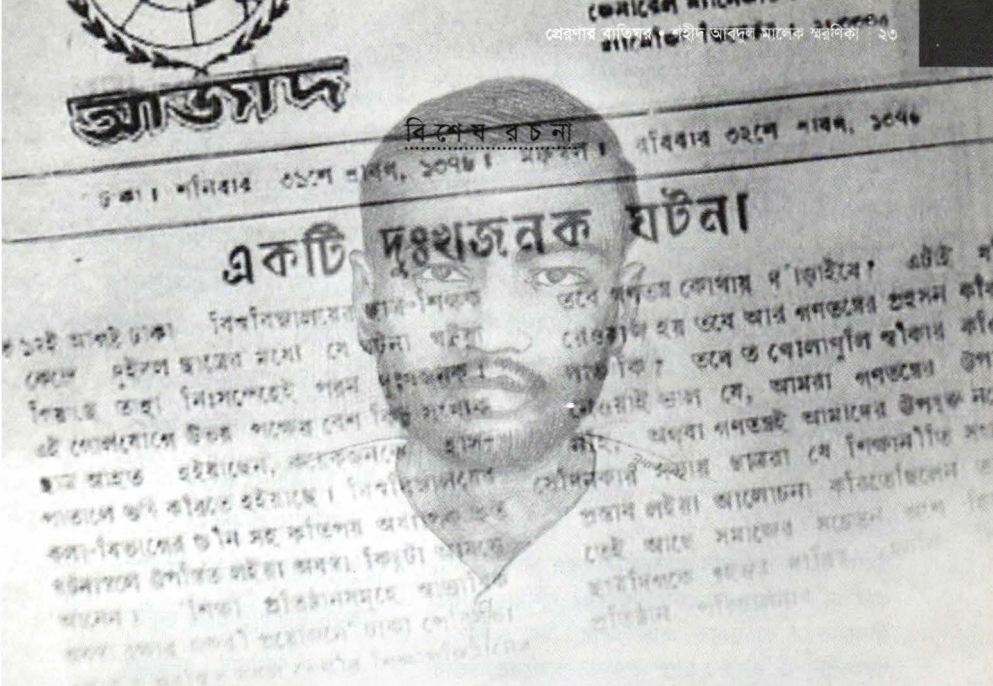

শহীদ আবদুল মালেক
আমাদের অনুপ্রেরণা

নূরুল ইসলাম বুলবুল

ছোট শিশু পিতা-মাতার সাথে বাড়িতে অবস্থান করছে। পাশের বাড়ির একজন প্রতিবেশী এসেছে তরকারীর জন্যে 'বেগুন' ধার করতে। বাড়িতে বেগুন ছিল খুবই কম। এত কম বেগুন কিভাবে দেবে ভেবে মা বলেছিলেন বেগুন তো নেই। মানব দরদী সত্য প্রিয় শিশুটির তা পছন্দ হয়নি। সে মনে মনে পীড়িত হলো। প্রতিবেশী খুশি হয়েই বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে কয়েকটি বেগুন নিয়ে সেই বাড়িতে হাজির। ছোট্ট শিশুর এই কাণ্ড দেখে তো সেদিন প্রতিবেশী পরিবারের সদস্যরা হাসাহাসি করেছিল। এ ছিল প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি শিশুটির সচেতনতার প্রমাণ। সম্মানিত পাঠক, আমরা এতক্ষণ যাঁর কথা বলছি তিনিই শহীদ আবদুল মালেক।

এ প্রতিভাবান ক্ষণজন্মা শিশু আবদুল মালেক জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৭ সালে বগুড়া জেলার ধুনট থানার খোকসাবাড়ি নামক গ্রামের দরিদ্র পরিবারে। সর্বকনিষ্ঠ হবার কারণে ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতার আদরের সন্তান ছিলেন তিনি। পাঁচ বছর বয়সে খোকসাবাড়ি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়ে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন এবং ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন গোসাইবাড়ি হাইস্কুলে। ১৯৬০ সালে জুনিয়র

www.icsbook.info

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তাকে ভর্তি করা হয় বগুড়া জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে। এস.এস.সি.তে বিজ্ঞানে একাদশ স্থান করে নেন। এ অবস্থায় তার পিতা ইন্তেকাল করেন। সেখানে তিনি বঞ্চিত হন পিতৃস্নেহ থেকে। এরপর ভর্তি হন রাজশাহী সরকারী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে। সেখানেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে হয়ে ওঠেন সক্রিয়। এইচ.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে ৪র্থ স্থান অধিকারের পর ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ রসায়ন বিভাগে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার পরিচিতির পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনের মধ্যমণিতেও পরিণত হতে থাকেন তিনি।

শহীদ আবদুল মালেক অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। দারিদ্রতার জন্য নয় বরং দুনিয়ার খণ্ডিত জীবনের চাকচিক্যের প্রতি তার ছিল অনীহা। পরকালীন জীবনের চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের চিন্তায় তার চলে যায় অহর্নিশ। একটি মাত্র পাজামা আর পাঞ্জাবীই ছিল তার অধিকাংশ সময়ের পোশাক। রাতের বেলায় নিজ হাতে তিনি তা পরিষ্কার করতেন। যেন পরের দিনের সূচনায় তা আবার পরা যায়। একটি মাত্র পোশাক, দীন-হীনতার ছাপ ও কালো চেহারার অধিকারী হবার পরও তার ব্যক্তিগত আচরণ, যোগ্যতা, প্রতিভা আর আমল তাকে যে ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছে তা যে কাউকেই আকর্ষণ না করে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হলের ১১২ নং কক্ষে আসলো ছাত্র মেহমান। রাতে অবস্থান করবেন হলেই। কিন্তু জায়গা সংকট। শহীদ আবদুল মালেক মেহমানের খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁকে নিজের বিছানায় ঘুমানোর ব্যবস্থা করলেন। প্রাসঙ্গিক কাজ সেরে টেবিলে অধ্যয়ন করেন গভীর রাত পর্যন্ত। অধ্যয়নের পর যখন রুমের সবাই ঘুমিয়ে গেছেন- তখন তিনি আস্তে করে মেঝেতে পত্রিকা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সারা রাত তিনি মশার কামড়ে ছটফট করলেন। এটা শহীদ আবদুল মালেকের জন্য ছিল স্বাভাবিক, হামেশাই তাঁর এ কাজ করার প্রয়োজন হতো। কিন্তু মেহমান ঘুম থেকে উঠে তাঁকে এভাবে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠেছেন। তিনি ঠিক দেখছেন কিনা?

তিনি বলেছিলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের চাইতে ইসলামী ছাত্র সংঘের অফিস আমার কাছে অধিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ'। তিনি বুঝতেন এ পথহারা আদর্শহীন, নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত ছাত্র সমাজকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ ছাত্ররাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দিকভ্রান্ত ছাত্রদের সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের সুতিকাগার 'ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের' অফিসকেই তিনি তথাকথিত শিক্ষা অর্জনের সেই ক্লাসের চাইতে বেশি ভালবেসেছিলেন। কিন্তু তাই বলে কি তিনি লেখাপড়া আর দুনিয়াবী যোগ্যতা অর্জনে পিছপা ছিলেন? অবশ্যই তা নয়। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান সংগঠকের পাশাপাশি একজন অনন্য সাধারণ মেধাবী ছাত্র।

www.icsbook.info

ইসলামকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পর তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি ছিলেন পাগলপারা। দুনিয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা তার এ পথ আগলাতে পারেনি। তার বক্তব্য ও বিভিন্ন লেখনী থেকে তার বলিষ্ঠতা, আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী চেতনার পরিচয় মেলে। তিনি লিখলেন, 'জানি আমার দুঃসংবাদ পেলে মা কাঁদবেন। কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিল উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেত সে প্রচেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণ ভরে দোয়া করুন, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী যাঁতাকলের নিষ্পেষণ, ফাঁসির মঞ্চ যেন আমাকে ভড়কে দিতে না পারে।"

মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকলেই এমনটি করা যায়।

একটি শিক্ষা শিবির পরিচালনার সাথে তিনি ছিলেন। এক সময় জরুরী প্রয়োজনে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ তাকে দেখা গেল শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের পার্শ্বে। তবে ল্যাট্রিন ব্যবহারের জন্য নয়। এক বুক পানিতে নেমে তিনি ল্যাট্রিন মেরামতের কাজে মগ্ন। এ অবস্থা দেখে তো চোখ ছানাবড়া। অথচ এ কাজটি তিনি অন্যকে দিয়েও করাতে পারতেন। কতটুকু দায়িত্ব সচেতনতা তাঁর মধ্যে ছিল এ থেকে তা অনুমান করা যায়।

তিনি বলেছিলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের চাইতে ইসলামী ছাত্র সংঘের অফিস আমার কাছে অধিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ'। তিনি বুঝতেন এ পথহারা আদর্শহীন, নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত ছাত্র সমাজকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ ছাত্ররাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দিকভ্রান্ত ছাত্রদের সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের সুতিকাগার 'ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের' অফিসকেই তিনি তথাকথিত শিক্ষা অর্জনের সেই ক্লাসের চাইতে বেশি ভালবেসেছিলেন।

কিন্তু তাই বলে কি তিনি লেখাপড়া আর দুনিয়াবী যোগ্যতা অর্জনে পিছপা ছিলেন? অবশ্যই তা নয়। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান সংগঠকের পাশাপাশি একজন অনন্য সাধারণ মেধাবী ছাত্র। এস.এস.সি ও ইন্টারমিডিয়েটে তিনি স্ট্যান্ড করেছেন। সংগঠনের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার পাশাপাশি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়নের সেরা ছাত্রও ছিলেন। ছিলেন ক্ষুরধার অনলবর্ষী বক্তা। সমসাময়িক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার গভীরে তিনি তার প্রতিভা দিয়েই প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাই তো তিনি তৎকালীণ পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে এ ব্যাপারে যক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন ইসলামী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতেও এত বেশি গভীর জ্ঞান রাখতেন যে- সেসব বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও দিতে পারতেন। তিনি ছিলেন ভারসাম্যপূর্ণ

www.icsbook.info

জীবনের এক উজ্জ্বল নমুনা। ব্যক্তিগত জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপাড়ায় তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখেন। সংগঠক হিসেবে ছিলেন অনন্য সাধারণ। সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তিকে সহসাই আপন করে নিতে পারতেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বরাবরই পত্রের মাধ্যমে লজিং মাস্টার, পরিবার ও আত্মীয় স্বজন ও ছেলেবেলার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

ছোট্ট বেলালের কাছে তিনি লিখেছেন '... তুমি আসবে বলে ক'দিন সকাল বিকাল অনেক কাজের মাঝেও স্টেশনে খোঁজ নিয়েছিলাম।' নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় পিতাকে লিখেছেন ঃ 'বাড়ির কথা ভাবি না, আমার শুধু এক উদ্দেশ্য, খোদা যেন আমার উদ্দেশ্য সফল করেন। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি, দোয়া করবেন। খোদা যেন সহায় হোন, আমি ধন-সম্পদ কিছুই চাই না, শুধুমাত্র যেন প্রকৃত মানুষ রূপে জগতের বুকে বেঁচে থাকতে পারি।"

সারা দিনের ক্লান্তির পরেও রাত জেগে জেগে জ্ঞান অর্জন, ইবাদত করেই অনেক রাত কাটিয়ে দিতেন। ভাল Result, উঁচু মানের সংগঠক ও দুনিয়াবী যোগ্যতার সমন্বয় সাধন একজন প্রতিশ্রুতিশীল যুবকের পক্ষেই সম্ভব যা মালেক ভাই-এর জীবনে দেখা যায়।

সময়ের প্রতি তিনি ছিলেন যত্নবান। তিনি বলেছেন, 'যারা মানুষ হতে চায় তাদের জন্য দুনিয়াটা একটা জ্বালাময় আগ্নেয়গিরি। যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্য অবসর নেই, জিরোবার সময়টুকু নেই"। সময়ের প্রতি এ ধরনের সচেতনতার ফলেই শহীদ আবদুল মালেক সামগ্রিক দিক থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

ইসলামকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পর তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি ছিলেন পাগলপারা। দুনিয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা তার এ পথ আগলাতে পারেনি। তার বক্তব্য ও বিভিন্ন লেখনী থেকে তার বলিষ্ঠতা, আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী চেতনার পরিচয় মেলে। তিনি লিখলেন, 'জানি আমার দুঃসংবাদ পেলে মা কাঁদবেন। কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিল উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেত সে প্রচেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণ ভরে দোয়া করুন, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী যাঁতাকলের নিষ্পেষণ, ফাঁসির মঞ্চ যেন আমাকে ভড়কে দিতে না পারে।"

তিনি আরো লিখলেন : "জিন্দেগীর প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।"

তিনি আরো অনুভব করলেন, 'আজ ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাবার সময় কোথায়?.... জিন্দেগীর চূড়ান্ত মাকসুদ হিসেবে আমি ইসলামী আন্দোনকে কবুল করে নিয়েছি। বস্তুত: এ ছিল আমার ঈমানেরই দাবি।'

মায়ের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রতিও তাঁর আবেগ আর ভালবাসা ছিল অপরিসীম। তাইতো তিনি আন্দোলনের প্রেমে মায়ের স্নেহের বন্ধনকেও প্রয়োজনে ছিড়ে ফেলতে ছিলেন বদ্ধপরিকার। দুনিয়ার প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তিনি বললেন : "মায়ের বাঁধন ছাড়া আমার আর কিছু নেই। বৃহত্তর কল্যাণের ফলে সে বাঁধনকে ছিঁড়তে হবে। কঠিন শপথ নিয়ে আমি আমার পথে চলতে চাই। আমার মা এবং ভাইয়েরা আশা করে আছেন আমি একটা বড় কিছু করতে যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যা সেসব আশা। আমি বড় হতে চাইনে, ছোট থেকেই সার্থকতা পেতে চাই।"

তিনি কিশোর ও তরুণদের খুব ভালবাসতেন, তাদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং তাদের মাধ্যমেই আগামী দিনে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি এ জন্যই আহ্বান জানিয়েছেন : আমরা চাই দুনিয়ার বুকে একটি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করতে। আমাদের সেই স্বপ্নের কাফেলায়

www.icsbook.info

তোমরাই হবে নিশান বরদার, তোমরাই হবে তার সিপাহসালার।

..... আমি চাই না, পৃথিবী চায় তোমরা হবে মুমিন, মুসলমান ও মুজাহিদ। তোমরাই হবে আদর্শ পুরুষ। প্রৌঢ়দের দ্বারা কোন বিপ্লব হবে না। আলী, খালেদ, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাসিম আর কোতায়বার মত নওজোয়ানরাই কেবল ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে।'

কিন্তু তিনি জানতেন এ বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির এ পথে প্রতিবন্ধকতা নিরন্তর। সবকিছুকে পদদলিত করেই এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তাই এর পরেই তিনি লিখেছেন : 'সব বাধাকে তুচ্ছ করে, গাঢ় তমসার বুক চিরে যেদিন আমরা পথ করে নিতে পারবো, সেদিন আমরা পৌঁছবো এ দুর্গম পথের শেষ মঞ্জিলে। আর সেদিনই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেদিন আমাদের চরিত্র হবে হযরত ইউসুফের মত সেই দিনই- কেবল সেই দিনই আসবে সাফল্য।' 'এ চিঠির শেষে জনৈক কামরুলকে আরো বলেন : 'পড়াশুনা খুব ভাল করে করবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।'

বেলালের কাছে তিনি আরো লিখেছেন : ..... 'আমরা এক সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলেছি তোমার মত তরুণরা হবে সে পথের যাত্রী। আমরা হব তার অগ্রপথিক। আমার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা, তুমিও হবে সেই তরুণ মুজাহিদ দলের একজন সাথী। হেরার গুহা থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত, তাই হবে তোমার সম্বল। ... এখন কেমন কাজ করছো জানার জন্য মনটা ব্যাকুল। কারণ, কচিপ্রাণ তরুণদের তাজা খুন জাহান্নামের আগুনে পুড়ুক ভাবতেও যেন কেমন লাগে? ভালভাবে কাজ কর। বইগুলো পড়ার ব্যবস্থা কর।'

উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন : '..... দু'দিন পরে কলেজে আসবে তাই জীবনের মাকসুদ আর একবার স্মরণ করে নেয়া দরকার। তোমার আমার মত হাজার তরুণ আজ ইসলামের জন্য জান দিতে প্রস্তুত। তাদের প্রাণে সমাজ ও পরিবারের ছোট-খাট ব্যথা-বেদনা অনুভব করার সময় কোথায়? আমার বিশ্বাস জিন্দেগীর সেই মনজিলের দিকে তাকিয়ে সব কিছু ভুলে যাবে।'

বেলালকে তিনি আবারো লিখলেন- 'তোমার পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর তোমাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। অবশ্যি তুমি আমার কাছ থেকে একটা উপহার পাবে। ... একটা জিনিস নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবে তোমরা সবাই খাঁটি মুসলমান ও ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদরূপে গড়ে না উঠলে সবকিছুই বৃথা।'

বেলাল ও কামরুলের মাধ্যমে এ যেন আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে শহীদ আবদুল মালেকের নিরন্তর প্রচেষ্টার এক অনবদ্য দলিল।

শাহাদাতের চেতনায় তিনি ছিলেন উজ্জীবিত। কর্মময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সে স্বাক্ষর মেলে। তিনি বলেছিলেন : 'আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে গালেব করার জন্য আমরা দরকার হলে নিজেদের জান মালকে কুরবান করতেও কুণ্ঠিত হব না।' তিনি আরো লিখেছেন, 'কঠিন শপথ নিয়ে আমার সংগ্রামের পথে আমি চলতে চাই। আশির্বাদ করেন সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি শহীদ করে দিতে পারি।'

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর এই কামনা পূরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

বিলালের কাছে তিনি লিখলেন : 'দোয়া কর, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জানমাল কুরবানীর যে শপথ নিয়েছি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে, জীবনের বিনিময়ে হলেও যেন তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারি।'

১৯৬৯ সাল। পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা না ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারীরা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে দাবি তুলে। '৬৯ সালের ২রা আগস্ট

www.icsbook.info

'নিপায়' ছাত্রদের আহ্বান করা হলে শহীদ আবদুল মালেকের যক্তিপূর্ণ বক্তব্যে শ্রোতারা ইসলামী শিক্ষার পক্ষে তাদের সমর্থন দিল। ফলে শহীদ আবদুল মালেক হলেন বাতিলের নতুন টার্গেট। শুরু হল নতুন ষড়যন্ত্র। 'ডাকসু'-র নামে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষে প্রস্তাব পাশ করতে ১২ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষের কয়েকজন আলোচনা রাখতে চাইলে তাদের সুযোগ দেয়া হল না।

কিন্তু ওদের পক্ষ থেকে আপত্তিকর বক্তব্য চলতে থাকলে শুরু হয় প্রতিবাদ। ইসলাম-বিদ্বেষীদের সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রকর্মীদের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব থেকেই টার্গেটকৃত শহীদ আবদুল মালেকের ওপর গিয়ে পড়লো সমস্ত আক্রোশ। সন্ত্রাসীরা নিরীহ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সেখানেই কয়েকজন আহত হয়। সন্ত্রাসীদেরকে আরো সু-সজ্জিত হতে দেখে শহীদ আবদুল মালেক কয়েকজনকে সাথে নিয়ে রেসকোর্স ময়দানের দিকে চলে যান। সন্ত্রাসীরা সেখানেই তাঁকে ঘিরে ফেলে মাথায় রড ঢুকিয়ে, হকিস্টিক, লাঠি দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। শহীদ আবদুল মালেক সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায়।

১৫ই আগস্ট শহীদ আবদুল মালেক বেলা শেষে শাহাদাতের অমিয় পিয়ালা পান করেন। (ইন্না.... রাজিউন)। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন একটি আদর্শ। করে গেলেন একটি আন্দোলনের সূচনা- যাকে মনজিলে মাকসুদে পৌছে দেবার দায়িত্ব আমাদের।

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

বি শে ষ র চ না

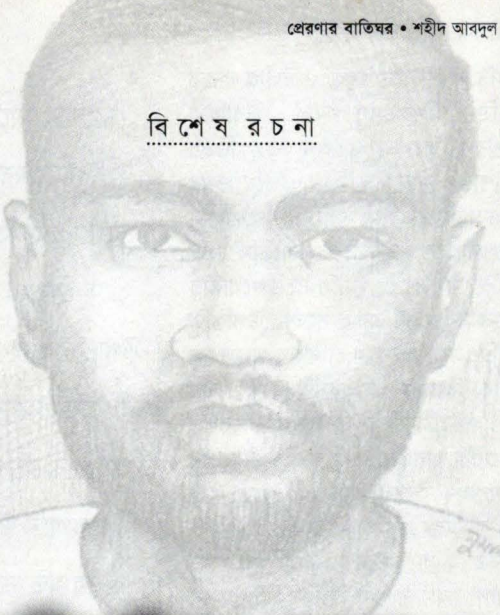

বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব ও শহীদ আবদুল মালেক

মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম

ইসলামী জীবনধারায় নেতৃত্বের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম নেতৃত্বকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পত্তি মনে করেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের গুণ বা যোগ্যতা অর্জনসাপেক্ষ। ত্যাগ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বলিষ্ঠতার অধিকারী একজন মানুষ নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের মানে অবশ্যই উন্নীত করতে পারে। একই সাথে ইসলাম জন্মগত নেতৃত্বকে অস্বীকারও করে না। সব নবী-রসুলই মর্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম জীবনে খুবই কষ্ট করেছেন। বারবার ষড়যন্তের শিকার হয়েছেন, ক্রীতদাসের জীবন কাটিয়েছেন, জুলুমের কবলে পড়ে জেলে গিয়েছেন এবং সবশেষে নেতৃত্ব ও ক্ষমতার শীর্ষে উঠে এসেছেন। এই সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁর মজবুত ঈমান, ঈর্ষণীয় সচ্চরিত্র, পবিত্র স্বভাব, ধৈর্য এবং সংকট উত্তরণের অসাধারণ নৈপুণ্য। এই সত্যের পাশাপাশি আরো একটি সত্য ছিল যে, তিনি নবী হযরত ইয়াকুবের (আ) এর সন্তান ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) আরবের অতি সম্মানিত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের বিকাশধারায় বংশীয় কৌলীন্যের একটি প্রভাব নিশ্চয়ই থেকে থাকবে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর অতুলনীয় ঈমান, ধৈর্য ও প্রজ্ঞা, অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যে তাঁকে বিশ্বনেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যে কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত জনবল দুটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত থাকে। একসাথে থাকে নেতৃত্ব- যার অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, ধী শক্তি, কার্যকর রণকৌশল, সর্বোপরি

www.icsbook.info

জনশক্তিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করার মত সম্মোহনী শক্তি। অপরভাগে থাকে কর্মীবাহিনী যার অপরিহার্য শ্রবণ, শৃংখলা ও আনুগত্য, নির্ভয় সাহসিকতা, সর্বোপরি আপন লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলার প্রেরণা, পরিশ্রম ও ত্যাগ। নবী-রাসুলদের আন্দোলন, পরবর্তীকালের ইসলামের মুজাহিদদের সংগ্রাম, এই উপমহাদেশের বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বত্র এই একই সত্যের উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। বিশেষ করে পৃথিবীর সফলতম বিপ্লবের মহানায়ক আমাদের প্রিয়নবী (সা) এর নবুয়ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনের সকল কর্মকান্ড, সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় তৎপরতা গভীরভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই সর্বত্রই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার ছাপ। সেই ছোট বেলায় পবিত্র কাবা ঘরের মেরামতের সময় 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর যথাস্থানে প্রতিস্থাপন নিয়ে সৃষ্ট বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে সকল গোত্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন তিনি অভাবনীয় প্রক্রিয়ায়। আরবের এত বাঘা বাঘা নেতাদের মাথায় যে বুদ্ধি আসেনি, শিশু মুহাম্মদ সেই সমাধান দিয়েছেন মুহূর্তের চিন্তায়। অসাধারণ বিচক্ষণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবুয়ত লাভের পর কখন গোপনে সবার অলক্ষ্যে দাওয়াতী কাজ করতে হবে এবং এই দাওয়াত প্রকাশ্যে দিতে হবে এ ব্যাপারে তাঁর সময় পছন্দ ছিল শতকরা একশত ভাগ সঠিক। একটি নির্দিষ্ট সময় নিজের এবং সঙ্গী সাথীদের উপর অকারণ অমানুষিক নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন বোবার মত। নিজের অবস্থান, সাংগঠনিক মজবুতি, শক্তির ভারসাম্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে তাঁর নির্ভুল ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণই যে এই অসহনীয় ধৈর্য ও অপেক্ষার কৌশল গ্রহণে তাঁকে সাহায্য করেছে তা বলাই বাহুল্য। হিজরত কখন করতে হবে, কোথায় করতে হবে কিভাবে করতে হবে এ বিষয় তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক ও সময়োপযোগী। মদীনায় হিজরতের পর সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব সম্পর্ক সৃষ্টি এবং নজীরবিহীন সংহতি প্রতিষ্ঠা, ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা স্মারকের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকার সম্বলিত মদীনা সনদ তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা,

যে কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত জনবল দুটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত থাকে। একসাথে থাকে নেতৃত্ব- যার অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, ধী শক্তি, কার্যকর রণকৌশল, সর্বোপরি জনশক্তিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করার মত সম্মোহনী শক্তি। অপরভাগে থাকে কর্মীবাহিনী যার অপরিহার্য শ্রবণ, শৃংখলা ও আনুগত্য, নির্ভয় সাহসিকতা, সর্বোপরি আপন লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলার প্রেরণা, পরিশ্রম ও ত্যাগ। নবী-রাসুলদের আন্দোলন, পরবর্তীকালের ইসলামের মুজাহিদদের সংগ্রাম, এই উপমহাদেশের বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বত্র এই একই সত্যের উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

www.icsbook.info

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। যুদ্ধ কখন করতে হবে, কখন আত্মরক্ষা আর কখন আক্রমণ, কখন মদীনায় থেকে যুদ্ধ আর কখন মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ, যুদ্ধের সেনাপতি বাছাই, যুদ্ধক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন ও তাৎক্ষণিক রণকৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি প্রতিটি সিদ্ধান্তের বেলায় প্রিয়নবীর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তারিক মূসা যখন স্পেনে অভিযান পরিচালনা করেন তখন স্পেন পৌঁছার পর তারা বুদ্ধি করে যুদ্ধযাত্রার সকল নৌকা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সহযোদ্ধাদের ডেকে বলেছিলেন, তাকিয়ে দেখ ফিরে পালাবার সব পথই বন্ধ। এখন বিকল্প দুটি মরণপণ লড়াই করে যুদ্ধে জয়ী হওয়া অথবা অপমানের মৃত্যুবরণ। ইতিহাস সাক্ষী এই মরণপণ যুদ্ধে তারিকের কাফেলাই জয়ী হয়েছিলেন। আধুনিক ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে নেতৃত্বের যে সব মৌলিক উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. ক্ষমতার অধিকারী হওয়া

ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমীহ অর্জন করতে হলে মানুষকে কোন না কোন ভাবে ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। এই ক্ষমতা মানুষ নানাভাবে অর্জন করে। যেমন কেউ পদাধিকার বলে ক্শতা ভোগ করে। কেউ অন্যের ক্ষমতার বলে বড়াই দেখায়। কেউ আবার ওজন ছাড়া কর্মকাণ্ড করে ক্ষমতা জাহির করে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে ক্ষমতা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয় এবং গোটা জনগোষ্ঠীকে মন্ত্রমুগ্ধ ও বশীভূত করে অসাধারণ সফলতার সাথে মহত্তর জীবনের লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে যায় তা হলো নেতৃত্বের সম্মোহনী ক্ষমতা। এই সম্মোহনী নেতৃত্বের জন্য আর সব অসাধারণ গুণাবলীর পাশাপাশি প্রয়োজন যথেষ্ট জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা।

২. জনগণকে বুঝতে পারা

আপন জনগোষ্ঠীকে বুঝতে পারার ক্ষমতা নেতৃত্বের এক অপরিহার্য গুণ। জনগণের মন মানসিকতা ও চাওয়া পাওয়ার সঠিক ধারণা না থাকলে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দান সম্ভব হয় না। গণবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আপন সহকর্মী ও জনগণের নিত্য দিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথে একাকার হতে না পারলে তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হয় না। যাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করা এবং যাদের জন্যে কাজ করা তাদের সকলের চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ বুঝার মত বুদ্ধি ও উপলব্ধি নেতৃত্বের সহজাত হওয়া চাই। এক্ষেত্রে শহীদ আবদুল মালেক ছিলেন একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। সাধারণ কর্মী হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল তাঁর অবস্থান। সকলের সমস্যা শুনতেন অত্যন্ত আগ্রহসহকারে, অনুভব করতেন নিজের মত করে এবং সমাধান দিতেন একান্ত আপনজন হিসেবে। একইভাবে এই জনপদের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে তাঁর ছিল চিরচেনা পরিচিতি। তাদের যে কোন দুঃসময়ে তিনি এগিয়ে যেতেন সামর্থকে এক ধাপ মাড়িয়ে একান্ত আপন জনের মত। মতিউর রহমান নিজামী ভাইয়ের 'আমার প্রিয় সাথী' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ডেমরার অগণিত জানমালের ক্ষতি হয়েছে। সংঘের পক্ষ

আবদুল মালেকের মৃত্যুতে সর্বত্র শোকের ছায়া

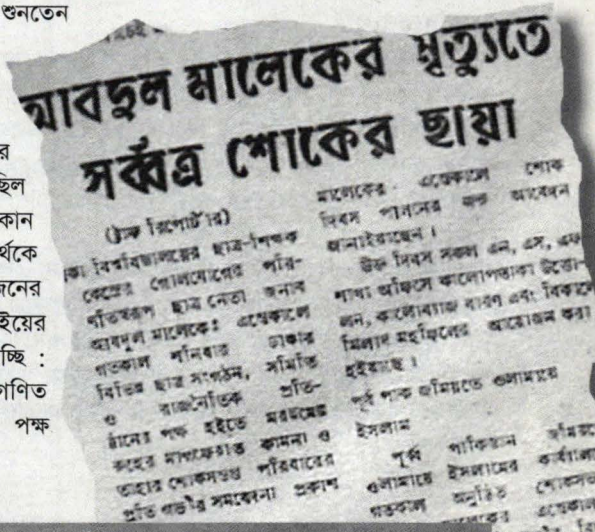

www.icsbook.info

থেকে সেখানে রিলিফ ওয়ার্কে যেতে হবে। ঢাকার কর্মীদের নিয়ে আবদুল মালেক হাজির। সেখানকার অবস্থার দেখাশুনা এবং কায়িক পরিশ্রমে যা কিছু করা যায় তার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কর্মীদের পাঠিয়ে দিল সে। খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। মালেক পাউরুটি নিয়ে ডেমরা যাবে। আমি কাউসার হাউজে গিয়েছি। হঠাৎ এক টেলিফোন এল। বিশেষ কোন কথা নয়। কিছু একটা সাথে নিয়ে যেতে পারছে বলে মনটা একটু হালকা হয়েছে। এবার আমার মনটা হালকা করা দরকার। তাই নিজামী ভাই বলে ডাক দিয়েছি- এই আর কি।"

শিশুর মত বায়না ধরে বানভাসী মানুষের জন্য সম্মেলন ফান্ড থেকে টাকা আদায়, আবার সেই পবিত্র সাফল্যের খুশী প্রকাশ করতে দায়িত্বশীলকে হ্যালো বলার এই মালেক ভাইকেই আমরা হারিয়েছি।

৩. অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারা

আপন জনগোষ্ঠী তথা কর্মী বাহিনীকে উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারা সফল নেতৃত্বের এক অপরিহার্য উপাদান। বিশ্ব ইতিহাসের সকল জনপ্রিয় নেতার এই সত্যটি কমবেশী সক্রিয় ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে শুরু করে ইমাম খোমেনী পর্যন্ত আমরা এই সত্য প্রত্যক্ষ করেছি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী, মুমিনদের যুদ্ধযাত্রার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করুন।" সঙ্গীদের উদ্বুদ্ধ করতে হলে চাই তাদের মনের আকুতি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি। মা যেমন সন্তানের দিকে তাকিয়ে তার সব ব্যথা বুঝতে পারেন, অভিজ্ঞ একজন ডাক্তার যেমন রোগীর দিকে তাকিয়ে তার নাড়ী স্পর্শ করে তার অবস্থা সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারেন, একজন সফল নেতারও তেমনি কর্মীর চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের অবস্থা উপলব্ধি করার যোগ্যতা থাকতে হয়। শহীদ আবদুল মালেকের সেই যোগ্যতা ছিল। তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিদীপ্ত মন সহজেই সহযোদ্ধাদের মনের ভাষা বুঝে নিত। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর ব্যক্তিগত কর্মদ্যোগ ও প্রাণচঞ্চল তৎপরতা প্রত্যক্ষ করার পর কোন অনুসারীর পক্ষে তাঁর কোন নির্দেশ অমান্য করার সুযোগই হতো না। নূর মুহাম্মদ মল্লিকের ভাষায় :"তাঁকে দেখতাম সারাদিন এবং অধিকাংশ রাতভর কত কাজ করতে। ক্লাস করছেন, সময় পেলে পড়ছেন। এরপর আন্দোলনের কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা করছেন। রাতে হয়তো পোস্টারও লাগাচ্ছেন কর্মীদের সাথে। মনে পড়ে মালেক ভাই অনেক সময় পোস্টার লাগাবার পর অন্যান্যদের কাজ শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত একটু সময় পেতেন, তখন সিঁড়িতে ঠেস দিয়ে অথবা পীচঢালা নির্জন পথে একটু বসে বিশ্রাম নিতেন।"

৪. পরিবেশ সৃষ্টি

আন্দোলনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি তথা প্রতিকূল পরিবেশকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার যোগ্যতা যার থাকে সেই নেতৃত্বের উপযুক্ত। অনুকূল পরিবেশে আন্দোলনের প্রয়োজন হয়না। সত্যি বলতে প্রতিকুলতাকে জয় করার নামই তো আন্দোলন। এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সামাধা করার জন্য চাই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। পরিবেশের অনুকূল ও প্রতিকূল সকল উপাদান যথাযথ বিশ্লেষণ পূর্বক উপযুক্ত কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের বিকল্প নেই।

অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব যে কোন আন্দোলনের জন্য একদিকে যেমন আশির্বাদ অন্যদিকে এর কিছু সমস্যা বা নেতিবাচক দিকও রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা এবং ইসলামী ধারণার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে ইসলাম তার অন্তর্গত সংশোধন-পরিমার্জন ও উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের সকল সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে প্রচন্ডভাবে সহায়তা করে। এই অনস্বীকার্য ব্যবধান ছবির মত ফুটে উঠেছে শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের নেতৃত্বের সুবিশাল ক্যানভাসে।

www.icsbook.info

বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের সংকট, সীমাবদ্ধতা ও শহীদ আবদুল মালেক

১. আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রায়শঃ সৌখিন ও আহ্লাদে গোছের হয়ে থাকে। ইসলামে নেতৃত্ব সংগ্রাম, সংঘাত ও কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "মানুষ কি মনে করেছে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?" আবদুল মালেক শহীদ তাঁর সংগ্রামী জীবনের পদে পদে সেই পরীক্ষাই দিয়ে গেছেন। সারাটা জীবন কষ্ট করেছেন। আর্থিকভাবে খুবই অসচ্ছল একটি পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। তাই জীবন যাপনের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত। সেই কচি বয়সে যখন তাঁর মায়ের কোলে থাকার কথা, তিনি থেকেছেন বাড়ি থেকে অনেক দূরে লজিং বাড়িতে। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অথবা সাতরিয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে তাকে। ক্ষুধার যন্ত্রণা, অমানুষিক পরিশ্রম কিংবা দুঃখ-কষ্টের দিনযাপন কোন কিছুই পিচ্ছিল করতে পারেনি তাঁর চলার পথ।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের বেলায় প্রায়শঃ কমিটমেন্টের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ইসলামে নেতৃত্বের কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকার খুবই জোরালো হতে হবে। শহীদ আবদুল মালেক বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের অধিকারী হলেও কমিটমেন্টের অভাব তাঁর একদম ছিল না। তাঁর এই কমিটমেন্ট শুধু যে সদস্য হওয়ার শপথ বাক্যে উচ্চারিত হয়েছে তা নয়, সাবেক লজিং মাস্টার জনাব মহিউদ্দিন সাহেবের কাছে লেখা চিঠির ভাষায়ও তাঁর সেই কমিটমেন্টের প্রতিধ্বনি : "জানি, আমার কোন দুঃসংবাদ শুনলে মা কাঁদবেন। কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণভরে আশির্বাদ করুন, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী যাঁতাকলের নিষ্পেষণ আর ফাঁসির মঞ্চও যেন আমাকে ভড়কে দিতে না পারে।"

আবদুল মালেক শহীদ তাঁর সংগ্রামী জীবনের পদে পদে সেই পরীক্ষাই দিয়ে গেছেন। সারাটা জীবন কষ্ট করেছেন। আর্থিকভাবে খুবই অসচ্ছল একটি পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। তাই জীবন যাপনের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত। সেই কচি বয়সে যখন তাঁর মায়ের কোলে থাকার কথা, তিনি থেকেছেন বাড়ি থেকে অনেক দূরে লজিং বাড়িতে। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অথবা সাতরিয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে তাকে। ক্ষুধার যন্ত্রণা, অমানুষিক পরিশ্রম কিংবা দুঃখ-কষ্টের দিনযাপন কোন কিছুই পিচ্ছিল করতে পারেনি তাঁর চলার পথ।

www.icsbook.info

৩. ত্যাগ ও কুরবানী বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের বেলায় প্রায়শঃ অপ্রত্যাশিত কিন্তু ইসলামে নেতৃত্বকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। শহীদ আবদুল মালেক এক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সকলের জন্য। ছোট বড় সকল প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে তাঁর তুলনা ছিলেন কেবল তিনি নিজেই। চৌধুরী মঈনুদ্দিন, জনাব মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান সহ যারাই তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলেছেন, হল জীবনে প্রায় সময়েই সাথী মেহমানদের চৌকিতে শুইয়ে দিয়ে গভীর রাত জেগে লেখাপড়া শেষ করে তিনি শুয়ে যেতেন মেঝেতে। অতিথিদের বালিশ দিয়ে নিজে বালিশের বদলে ব্যবহার করতেন পুরাতন খবরের কাগজ কিংবা ম্যাগাজিন। সামান্য বৃত্তির টাকা সম্বল করে নিজের জীবন এবং বিধবা মায়ের সংসার চালাতে হতো তাঁকে। তাঁর মধ্যেও যে দরদ নিয়ে মেহমানদারী করতেন তা একেবারেই অভাবনীয়। জনাব নূর মুহাম্মদ মল্লিক এক সময় কোন এক কারণে বেশ কিছু দিনের জন্য মালেক ভাইয়ের মেহমান হয়েছিলেন। তাকে মেহমানদারী করতে গিয়ে নীরবে নিভৃতে শহীদ আবদুল মালেক কিভাবে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটিয়েছেন তার চোখ ভেজানো বর্ণনা দিয়েছেন তিনি তার 'চিরভাস্বর একটি নাম" শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে : "স্কলারশীপের টাকায় তাঁর সবকিছু চলতো। কিছু টাকা মায়ের কাছেও পাঠাতেন। বাকী টাকা খাওয়া পরা ও আন্দোলনের জন্য খরচ করতেন। বেশ কয়েকদিন থাকার পর আমি লক্ষ্য করলাম মালেক ভাই ডাইনিং হলে খাচ্ছেন না। মনে করলাম মজলিশে শূরার বৈঠকের জন্য হয়তো তাঁদের সকলে একসঙ্গে খান সময় বাঁচানোর জন্য। শূরার বৈঠক শেষ হলো। এরপরও তাকে দেখি না। এরপর একদিন দেখলাম তিনি রুটি আনাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, শরীর খারাপ। আমার সন্দেহ হলো, আমার জন্যই বোধ হয় তাকে কষ্ট করতে হচ্ছে। সামান্য ক'টি টাকাতে হয়তো তিনি কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না এবং এজন্য বিশেষ করে আমার ভার বহনের জন্যই যে তাকে অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে বুঝতে পেরে তাঁর কাছ থেকে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম।"

এটাতো তাঁর জীবদ্দশার কুরবানীর সামান্য নমুনা। আর জীবনের সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর পরিক্রমা শেষে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে তিনি এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নজরানা হয়ে রইলেন।

৪. প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠতে প্রায়শঃ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইসলাম নেতৃত্বকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠতে শিক্ষা দেয়। নবী-রসুলগণ নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সত্যের পথে ডেকেছেন। পবিত্র কুরআন বলেছে, "সেই রাসূলদের অনুসরণ করো যারা সত্যপথ প্রাপ্ত এবং যারা তোমাদের কাছে (তাদের দাওয়াতের বিনিময়ে) কোন পারিতোষিক চায়না।" (সূরা-ইয়াসিন ২য় রুকু)। শহীদ আবদুল মালেক এক্ষেত্রেও উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। সকল স্বার্থচিন্তার উর্ধে উঠে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। জনাব মহিউদ্দিন আহমদ সাহেবকে লেখা চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে সেই নিঃস্বার্থ ও নির্মোহ সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন,

"বাইরের পৃথিবীতে যেমন দ্বন্দ্ব চলছে তেমনি আমার মনের মধ্যেও চলছে নিরন্তর সংঘাত। আমার জগতে আমার জীবনে আমি খুঁজে নিতে চাই এক কঠিন পথ, জীবন-মরণের পথ। মায়ের বন্ধন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। বৃহত্তর কল্যাণের পথে সে বন্ধনকে ছিঁড়তে হবে। কঠিন শপথ নিয়ে আমার পথে আমি চলতে চাই। আশির্বাদ করবেন। সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি শহীদ করে দিতে পারি। আমার মা এবং ভাইরা আশা করে আছেন আমি একটা বড় কিছু হতে যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যা সে সব আশা। আমি বড় হতে চাইনে, আমি ছোট থেকেই সার্থকতা পেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে বিলেত ফিরে যদি বাতিলপন্থীদের পিছনে ছুটতে হয় তবে তাতে কি লাভ?"

www.icsbook.info

৫. বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের মধ্যে এক ধরনের অহংকার থাকে যা বাস্তবতার বিবেচনায় স্বাভাবিক হলেও ইসলামী আন্দোলনের জন্য তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ধরাকে সরা জ্ঞান করার শিক্ষা ইসলাম দেয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

"এবং রহমান (আল্লাহ) এর বান্দা তারা, যারা দুনিয়ায় নম্রতার সাথে চলাফেরা করে এবং জাহিল অজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'।"- আল-ফুরকান : ৬৩

"এবং মাটির বুকে দর্পের সাথে হাটবে না। তুমি তো মাটিকে বিদীর্ণ করতেও পারো না আর কখনো পৌঁছাতে পারবে না পাহাড়ের চূড়ায়।" -বনী ইসরাইল : ৩৭

প্রিয়নবী (সা) বলেছেন, "অহংকার হচ্ছে আল্লাহর চাদর। যে ব্যক্তি অহংকার করে সে আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাটানি করে।" আবদুল মালেক শহীদ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও মনের দিক থেকে ছিলেন একেবারেই নিরহঙ্কার। পোশাক বলতে ছিল একটি কমদামী সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবী যাতে ইস্ত্রির দাগ কেউ কখনো দেখেছে বলে জানা যায় না। অনেকের মত নূর মুহাম্মদ মল্লিকও লিখেছেন, সারাদিন কাজ করে রাতের বেলায় তাঁর নিজের হাতে ক্লান্ত শরীরে সেই একমাত্র পাজামা পাঞ্জাবী ধোয়া রুটিন কাজের কথা। কোন এক রাতে সেটি ধোয়া সম্ভব হয়নি বলে সকালে ধোয়া পাঞ্জাবী আধা ভেজা অবস্থায় গায়ে জড়িয়ে মালেক ভাই গিয়েছিলেন মজলিশে শূরার বৈঠকে যোগ দিতে। 'চিরভাস্বর একটি নাম' প্রবন্ধে তিনি আরো লিখেছেন, "মালেক ভাইয়ের পোশাক যেমন সাধাসিধে ছিল, দিলটাও তেমন সাধাসিধে শুভ্র মুক্তার মত ছিল। প্রাণখোলা ব্যবহার তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

৬. বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব অনেক সময় নানা সংকট তৈরি করে আন্দোলনের ভেতরে ও বাইরে। এ সংকটের জন্ম হয় কখনো অনমনীয়তার কারণে, কখনো চিন্তার ফারাক থেকে অথবা কখনো বা নেহাত ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকে। কিন্তু শহীদ আবদুল মালেক তাঁর সাংগঠনিক জীবনের সকল পর্যায়ে সংকট সৃষ্টির পরিবর্তে সংকট নিরসনের কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন অত্যন্ত সফলতার

শহীদ আবদুল মালেক : চলে গেছে ওপারে, সুন্দর জীবনে

www.icsbook.info

সাথে। আবারও মতিউর রহমান নিজামী ভাইয়ের 'আমার প্রিয় সাথী' থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই: "বিরাট সম্মেলনের নিয়ম শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার দিকে মনযোগী হতে পারিনি। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় অনেকটা উদাসীনভাবে চারটা দিন কেটে গেল। এ ফাঁকে সম্মেলনের পরিবেশও অনেকটা নষ্ট হলো। সম্মেলন উত্তরকালে তার প্রভাব দু'এক জায়গায় মারাত্মক আকার ধারণ করলো। এ সময়টা সংগঠনের জন্য যেমন ছিল অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্ত তেমনি আমার জন্যেও। সেদিন আবদুল মালেকের আন্তরিক সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ না পেলে হয়তো আমার পক্ষে আন্দোলনে টিকে থাকাও সম্ভব হতোনা।"

১৯৬৭ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের এ সাংগঠনিক ক্রান্তিকালে শহীদ আবদুল মালেকের ভূমিকা সম্পর্কে তৎকালীন পূর্বপাক সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী বলেন :

"দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সবাই স্বীকার করেছেন, ব্যাপারটা আমাদের সাংগঠনিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু একে স্থায়ীভাবে প্রতিহত করার জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে কেউই সাহস পাচ্ছে না। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। ঢাকা এবং পূর্ব-পাক সংগঠনের নেতৃত্বকে দুর্বল এবং অসহায় মনে করে সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মানসে কিছু সংখ্যক অ-কর্মী কর্মী সেজে এ অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে এগুলো দমন করার জন্য যখন দায়িত্বশীল কর্মীদের রাজী করাতে পারিনি, তখন দায়িত্ব ছেড়ে সরে পড়ার মনোভাব আমার প্রবল হয়েছিল। 'আমার হাতে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে আমি সরে পড়ি, তারপর যাদের উপর দায়িত্ব আসবে তারা পারলে সংগঠনকে বাঁচাবে নতুবা নিজেরাই দায়ী হবে' এমন বাজে চিন্তা আমার মধ্যে একাধিকবার এসেছে। সংগঠন জীবনে এ ছিল আমার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্ত। আবদুল মালেকের একক হস্তক্ষেপে সেদিন দরবেশী কায়দায় এহেন শয়তানী ওয়াস্ওয়াসা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম।"

৭. ইসলামী নেতৃত্বের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের প্রতি, সঙ্গীদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা। প্রচলিত নেতৃত্বের ধারণায় যা প্রায় অনুপস্থিত। পবিত্র কুরআনে প্রিয়নবী (সা) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, "এটা আল্লাহর বড় মেহেরবানী যে আপনি তাদের জন্য কোমল হয়েছেন। আপনি কঠোর ব্যবহার এবং পাষাণ হৃদয়ের হলে এরা আপনার আশপাশ থেকে দূরে সরে যেত।" - আলে ইমরান : ১৫৯

"তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্টে তিনি বিচলিত হন। তোমাদের কল্যাণ বিধানে তিনি অতি আগ্রহী। মুমিনদের জন্য অতি মেহেরবান, অতি দয়ালু।" সূরা-তাওবাহ্ : ১২৮

শহীদ আবদুল মালেক প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তাঁর কর্মীদের। সে ভালোবাসা ছিল নিখাদ নিঃস্বার্থ। তাঁর জীবনালেখ্য রচয়িতা ইবনে মাসুম লিখেছেন :

"কর্মীদের তিনি ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন তাদের দুঃখ-বেদনার সাথী। তাঁর এই আন্তরিকতার জন্য অনেক কর্মীর কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকের মত। কর্মীদের সাথে দেখা হলেই কুশল আলাপ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাঁর রুম ছিল কর্মীদের জন্য তীর্থস্থান। কর্মীদের সাথে আন্তরিকতার সাথে মিশে জেনে নিতেন তার দুঃখ-বেদনা, তার দুর্বলতা, যোগ্যতা সবকিছু। দুঃখে জানাতেন সহানুভূতি। দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করে উপদেশ দিতেন তা শুধরে নিতে। কর্মীর যোগ্যতাকে সামনে রেখে উপদেশ দিতেন, অনুপ্রেরণা যোগাতেন প্রতিভা বিকাশে। ভাবতে অবাক লাগে, প্রতিটি কর্মী সম্পর্কে তিনি নোট রাখতেন। প্রতিটি কর্মীর ব্যাপারে নিজের ধারণা লেখা থাকতো তাঁর ডাইরিতে। এমনিভাবে ভাবতেন তিনি কর্মীদের নিয়ে। ফলে কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় মালেক ভাই, একজন অভিভাবক, একজন নেতা।"

www.icsbook.info

বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের বিকাশের জন্য যা করণীয়

বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের লালন ও বিকাশ একটি অগ্রসরমান ও সম্ভাবনাময় আন্দোলনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই বিকাশের লক্ষ্যে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি কর্মীর ব্যক্তিগতভাবে যেমন কিছু করণীয় রয়েছে তেমনি আন্দোলনের পক্ষ থেকেও কার্যকর ভূমিকা পালনের প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. প্রচুর অধ্যয়ন : জানতে হলে পড়তে হয়। অধ্যয়নের কোন বিকল্প নেই। শহীদ আবদুল মালেক এ বিষয়ে আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আন্দোলনী কর্মকান্ডের শত ব্যস্ততা মালেক ভাইয়ের জ্ঞানার্জনের পথে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এমনকি আর্থিক সংকট সত্ত্বেও তিনি নাশ্‌তার পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনতেন, সংগঠনের এয়ানত দিতেন। অথচ তাঁর রেখে যাওয়া এই দেশের ইসলামী আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা কর্মীই এক্ষেত্রে দুঃখজনকভাবে পিছিয়ে আছেন। জ্ঞান আহরণের জন্য আগ্রহ ও আকুতির অভাব প্রকট। নেতা কর্মী সবাই সারাক্ষণ ময়দানী তৎপরতায় ভীষণ ব্যস্ত। মাঝখান থেকে গোটা আন্দোলনটা যে মেধাশুন্য হতে বসেছে সেদিকে আমাদের নজর দেবার সময় নেই। গত এক মাসে বা এক বছরে কতগুলি উল্লেখযোগ্য বিশ্বমানের ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন জিজ্ঞেস করলে অনেকেরই জবাব দেবার কিছু থাকে না। বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমাজে পরিচালিত কোন আন্দোলনের জন্য এ অবস্থা খুবই অনাকাঙ্খিত ও বিব্রতকর। কমপক্ষে প্রতি দু'মাসে একটি ভালো মানের সাহিত্য অধ্যয়ন নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের নেতা ও কর্মীদের মান অনেক উন্নত হবে।

২. পরিকল্পিত অধ্যয়ন : আমাদের আন্দোলনের যে সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি মোটামুটি লেখাপড়া করে থাকেন তাদের অনেকের অবস্থা এ রকম যে, হাতের কাছে যা পান তাই-ই পড়তে শুরু করেন। এ ধরনের অধ্যয়ন খুব একটা ফলদায়ক হয় না। প্রয়োজন মাফিক পরিকল্পিত অধ্যয়ন খুবই দরকার। শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের জীবন ছিল যথেষ্ট গোছালো। এই পরিকল্পনার ছাপ ছিল তাঁর অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও। শ্রদ্ধেয় কৃতি শিক্ষাবিদ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ-এর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, শত ব্যস্ততার মাঝেও জ্ঞানপিপাসু আবদুল মালেক দীন মুহম্মদ স্যারের কাছে মাঝে মধ্যেই ছুটে যেতেন জ্ঞানের অন্বেষায়। এক্ষেত্রে বই ভিত্তিক অধ্যয়নের চেয়ে বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নের অভ্যাস করা উচিৎ। একটি বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন ক্ষেত্র বিশেষে বিরক্তিকর হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভের জন্য একই বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তকের নানা অধ্যায় পাঠ ফলপ্রসূ হতে পারে।

৩. নির্দিষ্ট বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন : ইসলামী আন্দোলন করতে হলে নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হয়। তবু সব ব্যক্তি সব বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয় না বা হওয়া সম্ভব না। অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বেছে নেয়া এবং সে বিষয়ে ক্রমাগত অধ্যয়ন, চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যুৎপত্তি অর্জন। যেমন কুরআন-হাদীস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং-বীমা, সমাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জনের জন্য বেছে নেয়া যেতে পারে। শহীদ আবদুল মালেক সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে, তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ে যথেষ্ট খোঁজ-খবর রাখতেন এবং পত্রিকার পাতায় এ বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। মরহুম আব্বাস আলী খান এ প্রসঙ্গে এক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে বলেন : "বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর পাকা হাতের লেখা পড়তাম মাসিক পৃথিবীতে। বয়স তখন তাঁর উনিশ-বিশ বছর। একেবারে নওজোয়ান। কিন্তু তাঁর লেখার ভাষা ও ভঙ্গী বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ ও গভীর জ্ঞান তাঁর প্রতি এক আকর্ষণ সৃষ্টি করে।"

www.icsbook.info

আমাদের আন্দোলনে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের খুব অভাব। এ অভাব পূরণের ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

৪. আন্দোলন ও কর্মকৌশল নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা : প্রতিটি অগ্রসর কর্মীকে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, কর্মসূচী ও কর্মকৌশল নিয়ে প্রতিনিয়ত গভীরভাবে ভাবতে হবে। এই ভাবনা হতে হবে গঠনমূলক ও ফলদায়ক যেমন ভাবতেন শহীদ আবদুল মালেক। মতিউর রহমান নিজামী লিখেছেন, কোন সফর থেকে রাজধানীতে ফিরে এলেই শহীদ মালেক ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। খোঁজ-খবর নিতেন বিভিন্ন শাখা ও কর্মীদের সম্পর্কে। জানতে চাইতেন সেখানকার কাজের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে। পরামর্শ দিতেন প্রয়োজনমত।

৫. অধিকহারে সেশন ওয়ার্কশপ : আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওয়ার্কশপ, ব্রেইন স্টর্মিং ও মত বিনিময় সভা করা প্রয়োজন। এর ফলে দায়িত্বশীলদের মধ্যে আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে এক ধরণের অর্ন্তদৃষ্টি তৈরি হবে। প্রত্যেকে আন্দোলনকে নতুন করে ভাববার প্রেরণা ও পথ পাবে। জ্ঞান-বিতরণী আলোচনা সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে দায়িত্বশীলদের যোগদান উপস্থিতি বাড়াতে হবে।

৬. নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি : আন্দোলনের সর্বস্তরে বুদ্ধিচর্চার ব্যাপারে আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। পুরাতন ইসলামী সাহিত্যকে অবলম্বন করে নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহ যোগাতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাকে সামনে রেখে ইসলামী সাহিত্যে নতুন উপাদান ও মাত্রা যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে উন্নয়নের নামে কেউ যেন হঠকারিতা করার সুযোগ না পায়। সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৭. যোগ্যতর উত্তরসূরী নির্বাচন : সম্ভাবনাময় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও চৌকস কর্মী ও দায়িত্বশীলদের অধিকতর সতর্কতা ও যত্নের সাথে আরো অগ্রসর করতে হবে। একজন সফল দায়িত্বশীল তিনি যিনি তার উত্তরসূরী তৈরি করতে পারেন। প্রত্যেক দায়িত্বশীলের টার্গেট থাকবে তার চেয়ে উত্তম কোন ভাইকে তার স্থলাভিষিক্ত করার। মালেক ভাই তাঁর সারা জীবনের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন।

আবদুল মালেক শহীদ আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নজরানা যার সকল ক্রিয়াকান্ডের মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। জীবনের চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এক সাহসী যোদ্ধা, মৃত্যু যাকে পরাভূত করতে পারেনি। তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানপিপাসা। শিশুর মত সরল ও মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত এক ভিন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। অনাড়ম্বর সাদা-মাটা জীবন ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়েও যারা অপরকে অগ্রাধিকার দান করেন তিনি ছিলেন তাদের দলভুক্ত। আসুন আমরা সকলে মিলে এই শহীদের জন্য দোয়া করি এবং তাঁর মত জীবন গড়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.icsbook.info

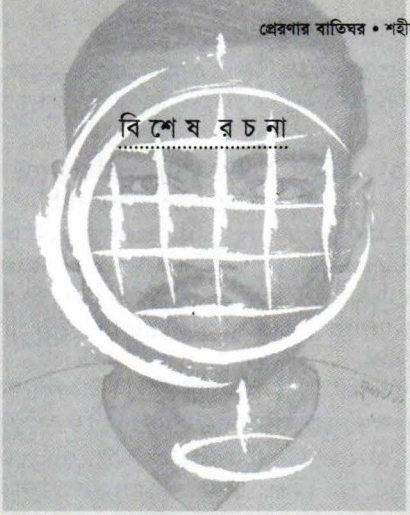

বিশেষ রচনা

নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন

মোশারফ হোসেন মাসুদ

১.

গুহাবাসী মানুষ প্রথম যেদিন আগুন জ্বালাতে শিখল সেদিন তার সামনে খুলে গেল স্বপ্নলোকের চাবি। এরপর আর তাকে বসে থাকতে হয়নি। একে একে উন্মুখ হয়েছে সম্ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত। তারপর সময়ের স্রোতে সভ্যতা পেরিয়ে এসেছে অনেকটা পথ। মানুষের নিয়ন্ত্রণ বলয় বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে মহাজাগতিক বিশ্বে। মানুষ আজ আকাশে উড়তে পারে, সমুদ্রের নীচে ডুবতে পারে, মাটির নীচে হাটতে পারে।

'ইরিডিয়াম' স্থাপন করেছে আ-সমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত টেলিকম্যুনিকেশন নেটওয়ার্ক। তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর সাফল্য গড়ে তুলেছে 'গ্লোবাল ভিলেজ', 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স', নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্পেস রিসার্সে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন- সেও আজ ইতিহাস। মঙ্গলে সফল অভিযানের পর মানুষের দৃষ্টি আজ ভিন গ্রহে বসতি স্থাপনের দিকে, লুনারল্যাগরেনজিয়ান পয়েন্টে মহাশুন্য নগরী গড়ে তোলার দিকে। অভিনব সব পরিকল্পনা নিয়ে একুশ শতকের পৃথিবী এগিয়ে চলছে বিস্ময়কর সাফ্যল্যের দিকে। দ্রুত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবার দক্ষতা অর্জন-ই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদ রূপে গড়ে তোলা।

২.

২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডায় পরিণত হয়। The relevance of human resource development to economic growth only emerged as an important School of Thought after the Second World War. (American Journal of Islamic Social Science 10:2-P-203)

www.icsbook.info

পারমানবিক বোমায় ধ্বংসযজ্ঞের পর জাপান ও জার্মানী মাত্র ৩০ বছরে শুধু ঘুরেই দাঁড়ায়নি বরং তার মানব সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার দ্বারা ধ্বংস স্তূপের উপর গড়ে তুলেছে গর্বিত সাফল্যের মজবুত বুনিয়াদ।

Japan and Germany were totally destroyed during the second world war. The country seemed to be one vast rubble dump. The only resource that these two countries still had was there people. Through effective use, within thirty years they become strong competitors of their erstwhile occupiers. There example shows that human resources play a major part in the process of national development. (Colliens Encyclopedia - 1986)

আজকের বিশ্বে একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গগনচুম্বি সাফল্যের পেছনেও রয়েছে তার মানব সম্পদ ব্যবহারের যথোপযুক্ত প্রয়াস। Between 1929-1982 73 percent of economic growth in the United States was due to human resource development. (A. Aziz, Firm level discussion and human resource development.)

৩.

প্রাকৃতিক আনুকূল্য আর জনশক্তির প্রাচুর্যের এইদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব বরাবরই থেকে গেছে উপেক্ষিত। ফলে, গোলামী যুগের অবসান ও স্বাধীনতার তিন দশক পেরুলেও আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন-সাধ পূরণ হয়নি। আসেনি কাংখিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নিশ্চিত হয়নি সুশাসন তথা জনজীবনে আসেনি শান্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তা। আমাদের প্রত্যাশা পূরণে, সমৃদ্ধ জাতি গঠনে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা সমূহ হচ্ছে- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, আত্মসাৎ, দুর্নীতি, ঋণখেলাপী, চোরাচালানী, কালোবাজারী, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদি আর এসবের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এদেশের শিক্ষিত এমনকি উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত জনসম্পদ রূপে গড়ে তুলে জাতিগত সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এগিয়ে নিতে পারেনি। দেশের শিক্ষার হার বাড়লেও আসেনি গুণগত উৎকর্ষতা, নৈতিক উন্মেষ। মূলতঃ মানবিক মূল্যবোধ এবং আদর্শিক চেতনা ছাড়া প্রতিশ্রুতিশীল দেশপ্রেমিক, মূল্যবান মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় দ্রুত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিযোগতার ধারায় নিজেদের টিকিয়ে রাখা।

আমাদের স্বাধীনতার উষালগ্নে ('৬৯) বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত ও জনপদে আদর্শিক চেতনাদৃপ্ত মূল্যবান মানব সম্পদ সমৃদ্ধ এ সম্ভাবনাময় স্বদেশ ভূমির স্বপ্ন দেখেছিলেন ষাটের দশকের এক প্রত্যয়ী তরুণ। স্বপ্ন দেখেছিলেন একুশ শতকের আলোকিত সূর্যদয়ের এক আলো ঝলমল নতুন পৃথিবীর।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে পরাস্ত প্রতিপক্ষ তাকে হত্যা করলেও রুখতে পারেনি তাঁর সে আদর্শের পুনঃজাগরণ থেকে। আদর্শিক শিক্ষা আন্দোলনের বেগবান ধারায় জীবিত মালেকের চাইতে আজ শহীদ আবদুল মালেক অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী প্রেরণাদায়ী। যে তরুণ কাফেলা আজ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ মালেকের স্বপ্ন পূরণে দুর্জয় নির্ভিক- '৬৯ এ তাদের জন্মই হয়নি। শহীদি রক্তস্নাত দুর্গম পথে বর্তমান চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার আদর্শ মানুষ গড়ার দুর্জয় শপথে শিবিরকেই এগিয়ে যেতে হবে আলোকিত পৃথিবীর পথে, কাংখিত মুক্তির মোহনায়। আর 'জীবনের চাইতে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি, শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি।'

লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

www.icsbook.info

প্র ব ন্ধ

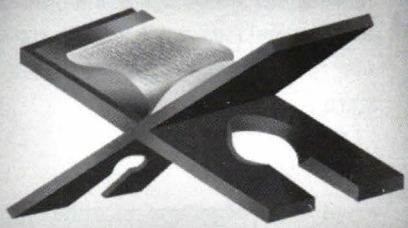

ইসলামী শিক্ষার ক্রমবিকাশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. এম. আতাউর রহমান

ভূমিকা

ইসলামী শিক্ষার ক্রমবিকাশের পথ কুসুমাস্তীর্ণ কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। মহানবীর (সা) আমল থেকেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমবিকাশের পথে চরম প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করানো হয়েছিল। সে প্রতিবন্ধকতা আজও অপসৃত হয়নি। বরং প্রকৃতিগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। আজও যারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেন, তাদের সমালোচনা থেকে শুরু করে এমন কোন পন্থা নেই যা আবলম্বন করা হয় না। কোন কোন সময় শারীরিক এবং

www.icsbook.info

ইসলাম সর্বদাই প্রত্যাশা করে যে, মানুষ তার আকল ও সামর্থ দিয়ে আল্লাহর দুনিয়ায় যেখানে যে বৈধ জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যবস্থা বলবৎ আছে সেখান থেকেই তা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী তার জীবনাচার গড়ে তুলবে। তাতে ব্যক্তি, সামাজিক, জাতীয় ও পার্থিব এবং আখিরাতের জীবন অনাবিল শান্তিময় হবে।

মানসিক নির্যাতনের মত ঘৃণ্য উপায়ও অবলম্বন করতে কসুর করা হয় না। দেশ, সমাজ, জাতি, ধর্মভেদে সর্বত্রই একই অবস্থা বিরাজ করছে। অমুসলিম দেশে তো বটেই এমনকি মুসলিম দেশেও এ অবস্থার ভিন্ন কোন চিত্র চোখে পড়ে না। এর পরও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রচেষ্টা থেমে নেই। দেশে দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান প্রবন্ধকে কতকগুলো অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির প্রথমে এ ব্যাপারে কি ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তার কোন ইতিহাস তেমন জানা যায় না। মহানবীর (সা) আমল থেকেই প্রকৃত পক্ষে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা যায়। কাজেই বক্ষমাণ আলোচনাকে সে আঙ্গিকেই সাজানো হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা কি?

ইসলামী শিক্ষা কাকে বলে তা জানার পূর্বে আমাদের জানা দরকার শিক্ষা কি? 'শিক্ষা' ইংরেজি Education শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Eden' এবং 'Ducer-Duc' থেকে এসেছে। এগুলোর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। ব্যাপকভাবে বললে বলা যায় যে, তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া এবং সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে তোলার নাম শিক্ষা[১]। Education শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশক।[২] এ পর্যন্ত শিক্ষার যেসব সংজ্ঞা জানা গেছে তার মমার্থ বিশ্লেষণ করলে এর যে উদ্দেশ্য জানা যায় তন্মধ্যে প্রবৃদ্ধি দান করা, উন্নত করা, পূর্ণতা আনয়ন করা, জাগিয়ে তোলা, অভ্যাস করানো, উপদেশ দেয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে নিবৃত রাখা, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা, সম্প্রসারিত করা, পথ প্রদর্শন করা, প্রেরণা দান করা, সন্ধান দেয়া, নিয়মানুবর্তি করা, সংস্কৃতবান করা, সৌজন্য শেখানো, বিনয়ী ও অমায়িক বানানো, আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া, উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বানানো, প্রথাসিদ্ধ করা, মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, বিবেচনা ও বিচার শক্তি বৃদ্ধি করা, উদ্ভাবন করা, গবেষণামুখী করা ইত্যাদি প্রধান।[৩]

মোটকথা হল যে শিক্ষা মানুষকে তার মধ্যকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও দক্ষতাকে জাগিয়ে তুলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানবান করে তোলে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে তাকে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বলা যায়। আর ইসলামী শিক্ষা হল ইসলামের হুকুম-আহকাম অনুধাবন, তা মেনে চলার পন্থা লাভ এবং বাস্তবায়নে ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করার ব্যাপক প্রক্রিয়া। আল্লাহকে চেনা-জানা, তার নির্দেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানা, নবী-রসূলদের জীবন পদ্ধতি অবহিত হওয়া, তাদের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করার

www.icsbook.info

শিক্ষাই হল ইসলামী শিক্ষা[৪] -এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় শিক্ষাই অন্তর্ভুক্ত। এ উদ্দেশ্যে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা-সমিতি, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, অধিবেশন ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম সর্বদাই প্রত্যাশা করে যে, মানুষ তার আকল ও সামর্থ দিয়ে আল্লাহর দুনিয়ায় যেখানে যে বৈধ জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যবস্থা বলবৎ আছে সেখান থেকেই তা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী তার জীবনাচার গড়ে তুলবে। তাতে ব্যক্তি, সামাজিক, জাতীয় ও পার্থিব এবং আখিরাতের জীবন অনাবিল শান্তিময় হবে। কালামে পাকে এভাবেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সুরা আলাকে নির্দেশ এসেছে 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে- যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"।[৫] মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা, ভাল-মন্দের নির্ধারক, পাপ-পূণ্যের বিচারক এবং সমস্ত আসমান ও জমিনের অধিকর্তার সম্বন্ধে সম্ভব সকল প্রকার জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিচ্ছেন। মহানবী (সা) 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ' বলেছেন এমনকি জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনের মত দূরবর্তী স্থানে গমনের জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা ও মহানবী বিশেষ কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। আবার এমন বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করতে বলেননি যা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে গাফিল করে দেয় এবং তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলামী শিক্ষার ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর আবির্ভাবের সময় শিক্ষা ব্যবস্থার যে অবস্থা ছিল তা নিতান্তই হতাশাব্যাঞ্জক এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য। সে ব্যবস্থায় সভ্য ও দক্ষ জনশক্তি নয় বরং একটি বিশৃংখল এবং খোদাবিমুখ জাতির কিছুটা প্রয়োজন মিটত। একটি সুসভ্য-কল্যাণকামী জাতি ও সমাজ কাঠামো তা দিয়ে কোন ক্রমেই গঠন করা সম্ভব ছিল না। তাই আবু জেহেলের মত ব্যক্তিবর্গ শিক্ষিত হওয়ার পরেও তারা সমাজে শৃংখলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলারই বীজ বপন করে রেখেছিলেন। মহানবী (সা) মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা 'সুফ্ফা' কায়েম করেন। এর ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার পাঠ্যক্রম, বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, বিদেশে দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রেরণ তথা একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি নির্মাণের নীতিমালা ছিল অতুলনীয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। এমনকি ঘরের দাসী-বাঁদীরাও[৬] মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ লাভ করতে থাকে। একবিংশ শতকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা আজও যা নিশ্চিত করতে পারিনি। মহানবী (সা) যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, তা পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে আরো মজবুত ও বিকশিত হয়।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগ

মহানবীর (সা) ওফাতের পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৬৩২ থেকে ৬৩৪ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত তার শাসনকালে সুফ্ফা ভিত্তিক কার্যক্রমের আরো বিস্তার ঘটান। তাঁর আমলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং শিক্ষা কার্যক্রম সফল ও অব্যাহতভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য আলেম নিয়োগ করা হয়। ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফিজ শাহাদাত বরণ করায় তিনি যায়িদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কাজ সুসম্পন্ন করে যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা অতুলনীয়। রাসূল (সা) এর উপর অবতীর্ণ কালামে পাকের যেসব আয়াত পাথর, কাপড়, কাঠ, চামড়া এবং গাছের পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল, তা তিনিই সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত আকারে 'মাসহাফ' নামে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন।

www.icsbook.info

ইসলামী জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ছিলেন হযরত আবু বকরের (রা) মতই বিশাল পণ্ডিত ও জ্ঞানী। তাঁর আমলে ইসলামী শিক্ষার আরো ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। তিনি মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষাকে আরো আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং হস্ত লিখন, অংক শিক্ষা, অশ্ব চালনা, বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ, আরবী সাহিত্য পাঠ, শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। তিনি শিক্ষার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার মানসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি বিদেশেও শিক্ষক ও আলেম প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর আমলে নানা স্থানে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠে। তিনি বেদুঈনদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এরপরে তৃতীয় খলিফা ও অহী লেখক হযরত উসমান (রা) এর আমলে আল কুরআনের নির্ভুল ও ধারাবাহিক সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। যায়েদ বিন সাবিতের (রা) নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক রক্ষিত 'মাসহাফ' ও অন্যান্য লিখিত কপি সংগ্রহান্তে নির্ভুল সংস্করণ প্রস্তুত করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান মসজিদগুলোতে বক্তৃতা (Lecture) পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁর আমলে কুরআন মজিদ শিক্ষা দানের পাশাপাশি গণিত শাস্ত্র, কাব্যচর্চা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল সহ অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। হযরত উসমান জনগণকে শিক্ষার ব্যাপারে এত বেশী উৎসাহিত করে তোলেন যে, ধনীদের বাড়িতে কাব্যচর্চা ও কবিতা পাঠের আসর বসত। তিনি আরো মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।

ইসলামী শাসনের স্বর্ণযুগ খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ ও সর্বশেষ খলীফা এবং মহানবীর ঘোষণা অনুযায়ী 'জ্ঞানের দরজা' (Gate of Knowledge) হযরত আলী (রা) অসাধারণ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মেধাশক্তির বরকতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জিত হয়। অন্যতম অহী লিখক হযরত আলী (রা) আরবী ব্যাকরণ ও নীতি শাস্ত্রে (Ethics) সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলী' আরবী সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি আরবী ব্যকরণ রচনায় সর্বাত্মক পৃষ্টপোষকতা প্রদান করেন। তাঁর শাসনামলে ইরাকের কুফা জামে মসজিদ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। জ্ঞান-পিপাসুদের কুরআন-হাদিস শিক্ষা দানের জন্য তিনি নিজেই এখানে আসতেন। তিনিই সর্বপ্রথম হাদিস সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এটি 'সহীফা' নামে পরিচিত। এতে ৫৮৬টি হাদিস সংকলিত হয়। স্বভাবকবি হযরত আলী সামরিক ও যুদ্ধ বিষয়ক অনেক কবিতা রচনার গৌরবের অধিকারী। শিক্ষা বিস্তারে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বস্তুতঃ খোলাফায়ে রাশেদার আমল ইসলামী শিক্ষাসহ এ পর্যন্ত ইসলামের জন্য স্বর্ণযুগ (Golden age) হিসেবে পরিচিত। মসজিদ ভিত্তিক যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা সে যুগে গ্রহণ করা হয় সমগ্র পৃথিবীতে তা একবাক্যে সমাদৃত হতে থাকে। এ স্বর্ণযুগেই ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখা ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, ব্যকরণ রচনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি গতি লাভ করে। এ আমলে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রবর্তন শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।[৭]

উমাইয়া আমল

খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে ৬৬১-৭৫০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত উমাইয়া শাসনামলেও ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এ আমলের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন খলিফা যেমন খলিফা আবদুল মালিক, প্রথম ওয়ালিদ, ওমর বিন আবদুল আজিজ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান

www.icsbook.info

রাখেন। এ যুগের উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান ঃ

১. আরবী ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে।
২. আরবী ভাষায় হরকত ও নোক্তা প্রবর্তিত হয় এবং উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে।
৩. প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে সুমাইয়ের কর্তৃক কুরআনের তাফসীর রচিত হয়।
৪. ফারসীতে লিখিত অনেক মৌলিক ও বিখ্যাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।
৫. ছাত্রবৃত্তি ও শিক্ষকদের বেতন নীতি ঘোষিত হয়।
৬. হাদিস সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধকরণ ত্বরান্বিত হয়।
৭. চিকিৎসা, রসায়ন, ফলিত বিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিদ্যার উপর অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
৮. হাসপাতাল, অবৈতনিক বিদ্যালয়, মক্তব প্রভৃতি স্থাপিত হয়।
৯. ক্বারীয়ানা বিদ্যা ও ফিকাহ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়।
১০. সাহিত্য চর্চা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে সাফল্য ও কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।
১১. গ্রন্থাগার (Library) প্রতিষ্ঠিত হয়।
১২. গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে বাড়িতেই শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্বাসীয় আমল

আব্বাসীয় ৩৭ জন খলিফাদের শাসনামল (৭৫০-১২৫৮) মুসলিম শাসনের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম সময়। কাজেই এ সময়ে ইসলামী শিক্ষার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটে তাকে ঐতিহাসিকগণ 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ আমলের খলিফাগণ তাঁদের সামরিক বিজয়াভিযানের পরিবর্তে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় বেশী আত্মনিয়োগ করেন। ফলে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিশ্ব অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ আমলেই ইসলামী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটি সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামী শিক্ষার বিবর্তনে আব্বাসীয় শাসনামলের যেসব পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১. ধ্বংসপ্রায় ইরাকি, মিশরিয়, গ্রিক ও পারস্য শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংরক্ষণ এবং বিকাশ সাধন করা হয়।
২. শিক্ষা, চিকিৎসা, গণিত, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, মহাকাশ, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাপক গবেষণা ও উন্নয়ন ঘটানো হয়।
৩. উল্লিখিত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।
৪. প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন প্রাধান্য পায় এবং আরবী বর্ণপরিচয় হস্তলিপি বিদ্যাসহ কুরআনের বিশেষ অংশ

বস্তুতঃ খোলাফায়ে রাশেদার আমল ইসলামী শিক্ষাসহ এ পর্যন্ত ইসলামের জন্য স্বর্ণযুগ (Golden age) হিসেবে পরিচিত। মসজিদ ভিত্তিক যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা সে যুগে গ্রহণ করা হয় সমগ্র পৃথিবীতে তা একবাক্যে সমাদৃত হতে থাকে। এ স্বর্ণযুগেই ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখা ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, ব্যকরণ রচনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি গতি লাভ করে। এ আমলে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রবর্তন শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

www.icsbook.info

মুখস্থ করানো হয়।

৫. গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবন (Innovation) এবং আবিষ্কার (Invention) উৎসাহিত হয়।

৬. শিক্ষাকে প্রাথমিক ও উচ্চ এ দু'স্তরে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।

৭. গৃহশিক্ষক ও সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি, পল্লী ও শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন এবং নারী শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৮. দেশের বিভিন্ন স্থানে মাযহাব ভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৯. মসজিদভিত্তিক পাঠ দানের প্রবর্তন করা হয়।

পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা

মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ সালে এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত এ উপমহাদেশ বিধর্মী শাসকদের অধীনে থাকায় এখানে ইসলামের আলো পৌঁছতে পারেনি। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন স্থায়ী হয় ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে এখানে মুসলমান বাদশাহ্গণ রাজ্য শাসন করেছেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্যরূপে দেখা যায় না। দেখা গেলে উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হত। এখানে এই সুদীর্ঘ কালে কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি বা পরিকল্পনা ঘোষণা করতে দেখা যায়নি। এমনকি কোন শিক্ষা সংস্কার কমিটি পর্যন্ত গঠনের নজীর দেখা যায় না। বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ্গণ কোন বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন- এমন ঘটনা চোখে পড়ে না।

মুসলমান শাসনামলে পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার যে অবদানগুলো সম্পর্কে জানা যায় তা নিম্নরূপ ঃ

১. সুলতান মাহ্মুদ (১০০১-১০৩০) গজনীকেন্দ্রিক বেশ উন্নত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সভ্যতা গড়ে তোলেন।

২. সুলতান শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬) আজমীর মসজিদ, দিল্লীতে কুওয়াতুল ইসলাম নামক মসজিদ, ক্রীতদাস শিক্ষা প্রকল্প প্রভৃতির প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শিক্ষাকে নিজ দায়িত্বে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন।

৩. অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০)-(মুহম্মদ ঘোরীর জামাতা) মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, মক্তব, খানকা পরিচালনা, কুরআন-হাদিস, ফিকাহ, উসূল শিক্ষাদান প্রভৃতি কাজে অবদান রাখতেন।

৪. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে বাংলা বিজয়ের পরে এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৫. সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬), তাঁর সুযোগ্য কন্যা সুতলানা রাজিয়া, পুত্র নাজির উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-৬৬) ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৬), খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন খিলজী, সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী, তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক, সুলতান বিন তুগলক (১৩১৫-৫১), ফিরোজ শাহ্ তুগলক (১৩৫১-৮৮) প্রমুখের আমলেও এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বেশ উন্নতি সাধিত হয়। কুরআন-হাদিস ছাড়া তাঁরা তর্কশাস্ত্র, গ্রিক ও মুসলিম দর্শন, শরীরবিদ্যা, ভেষজশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান এবং বেশ অগ্রগতিও পরিলক্ষিত হয়।

www.icsbook.info

৭. লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহুলুল লোদী এবং শাহী বংশের জনক আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলায় শিক্ষার যে সুযোগ সৃষ্টি করেন তা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কেউ কোন দিন ভুলবে না। তাঁদের আমলেই সামরিক শিক্ষা সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় এবং টোল প্রথা চালুর মাধ্যমে হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৮. এরপর মোগল আমল এ উপমহাদেশ দীর্ঘদিন শাসন করে। জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১), সম্রাট হুমায়ুন, সম্রাট শের শাহ (১৫৪০-৪৫) প্রমুখ রাস্তা-ঘাট নির্মাণে বিদেশী নিয়োগ, মসজিদ, মাদ্রাসা, বিদ্যালয় নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

৯. মোগল সাম্রাজ্যের তিন জন শ্রেষ্ঠ বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৫), শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) এবং আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) নিজেরা যেমন উচ্চ শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতেও কসুর করেননি। তাঁদের আমলে মসজিদ-মাদ্রাসার সংস্কার সাধিত হয় ব্যাপকভাবে। বিশেষতঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব (আলমগীর) পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর 'ফতোয়ায়ে আলমগীরী' মাসলা-মাসায়েল শিক্ষার ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসেবে আজও সমাদৃত হয়ে আসছে।

ইংরেজ আমলে ইসলামী শিক্ষা

উপমহাদেশে মুসলিম শাসকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ দেশব্যাপী যে শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলেন ১৭৫৭ সালে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হবার সাথে সাথে তার মাথায় চরম আঘাত এসে পড়ে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্র কাননে ইংরেজ বণিক ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। সে সময় শুধু বাংলাদেশে ৮০ হাজার বিদ্যালয় ছিল। স্যার জন এডামের রিপোর্ট অনুসারে বাংলা-বিহারে ১ লক্ষ বিদ্যালয় এবং প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি করে বিদ্যালয় ছিল। তাঁর রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী এ উপমহাদেশে ৮ ধরনের বিদ্যালয়ে আরবি, ফারসি, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষা দান চলত এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও দক্ষিণ বিহার জেলায় প্রতি ২৫০ জনে গড়ে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এছাড়া অসংখ্য পারিবারিক বিদ্যালয় তো ছিলই। ইংরেজ আগমনের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ায় ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষায় তাদের অর্থানুকূল্য মারাত্মক হারে হ্রাস পায়।

২. ১৮৩৫ সালে ফারসির স্থলে ইংরেজিকে আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা করা হয়- যা ১৮৩৭ সাল থেকে সরকারীভাবে কার্যকর হয়।

৩. সুনির্দিষ্ট পন্থায় ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের ব্যবস্থা করা হয় এবং এলিট শ্রেণীকে 'রক্তমাংশে ভারতীয় কিন্তু মন-মগজে ইংরেজ' বানানোর চক্রান্ত চলে। তারা এতে সফলও হয়।

৪. কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন করে সেখানে প্রশাসন পরিচালনার জন্য কতিপয় মডারেট মুসলিম তৈরির ব্যবস্থা করা হয়।

৫. বিধর্মী সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টির মাধ্যমে তারা মুসলমানদের ছলে বলে কৌশলে পদানত করার নীতি গ্রহণ করে এবং দরিদ্র মুসলমানগণ যাতে ব্যয়বহুল ইংরেজি স্কুলে পড়তে না পারে এবং এলিট গ্রুপে পরিণত হতে না পারে সে ব্যবস্থা করা হয়।

৬. এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইংরেজগণ লর্ড মেকলে, উইলিয়াম হান্টার, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখের পরিকল্পনা অনুসারে আঞ্চলিক ভাষা, মুসলিম নাম, যুক্তি

www.icsbook.info

বিজ্ঞানের পরিভাষা ইত্যাদিতে মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে চাকরীর নিশ্চয়তা স্বরূপ ইংরেজি শিক্ষাকে উৎসাহিত করার সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে।

৭. ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের সচেতনতায় ভীত হয়ে লর্ড কার্জন, স্যাডলার প্রমুখের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে সীমিত আকারে মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ চলতে থাকে, তাও আবার ইংরেজি প্রধান শিক্ষা।

৮. ১৮৫৮ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাবসান এবং বৃটিশ শাসন কায়েমের পরে বিংশ শতকের শুরু থেকে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, ১৯২০ সালে দেউবন্দী উলেমা, নবাব আবদুল লতিফের মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, সৈয়দ আমির আলীর ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের আলিগড় আন্দোলনের কারণে মুসলিম শিক্ষার প্রতি ইংরেজ সরকার অনেকটা নমনীয় হতে থাকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তারই ফলশ্রুতি।

পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষা

নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মুসলিম লীগ (১৯০৬) ও কংগ্রেসের তীব্র আন্দোলন এবং মুসলমানদের Two Nation Theory বা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন কয়েকটি মাদ্রাসা এবং মাত্র ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। নতুন সরকার নব গঠিত রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার ১০ বছর পরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলেও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের জন্য তেমন কিছুই করেনি। বৃটিশ পূর্বে স্থাপিত মাদ্রাসায় যেভাবে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হত সে ব্যবস্থাই বহাল থাকে। ফলে জাতি ইংরেজদের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাই পেতে থাকে।

পাকিস্তান সরকারের কাছে মাওলানা মওদূদী (রহ) এর তথা জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আবেদনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল হয়নি। ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী ১৯৫০ সালে ৪ দফা কর্মসূচী ও ৩ দফা দাওয়াতী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরই তৃতীয় দফার 'ইসলাহে মোয়াশরাহ' (সমাজ সংস্কার ও সংশোধন) এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১. কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলোতে আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ছাড়া আর কোন বিভাগেই ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ও প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না।

২. সরকার বৃটিশ অনুগত শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার দিকেই নজর দেন বেশি। ফলে প্রশাসনে তাদের প্রাধান্য পুরোটাই কায়েম হয়। এতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলার লোকের অভাব প্রকটই থেকে যায়।

৩. পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ভারতীয়দের পক্ষে এবং মুসলিম তথা পাকিস্তান সরকারের বিপক্ষে কাজ করার জন্য একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়- যারা ইসলামকে চিরতরে বিদায় করার জন্য খড়গ হস্ত থাকে।

৪. সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এবং পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করার তেমন কোন ব্যবস্থাই করেনি।

৫. ১৯৪৭ সালের মাওলানা আকরাম খাঁন কমিটি, ১৯৫২ সালে আতাউর রহমান খান কমিটি, ১৯৫৮ সালের শরীফ খান কমিটি, ১৯৬৬ সালে গঠিত হামুদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৩ সালে ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি কমিশন, ১৯৬৯ সালের সর্বশেষ নূর খান কমিটি- প্রায় সবগুলো কমিটির রিপোর্টেই জাতীয় সংহতি এবং তাহজীব-তামুদ্দুনের স্বার্থে জাতীয়

www.icsbook.info

আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি।

৬. কোলকাতা থেকে আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়।

৭. সারাদেশে ইতস্ততঃ এবং বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ফোরকানিয়া, হাফিজিয়া, কাওমী, খারিজী ও দারসে নিজামী প্রভৃতি মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়, এগুলোর উন্নয়ন বা সংস্কারের তেমন কোন চেষ্টা করা হয়নি। যে কারণে এগুলো জাতীয় স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ জনসম্পদ গড়ে তুলতে পারেনি।[৮]

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ

১৯৬৯ সালে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিটি ঘোষিত খসড়া শিক্ষা নীতির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত খসড়া শিক্ষা নীতিতে ইসলামী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজতন্ত্রী ও নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী মহল উক্ত শিক্ষানীতি বাতিলের প্রস্তাব করে। তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা মহানগরী সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ন বিভাগের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষার পক্ষে ক্ষুরধার যুক্তি ও বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করেন। এতে উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতাবৃন্দ তাঁর বক্তব্যকে স্বাগত জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) পুনরায় আলোচনা সভার আয়োজন করলে এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখার দাবী জানালে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং আবদুল মালেকের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালানো হয়। মুষ্টিমেয় সাথীসহ দৌড়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তিনি বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মধ্যখানে কতিপয় সন্ত্রাসী কর্তৃক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৯ মাগরিবের সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

উত্তরাঞ্চলীয় বগুড়া জেলার ধুনট থানার অজ পাড়াগাঁও এর পিতৃহীন সন্তানের গায়ে হাত দিতে ইসলামী শিক্ষাবিরোধী শক্তির হাত কাঁপেনি, একজন মেধাবী ছাত্রের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণের সহনশীলতা তাদের মধ্যে জন্মেনি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতার সমর্থনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সর্বনিম্ন সৌজন্যটুকুও তারা সেদিন দেখায়নি। তারা আশা করেছিল শহীদ আবদুল মালেকের বলিষ্ঠ কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে পারলেই ইসলামী শিক্ষার পক্ষে আর কথা বলার কেউ থাকবে না। কিন্তু শহীদ আবদুল মালেকের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে, কফিন স্পর্শ করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর দরবারে মুনাজাতের মাধ্যমে ইসলামী ছাত্র সংঘের অসংখ্য কর্মী সেদিন শপথ নিয়েছিলেন ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। সেই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীও ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনকে তার অন্যতম মাধ্যমে হিসেবে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। শহীদ আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষার যে বৃক্ষ তাঁর শাহাদাতের রক্ত দিয়ে সেদিন ঢাকার বুকে রোপণ করেন আজ তা শাখা-প্রশাখা ও পত্রে-পুষ্পে পরিপূর্ণ। সারাদেশে অসংখ্য ছাত্রশিবির ও জামায়াত কর্মী শহীদ আবদুল মালেকের বক্তব্য ও অনুপ্রেরণা নিয়ে কাজ করছে। আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণ এভাবেই বেঁচে থাকেন।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন ১৯৬৯ সাল থেকেই অস্থির ছিল। ফলে এয়ার মার্শাল নূর খানের ১৯৭০ সালে দাখিলকৃত রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই ড. কুদরাত-ই-খুদার

www.icsbook.info

নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত ছিল বলে ইসলামী ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন ১ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের বীজ বপন করা হয়। তবে এ সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' ইসলামী শিক্ষা প্রসারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৭৫ সালে সালে আওয়ামী সরকারের আকস্মিক পতন ঘটায় কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা, সাহিত্য ও পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে এবং ১ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কমিশন রিপোর্টে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মাদ্রাসায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় সন্নিবেশের সুপারিশ করে।

এরপর ১৯৭৮ সালে জিয়া সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদ অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এবং তাতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বেতন কাঠামো তৈরি, অবদানের জন্য শিক্ষকদের জন্য পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার সুপারিশ করে। এ সরকারের আমলে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮২ সালে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখলের পরও আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরবি ও ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়। অতঃপর একই সরকারের আমলে ১৯৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিল অধ্যাপক মফিজউদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যের গঠিত কমিটি সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাথে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে ইসলামী শিক্ষার ভাগ্যে নতুন কিছু জোটেনি।

১৯৯০ সালে গণআন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতনের পর নির্বাচিত খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় এরই ফলশ্রুতি। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলো সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যেসব বই-পুস্তক প্রকাশ ও সংস্করণের ব্যবস্থা করেন তাতে কিছু বামঘেঁষা ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটায় ইসলামী শিক্ষার আন্দোলন বাধাপ্রাপ্তই হয়েছে, উৎসাহিত হয়নি। স্থাপিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইতপূর্বে বিভিন্ন সাধারণ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যেমনঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত দেশের সব সরকারী ও বেসরকারী কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সগুলো পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক সিলেবাস প্রণয়ন করলেও এতে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কোন কোর্স সন্নিবেশ করা হয়নি বললেই চলে। বরং ইতিপূর্বে তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে সুশৃংখলার সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলো পরিচালনা করত সে মানও বজায় রাখতে পারেনি।

১৯৯২ সালের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী যেসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে শুধু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম পূর্ণরূপে এবং দারুল ইহসান ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আংশিকভাবে কয়েকটি কোর্স প্রবর্তন করেছে। অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কোর্সও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণরূপে প্রণয়ন করা হয়নি। অধ্যাদেশের মধ্যে এমন কোন বিধান না থাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত

www.icsbook.info

ব্যক্তিবর্গের অনাগ্রহের কারণে এমনটি ঘটেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এছাড়া বেসরকারী খাতে যেসব মেডিক্যাল এবং প্রকৌশল, কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোতে ইসলামী বিষয়ের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতঃপর ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির পরাজয় ঘটলে আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী সরকার ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদার দিকে না তাকিয়ে ২১ বছর পিছিয়ে গিয়ে বিতর্কিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের কাজে লেগে যায়। এতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা আরেকটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে ৫৬ সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয় তার মধ্যে অন্য ধর্মের শিক্ষাবিদ থাকায় অত্যন্ত সুকৌশলে মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষার মূল ধ্বংস করার প্রয়াস চালানো হয়। এ সরকারের আমলে শত শত মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। শামসুল হক কমিশন রিপোর্টের অনেক ভাল দিক থাকলেও মাদ্রাসার সকল স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন, ব্যাপক হারে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ, তৃতীয় শ্রেণীর আগে ধর্মীয় শিক্ষা না রাখা, অথচ চারু-কারুকলা, ললিতকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রবর্তন দীর্ঘমেয়াদে ইসলামী অনুভূতির উপর স্থায়ী আঘাতের ব্যবস্থা করে।[৯]

সার্বজনীন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অজুহাত দেখিয়ে এ রিপোর্টে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শিক্ষা বন্ধের সুপারিশ পেশের মাধ্যমে শামসুল হক কমিশন শুধু ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোর উপর পরোক্ষভাবে বিষোদগার করেছে। কমিটির রিপোর্টে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমান চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থার সুপারিশ করে কমিশন শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে থেকে ইসলামী চেতনা ধ্বংসের নীতিমালাও ঘোষণা করে। উল্লিখিত রিপোর্টের সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত অবস্থায় বাস্তবায়নের পর্যায়ে আসার পূর্বেই সাবেক আওয়ামী সরকার তার কিছু বাস্তবায়ন করে ফেলেছে। এরই প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারের নজীরবিহীন বিপর্যয় ও পতন ঘটে। বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত জোট সরকার ক্ষমতাসীন। এ সরকার দেশে কিভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন, তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

একটা দেশে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও জাতি গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মসজিদ, গবেষণা কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রকাশনা সংস্থা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে শত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান ইসলামী শিক্ষা ও দ্বীনি এলেম বিতরণের জন্য গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলোই বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

১. ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ঃ ১৯৭৮ সালে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর, বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিক অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে ইসলামিক এডুকেশন কমিটি গঠনের ফলে ১৯৭৯ সালে এ সোসাইটি গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বই-পুস্তক প্রকাশ, কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, সেমিনার,

www.icsbook.info

সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে ইসলামী শিক্ষার প্রসারের কাজ করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বই প্রকাশ করেছে।

২. আধুনিক প্রকাশনী ঃ বাংলাদেশে ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি সম্ভবতঃ অদ্বিতীয়। ছোট বড় মিলিয়ে শত শত বই-পুস্তক প্রকাশ করে ইসলামী শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করে এটি ইসলামী আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাজেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আধুনিক প্রকাশনীকে বাদ দিয়ে ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়।

৩. ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ঃ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি উপমহাদেশের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। মাসিক সেমিনার, গবেষণা প্রবন্ধ, গবেষণা প্রজেক্ট পরিচালনা, প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী অর্থনীতির উপর সেমিনার আয়োজন নিয়মিত জার্নাল প্রকাশ, মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি কাজকর্মের মাধ্যমে এ ব্যুরো ইসলামী শিক্ষার প্রসারের জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক, বীমা, বিনিয়োগ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা এর অনবদ্য অবদান। বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও এর অবদান কম নয়। Thoughts on Economics, Islamic Banking and Insurance, সুদ সমাজ অর্থনীতি, Toward an Islamic Common Market এর অন্যতম প্রকাশনা।

৪. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি জার্নাল প্রকাশ, ইসলামী অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা ও গবেষণা অনুদান প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে চলেছে। এ সংস্থা হাসপাতাল, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে যথাক্রমে দুস্থদের সেবা ও পেশাগত শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছে।

৫. ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী ঃ ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য এটি ব্যাংকের একটি অংগ প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রশিক্ষিত করে তোলে। এছাড়া পুস্তক প্রকাশ, গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা এবং উৎসাহ দান করাও এর লক্ষ্য। আল-আরাফাহ, আল-বারাকাহ, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট সহ অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীরও নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ও আল-আরাফাহ ব্যাংক ইতিমধ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছে।

৬. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (BIIT) ঃ ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখার উপর গবেষণা পরিচালনা, সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন, পুস্তকাদি প্রকাশ এবং পরামর্শ ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি অবিরাম কাজ করে চলেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে ইসলামীকরণ করা যায় এর উপর BIIT ইতিমধ্যে সেমিনার আয়োজন এবং সংকলন বের করে সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে।

৭. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (BIC) ঃ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে এ প্রতিষ্ঠানটির অবদানও কম নয়। মাসিক আল ইসলাম, নতুন কলম ও মাসিক পৃথিবী এর নিয়মিত গবেষণা প্রকাশনা। বিভিন্ন মনীষীর জীবনী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বিষয়, সাহিত্য এবং যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব উপস্থাপনের মাধ্যমে পত্রিকা তিনটি ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে অহর্নিশ। এছাড়াও রয়েছে তাদের বিপুল প্রকাশনা।

৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঃ এটিও সাধারণ ও গবেষণামূলক বিভিন্ন বই অনুবাদ ও প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যুগান্তকারী অবদান রেখে চলেছে।

www.icsbook.info

৯. আল-কুরআন সোসাইটি ঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এবং হাদিসের উপর গবেষণামূলক বই প্রকাশ করে ঘরে ঘরে ইসলামের আলো পৌছানোর মহান লক্ষ্য নিয়ে এটি স্থাপিত হয়। সোসাইটি কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

১০. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ঃ প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান আশাব্যঞ্জক নয়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-ই একমাত্র অবলম্বন। আর বেসরকারী খাতে গড়ে উঠা ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগাং (ঢাকা ক্যাম্পাসসহ), দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা এবং এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ঢাকার (রাজশাহীতেও একটি ক্যাম্পাস স্থাপিত হয়েছে) নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটি ঢাকাতেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

১১. তাবলীগ জামায়াত ঃ বর্তমানে তাবলীগ জামায়াত বলতে আমরা যা বুঝি তা ভারতের রাজধানী দিল্লীর উপকণ্ঠস্থ মেওয়াত অঞ্চলে ১৯২০ সালের দিকে প্রথম শুরু হয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ) (১৮৮৫-১৯৪৪) এর উদ্যোক্তা। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তাবলীগের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে পঞ্চাশের দশকে মাওলানা আবদুল আজিজ (রহ) এর প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরে তাবলীগের কাজ শুরু হয়[১০]। মুসলমানদেরকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও কাজ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা প্রদান এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী আমল-আখলাক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্দোলনের জন্ম হয়। জামাতে আগত সকল বয়স ও পেশার পুরুষ মানুষ বিভিন্ন ইসলামী বিষয় নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষার যে সুযোগ পায় তা চরিত্রবান নাগরিক গড়তে বেশ সহায়ক।

১২. জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির ঃ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবির যে ত্যাগ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এটি অতুলনীয়। অন্য সকল সংগঠনের কাজ একত্রিত করলেও এ দু'টি সংগঠনের সমকক্ষ হওয়া মুশকিল। এদের কর্মীবৃন্দ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচী পালন করে থাকে। ইসলামের জন্য জীবন এবং সম্পদ যদি কোন সংগঠন উৎসর্গ করে থাকে তাহলে এরাই সেক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সরকারের কাছে স্মারকলিপি, দাবীনামা পেশ, প্রতিবাদ, বই-পুস্তক প্রকাশ, দাওয়াতী কাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বই বিলি অসংখ্য উপায়ে তারা 'ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো' শ্লোগান সর্বক্ষণ দিয়ে চলেছে। জামায়াত ও শিবির কর্মীদের সকল কর্মকাণ্ডের মূল উৎস ইসলাম। এটিই তাদের আদর্শ, বিশ্বাস। ইসলামের জন্যই তাদের জীবন, এজন্যেই তাদের মরণ হলেও রাজী। একনিষ্ঠ কর্মীবাহিনী বলতে যা বোঝায় তা কেবল জামায়াত এবং শিবিরই, ইসলামী শিক্ষার জন্য কাজ করে চলেছে।

১৩. অন্যান্য সংগঠন ঃ উপরে উল্লিখিত ইসলামী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরো অনেক সংগঠন বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। এসব সংগঠনগুলোর সবই বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত। নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা গেল ঃ

ক. আদর্শ শিক্ষক পরিষদ
খ. বাংলাদেশ ইসলামিক একাডেমী
গ. বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট

www.icsbook.info

ঘ. বাংলাদেশ লার্নার্স সোসাইটি
ঙ. সেন্টার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
চ. সেন্টার ফর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট
ছ. ইনস্টিটিউট অব হায়ার ইসলামিক লার্নিং
জ. ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদ
ঝ. ইসলামিক একাডেমী
ঞ. যুব একাডেমী
ট. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডি সার্কেল।

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, স্টাডি সার্কেল, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, গবেষণা, বই-পুস্তক, বুলেটিন প্রকাশ, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উপায়ে দেশের গণ্যমান্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করে এবং ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের মতামত দেশবাসীর খেদমতে উপস্থাপন করে থাকে।

উপসংহার ঃ

পৃথিবীর অনৈসলামী পশ্চিমা দেশেও আজ ইসলামী শিক্ষার কল্যাণকর দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা চলছে। ইসলামী শিক্ষার উপর বই-পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ এ কাজে মুসলিম দেশসমূহ অনেক পেছনে পড়ে আছে। পশ্চিমা দেশে বিধর্মী সরকার সত্ত্বেও সেখানে ইসলামী শিক্ষার উপর কথা বলতে এবং গবেষণা করতে অসুবিধা হয় না, অথচ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী শিক্ষার পক্ষে কথা বললে শহীদ হতে হয়। এমনকি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য স্মারকলিপি পেশ করেও ব্যর্থ হতে হয়। কাজেই সরকারীভাবে এগিয়ে না এলে ইসলামী শিক্ষানীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পুরো সমাজকে ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত করা প্রায় অসম্ভব। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সরকারকে বুঝিয়ে খণ্ডিত আকারে তা করানো গেলেও যেতে পারে কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে সীমিত আকারে।

ইসলামী নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা ছাড়া দক্ষ, সুশীল, সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক যে গড়ে তোলা যায় না এবং যেহেতু কোন সরকারই তা চায় না অতএব তাদেরই জাতীয় স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামের সাথে গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। একথাটি তাদের মন-মগজে প্রোথিত করতে হবে। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গোটা সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের বসে থাকলেও চলবে না। আসবে সেদিন, যেদিন সমাজ বদলের হাওয়া প্রবাহিত হবে। ইনশ্আল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Joseph T. Shipley, Dictionaty of Word Origins
২. মোঃ আজহার আলী, পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, ঢাকা।
৩. আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭, ঢাকা পৃঃ ৭০-৭১।
৪. ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে দ্রষ্টব্য আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১-৭৪।
৫. আল-কুরআন সূরা আলাক, আয়াত ১-২।
৬. মোঃ আব্দুর রব ও এ.এস.এম. আলাউদ্দীন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ: ২০-২৩।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪-২৬।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৬-১২৫।
১০. হাসান মোহাম্মদ, তাবলীগ আন্দোলন ও তাবলীগ জামায়াত, কওমী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০।

লেখক : অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

 www.icsbook.info

প্র ব ন্ধ

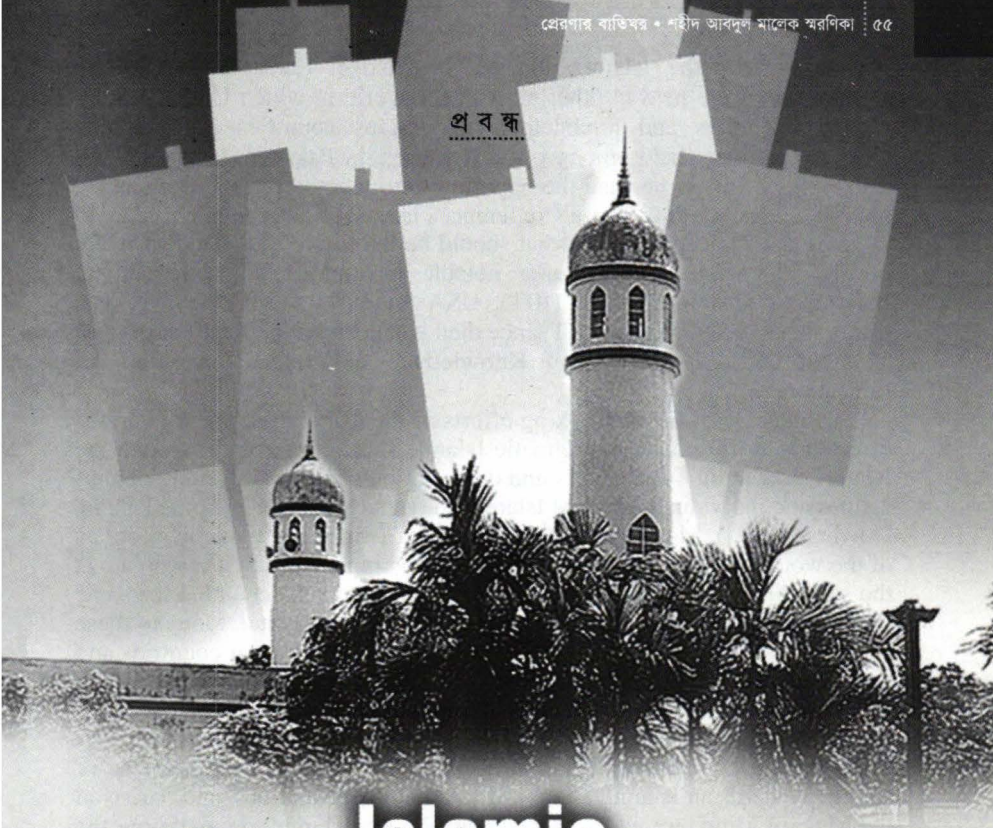

Islamic Education Movement Recent History and Objectives

Shah Abdul Hannan

Islamic Education Movement, which is otherwise widely known as the Movement for the Islamization of Knowledge, as a new phenomenon started its journey sometimes in 1977-1978. A group of scholars thought that the educational system in the Muslim World is not fulfilling the needs of the Muslim countries and that it should be thoroughly revised and updated. In this backdrop, the first Islamic Educational World Conference was held in Makkah in 1977 in which more than 300 academicians, scholars and intellectuals participated. The first Conference made certain significant recom-

www.icsbook.info

mendations for the Islamization of Knowledge. Later on more such Conferences were held in other parts of the world in which Ulama, academicians, scholars and intellectuals of various countries joined. Such Conferences were held among other countries, in Pakistan, Indonesia and Bangladesh. This writer had the opportunity to take part in the Conference held in Dhaka in 1980. These Conferences helped to a great extent in crystallizing and conceptualizing what should be the future shape and structure of the Islamic Education. Later notable institutions like International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA joined in this Movement. Tne prime focus of activities of IIIT since then had been on the Restructuring of Thought and Islamization of Knowledge, including Islamization of Education.

As the outcome of the painstaking efforts of the learned scholars of various disciplines to formulate a pragmatic Islamic Education Policy through the Islamic Education Conferences and contribution of eminent Islamic organizations and individuals, the first Islamic University, the International Islamic University (IIU), Malaysia, was established. Distinguished Islamic scholars of the world, well known for their contribution in relevant fields, who are at the same time specialist in their own discipline and subject and at the same time firm believer in Islam, assembled in the new alma mater. Many of these scholars were leaders of the Islamic Movement in their own countries and were at the forefront of Dawah, Islamic activities in their own arena. Dr. AbdulHamid AbuSulayman renowned scholar and current Chairman of IIIT, USA took the responsibility of the IIU, Malaysia in the initial stage. A prolific writer, Dr. AbulHamid has in his credit a number of publications of which 'Towards an Islamic Theory of International Relations' and 'Crisis in the Muslim Mind' are widely acclaimed. Dr. AbulHamid, on assuming the responsibility of the University, vigorously started the work of Islamization of Education. Arabic and Fiqh, Islamic Law and Jurisprudence were introduced as compulsory university-requirement courses. The University from the very beginning took steps to gradually Islamize the subjects of the social science discipline and the effort is still on.

Later on more Islamic universities have been established in other parts of the world following the model of IIU, Malaysia. One such University has been established in Islamabad (Pakistan), another in Uganda (Africa) and another in Kushtia (Bangladesh). It must be admitted that the Islamic University, Bangladesh has, to some extent, lost direction because of political environment within the country, and the University could not make much headway following the model of IIU, Malaysia; nevertheless it has to be accepted that Islamic University, Bangladesh also made some contribution in the Islamization of Education and Islamization of Knowledge. Later Darul Ihsan University and Islamic University, Chittagong were established with the same mission*.

To many it remains a question why Islamization of Education is important and this demands an in-depth examination and critical and careful analysis Islamization of Education is significant because the root cause of all problems and malaises of the Ummah, the Muslim community, is education. If we look at the setback and crisis of the Ummah, if we evaluate the political,

(Readers are requested to let me know if they know of any other modern Islamic University in other place.)

www.icsbook.info

economic and social dilemma of the - Muslim world and particularly if we refer to the overall scenario prevailing in the Muslim countries from the Islamic point of view and look at them from Islamic vision and perspective then we shall reach to the conclusion that the ultimate reason for all these ills in the Muslim world lies in our failure to restructure the education which shall not only meet the demand of our time but at the same time make a Muslim, a Muslim. Had we been able to educate Muslims, as worthy Muslims there would not have been political, economic and social problems in the Muslim world of the size and level as exist now. Such prominent scholars and academicians as Ismail Raji al Faruqi, AbdulHamid AbuSulayman and Syed Ali Ashraf, eminent educationist, Islamic scholar and founder of Darul Ihsan University Bangladesh share this view.

Islamic educationists and scholars are of unanimous opinion that the root cause of all problems of the Ummah is education, it is more appropriately the crisis of education. Such thinkers and intellectuals identify the failure of the education as being the prime reason of the crisis faced by the world today. They think that education has failed to achieve the desired objective because our education has ignored ethics and morality during the last one hundred years.

The crisis humankind, tne world civilization is facing is because the curriculum of the educational institutions have ignored ethics and morality for at least last one hundred years. As an outcome of this disrespect to eternal moral values, our educational institutions have produced violent and cruel man devoid of love, affection, fraternity, brotherhood and to follow feeling. What has happened in Bosnia, Kosava, Chechnya, Iraq, Kashmir, Afghanistan and more recently in Gujrat in India is the result of modern education, which has produced cruel and violent man. Modern man is not imbibed with the eternal human values and therefore most sophisticated nations do not mind to bomb

Such thinkers and intellectuals identify the failure of the education as being the prime reason of the crisis faced by the world today. They think that education has failed to achieve the desired objective because our education has ignored ethics and morality during the last one hundred years.

What is, therefore, enquired is to reorganize the education on the foundation of ethical principles, to combine moral education with professional education. Professional excellence has to be integrated with morality and ethics, which basically can be derived from religion.

www.icsbook.info

The solution, therefore, lies in combining Islamic values with modern subjects in case of Muslims. Where non-Muslims are in majority as in Japan, China and other countries modern subject should be combined with ethics and morality. Nobody should forget that in the days of globalization and internet in the new millennium no region remains unaffected if any part of it is affected. Therefore the problem has to be addressed both at regional and international levels.

The duty and obligation of the Muslims, the task of the entire humankind is to think and reflect on how to restructure the educational system and not to give over emphasis only on professional knowledge for if we only over emphasize on professional knowledge then we shall only produce robot and not man with soul and values.

unarmed civilian, woman and children in Afghanistan and does not mind to continue sanction against Iraq at the costs the lives of millions of Iraqi children. Nobody can hope to change this sorry state of affairs, to really improve the face of modern civilization unless the educational curriculum is restructured and emphasis is given on moral and ethical values.

What is, therefore, enquired is to reorganize the education on the foundation of ethical principles, to combine moral education with professional education. Professional excellence has to be integrated with morality and ethics, which basically can be derived from religion. As far as Muslims are concerned such values can be drawn from Islam and if Muslim societies are not rectified in the light of the precept and teachings of Islam then the Muslim societies nay the whole world is bound to suffer. That means humankind will suffer. The solution, therefore, lies in combining Islamic values with modern subjects in case of Muslims. Where non-Muslims are in majority as in Japan, China and other countries modern subject should be combined with ethics and morality. Nobody should forget that in the days of globalization and internet in the new millennium no region remains unaffected if any part of it is affected. Therefore the problem has to be addressed both at regional and international levels.

Dr. Abdullnid A. AbuSulayman, former Rector IIU, Malaysia and currently Chairman of IIIT USA addressing a seminar in Dhaka during his recent visit to Bangladesh pointed out: "Muslims are not performing. Bangladesh is not performing. The Muslim world is not performing". He pointed out that in January 2001 (or December 2000) the total GDP of the Muslim world was US $ 1100 billion whereas the GDP of Japan at that time was US $ 5500 billion, five times more than Muslim world whereas Muslim world is spread over from Pacific to Atlantic. Why

www.icsbook.info

this is the condition of the Muslim world, Dr. AbdulHamid asked? "Why are not Muslims performing, why are not Muslims motivated, why are not Muslims big actors in the world scene, why are they only spectators, why they are in the fringe", Dr. AbdulHamid asked his learned audience in the seminar.

Dr. AbdulHamid thinks that Muslims are marginalized because: "We are not motivated". The present educational system has failed to motivate Muslims and one of the foremost reasons of this is that Muslims still have slavish mentality of the colonial period. We could not leave, get rid of slavish mentality. We only imitate. We do not think positively and in a constructive way. We have lost our originality and creativity. Dr. AbdulHamid thinks that we must give due importance education deserves and integrate moral values and ethics with modern professional knowledge. He believes that we as Muslims integrate professional education and social science with Islamic values.

Now if we look back to histoy what we see. If we fall back to Abbasi, Usmania or Mughul period we will find that their educational system did produce army generals or civil servants who studied the then modern subjects and at the same were fully conversant with teachings of the Quran, Sunnah, the Tradition of the Prophet (SAWS), Fiqh, Islamic law and jurisprudence.

There was integration in the educational systems of them. An army officer during the Abbasi used to know not only military science but also such an officer was conversant with the teachings of Quran, Sunnah, Fiqh and Arabic language. Likewise a civil servant was required to study the then professional subjects along with Quran, Sunnah, Fiqh and Arabic. Approximately 150 to 200 years earlier, the system of education was an integrated whole.

What is then the responsibility of the new generation of Muslims? The duty and obligation of the Muslims, the task of the entire humankind is to think and reflect on how to restructure the educational system and not to give over emphasis only on professional knowledge for if we only over emphasize on professional knowledge then we shall only produce robot and not man with soul and values. In fact we have to structure educational system in such a way, for all nations in all countries worldwide, which shall integrate professional knowledge with ethics and morality and we Muslims believe it and are fully committed to it. This can be done on the basis of religion. It should however be made clear that the establishment of Islamic Uriversity does not mean that the door of such educational institutions shall remain closed for the non-Muslims. Islamic University is open for all. Any student can study in such a university and the teachings of Islam shall not be imposed on the non-Muslim student. Non-Muslim student shall have to study only the educational program. It needs to be further examined whether non-Muslim student can be offered optional subjects in some discipline or areas.

The message of Islam is universal. Islam addresses humankind: Ya Ayyuhan nass, O mankind. Ailah has revealed Quran not to divide mankind. The duty of the Prophet (SA WS), was to unite people. Islam teaches man not to take away the rights of others but to protect it. Islam stands for moderation. In real sense there is no extremism in Islam. Islam is a middle way. Allah (SWT) in

www.icsbook.info

Surat Al Baqarah has revealed: "We have created you as a balanced community" (2:143). Allah did not tell that We created you as extreme community. It is, therefore, clear that if we are fully able fo appreciate and realize the true meaning of Islam, when we cannot turn out to be extrernist. There is no reason of non-Muslim being afraid of Islam. If we look back to history then we shall find that Prophet Muhammad (SAWS) established a system in which life, honor and property of the non-Muslims were fully secured. Moreover, in the commonwealth established by the Prophet (SAWS) under the Charter of Medina the Jews were self governing and autonomous and they used to conduct the life according to their own laws. The Muslins used to follow their own law, Shariah and the state was run according to set principles as in the case of defense.

The essence of Islam is Tawheed, which not only means that Allah is one but also it signifies that humankind is one and its honor is indivisible. The objective of the Shariah is welfare of the mankind. Tawheed signifies the welfare of the entire mankind. It also means and implies that believers of Tawheed must always wish, carve and long for wellbeing and happiness of others and must not distinguish between man and man and respect all man. There may be small difference between man and man for various reasons but it is not good to differentiate between man and man. It is against the principle of Tawheed Prophet Muhammad (SAWS) fully absorbed the full meaning of Tawheed. He (SAWS) said in his farewell pilgrimage speech: No Arab has superiority over non-Arab. White colored has no superiority over the black. What is the meaning of this? There is male and female both in white skinned and black skinned people. It signifies that female of a particular race is not superior to male of another race nor male of a particular race is superior to another. Likewise what is the meaning of Arabs and non-Arabs are equal. It means Arab female is to equal to non-Arab male and non-Arab male is equal to Arab female.

It becomes clear from the teachings of the prophet (SAWS) that in spite of small differences Islam makes no significant distinction between man and man as regards their honor, respect and dignity. Islam firmly upholds human equality. These small differences that exists in our society are the result of the prevalent educational system. There is nothing to fear from Islamic education. If Islamic educational system is established in Bangladesh the door of education shall remain wide open for all. There shall be various options open for the non-Muslims to prosecute their studies. New avenues shall be opened and new scopes and opportunities shall be created. Human equality shall be pursued meticulously. The honor, dignity and respect of the non-Muslims shall be vigorously guarded. There shall be no compulsion in respect of religion as enunciated in the Quran: La Ikraha Fiddeen (Surat Al Baqarah: 256).

Writer : Former Secretary, Peoples Republic of Bangladesh
Chairman, Islami Bank Bngladesh Limited.

www.icsbook.info

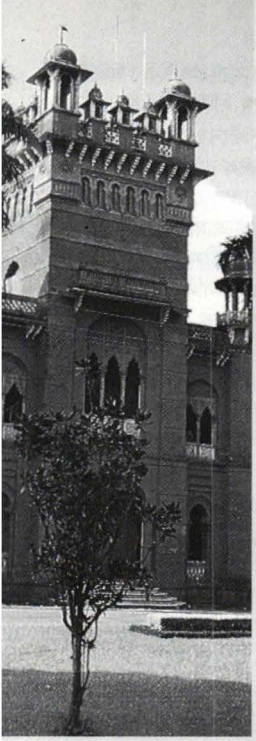

প্রবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস

ওবায়দুল হক সরকার

১৯৫০ সালে আমি সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। আমার বিষয় ছিল ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'শহীদ নজির দিবস' পালন করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনকার মত এত বড় ছিল না, অত বিষয়ও ছিল না, বর্তমান অবস্থানেও ছিল না। তখন কলা বিভাগ ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে। দোতলা বিরাট একটা হল ঘরে বহু ছাত্র-ছাত্রী একত্র হয়ে শহীদ নজির দিবস পালন করলাম। বহু শিক্ষক বহু কথা বললেন। শহীদ নজিরের আত্মত্যাগে অভিভূত হলাম, অনুপ্রাণিতও হলাম। ১৯৫২ থেকে এই দিবসটি আর পালন করা হয়নি। বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট শহীদ নজির একেবারেই অজানা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান শহীদ নজির সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যায় লিখেছেন : 'সম্ভবতঃ এটা ছিল মেয়েদের হোস্টেলে অভিষেক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সম্ভবতঃ লিটন হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আনুষ্ঠানিক কর্মে ও পরিচর্যায় যারা নিযুক্ত ছিল তারা সকলেই ছিল হিন্দু। গেট সাজানো থেকে আরম্ভ করে প্রবেশ পথ, সভাকক্ষ এবং মঞ্চ সাজানো সবই হিন্দু মেয়েরা করেছিল। তাদের আলপনার মধ্যে

www.icsbook.info

স্বস্তিকার চিহ্ন ছিল। প্রবেশ পথের দু'পাশে মাটির হাঁড়ির উপর সিদুঁর চর্চিত শুকানো নারকেল ছিল। মঞ্চটি হিন্দু দেবীর পূজার ঘরের মত সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান যখন আরম্ভ হবে তখন দুটি মুসলমান ছাত্রী প্রবেশ তোরণ এবং মঞ্চ দেখে হল থেকে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসে। এদের দু'জনের একজন হলেন আছিয়া খাতুন আর একজন হচ্ছেন নারায়ণগঞ্জের (নাম অজানা)। এই প্রতিবাদের ফলে বাইরে অবস্থানরত মুসলমান ছেলেরা অভিষেক অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দেবার চেষ্টা করে। অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত হতে পেরেছিল কিনা আজ আমার মনে নেই, কিন্তু প্রতিবাদ যে প্রবল এবং সুস্পষ্ট ছিল তা আমার মনে আছে। ঢাকার চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে যায় এবং মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে। রাতে বিভিন্ন হলে আলোচনা হতে থাকে যে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে। নজির আহম্মদ সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের ছাত্র ছিলেন। তিনি পরবর্তী ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেবেন এটাই ঠিক হয়। ছাত্রদের বুদ্ধি পরামর্শ দেবার ক্ষেত্রে কবি জসীমউদ্দিনের সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। সিদ্ধান্ত হয় যে পরের দিন মুসলমান ছেলেরা ক্লাসে যাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও মিছিল করবে। আমরা ধারণাও করতে পারিনি যে, হিন্দু ছেলেরাও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে শুনেছিলাম পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য ইংরেজির অধ্যাপক পি.কে গুহর বাসভবনে নেতৃস্থানীয় ক'জন হিন্দু ছাত্র মিলিত হয়েছিল। পি.কে গুহ আমার শিক্ষক ছিলেন। তার বাসভবনে যে সভা হয়েছিল তা আমি স্পষ্ট জানতাম না। আমি শুনেছিলাম কবি জসীমউদ্দিনের কাছ থেকে। যাই হোক, দুর্ঘটনা এলো পরের দিন এবং এলো প্রচণ্ডভাবে। সভা এবং মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। কিন্তু অকস্মাৎ হিন্দু ছেলেদের আক্রমণে সংঘর্ষ বাধে এতে নজির আহম্মদ মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি ছুরিকাবিদ্ধ হন। প্রথম এই আঘাতটি কেউ গুরুতর ভাবেননি। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ক্রমশ নজির আহম্মদ দুর্বল হতে থাকেন এবং তখন মিটফোর্ড হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। কবি জসীমউদ্দিন হাসপাতালে সর্বক্ষণ তাঁর শয্যাপাশে ছিলেন। সন্ধ্যার দিকে নজির আহম্মদ মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে কবি জসীমউদ্দিনের হাহাকার ও আকুল কান্নাকে আমি কখনও ভুলবো না।"

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানকে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রবণতা থেকেই ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গভঙ্গ রদের পর বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের শান্ত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্বভাবতই মুসলমান ছাত্রই বেশী ছিল। সাধারণতঃ সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়ের ভয়ে শঙ্কিত থাকে সংখ্যালঘুরা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটলো তার উল্টো। মুসলমান ছাত্র নিহত হলো হিন্দু ছাত্রের হাতে, নজির আহম্মাদ সাধারণ ছাত্র ছিলেন না। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক আবদুল গফুর দৈনিক ইনকিলাব ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যায় লিখেছেন- "শহীদ নজির একজন ছাত্রনেতা ছিলেন। কিন্তু ছাত্রনেতা বলতে আজকাল অনেক সময়ই যা বুঝায় তার বহু উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন আদর্শের সৈনিক, তার সমগ্র জীবন ছিল মানবতার সেবায় নিবেদিত। ফেনী জেলার দক্ষিণ আলিপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৩২৪ সালের ৩ চৈত্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন নজির। পিতার দারিদ্র্যের কারণে প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্য থেকে নজিরকে নিজ চেষ্টায় পড়াশুনা চালাতে হয়। এই অবস্থায় ১৯৩৭ সালে নজির বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৩৯ সালে ফেনী কলেজ থেকে আই.এ পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই নজির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের অন্যতম কেন্দ্রীয় আকর্ষণে পরিণত হন। নজির দুস্থ মানবতার সেবায় তথা সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গণের ক্রিয়াকর্মে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯৪৩ সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সম্মেলনে হিন্দু ছাত্রদের বন্দে মাতরম গান গাওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। টেনিস মাঠে দু'পক্ষের মধ্যে ইট ছোঁড়াছুঁড়ি চলছিল। একদল হিন্দু ছেলে কাছে দাঁড়িয়ে এতে উৎসাহ দিচ্ছিল। ব্যাপারটি যাতে সহজে মিটমাট হয়ে যায় সে জন্য তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। নজিরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারাও অন্তর থেকে অশান্তি চায় না। শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ যাবে না। কিন্তু তা হলো না। অতর্কিতে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়া হলো। ওঃ করে উঠে নজির মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হাসপাতালে পাঠানো হলো। তার কিছু পর হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মাত্র একদিন পূর্বে ছাত্রদের এক সংঘর্ষে কিছু ছাত্র আহত হয়। আহত যারা হাসপাতালে ভর্তি হয় নজির তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন কি হিন্দু কি মুসলমান সকল ছাত্রই তার সেবা পেয়েছিল। মানবতার এমন এক উৎসর্গীকৃত সেবককে এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ডেকে নিয়ে প্রাণ দিতে হবে, এটা ছিল সবারই কল্পনার বাইরে।" হিন্দু ছাত্ররা ছিল বরাবরই হিংস্র। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই।

১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ সার্টিফিকেট পেলাম। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট

www.icsbook.info

দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখলাম সার্টিফিকেটের মনোগ্রামে হিন্দু ধর্মের ছাপ। আমার ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কলকাতায় হিন্দুদের আধিপত্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম প্রধান, পূর্ববঙ্গের ঢাকায় মুসলমানদের আধিপত্য থাকার কথা। বিশেষতঃ মুসলমানদের ঐতিহ্যের প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পেয়ে মনটা একেবারে দমে গেল।

এই সময়ে মহামান্য আগা খান ঢাকায় এলেন। আগা খান সম্পর্কে বহু কথা শুনেছিলাম। তাঁকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। আমার এক আগা খানি বন্ধুর বদৌলতে সে সুযোগ পেয়ে গেলাম। যেই শুনলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অমনি কাছে ডেকে নিলেন। পরদিন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সুযোগ বুঝে সার্টিফিকেটটা তাঁর হাতে দিয়ে মনোগ্রামটা দেখিয়ে বললাম, 'আমরা কি হিন্দুস্তান না পাকিস্তানে আছি। তাঁর হাসিমাখা মুখখানি লৌহকঠিন হয়ে গেল। এরপর যা ঘটল তা নিয়ে কলকাতার পত্র-পত্রিকা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। প্রসঙ্গতঃ কলকাতার দৈনিক যুগান্তর, কলকাতা। ২৭ মাঘ, ১৩৫৭, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদটি তুলে ধরা হলো-

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হিন্দু ধর্মের স্থান?"

ঢাকা ৬ ফেব্রুয়ারী, মহামান্য আগা খাঁর বক্তৃতার অংশবিশেষের সূত্র অবলম্বন করে স্থানীয় হিন্দু এবং বাঙ্গালী বিদ্বেষী ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' সাংবাদিক সততাকে কিভাবে পদদলিত করেছে, তাই দেখুন। মহামান্য আগা খাঁ নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি উপলক্ষে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে তিনবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে A Muslim University বলে গৌরববোধ করেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হিন্দু ধর্মের ছাপ রয়েছে। 'মর্নিং নিউজ' সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে ন্যাক্কারজনক হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপ্তাহে। মর্নিং নিউজে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের চিহ্নবাহী এই প্রতীকের ছবিও প্রকাশিত হয়েছে। মর্নিং নিউজ বলছেন, There are four emblems on it. A Swastika typifying Nazi and Hindu cultures. A Lotus, the Hindu symbol of learning. An Asoka Chakra (wheel) and of course to appease Muslims, a crescent. The crest first adopted in 1921, when the Dacca University was founded still continues to be the emblem for the advancement of learning in the Muslim state of Pakistan.

স্বস্তিকা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। স্বস্তিকা মঙ্গল চিহ্ন। বিশ্বজয়ের কল্যাণ কামনায় দ্যোতক 'স্বস্তিকা'। যা হোক 'মর্নিং নিউজ' এর মতো মোহাজের এতিম বালকের হিনউদ বিদ্বেষ যেভাবে গগনস্পর্শী হতে চলেছে তাতে ওর কাছে 'সুবুদ্ধি' কেউ প্রত্যাশা করেন না।

একথা আজ সকলেই স্বীকার করবেন যে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে ক্রমে সুস্থ দেশাত্মবোধ সঞ্চার হচ্ছে। হিন্দু বিদ্বেষ লোপ পেয়ে প্রবল হচ্ছে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমষ্টির মানুষের সমস্যা বিচারের আগ্রহ। ঠিক এমনি মুহূর্তে 'মর্নিং নিউজ' এর মতো প্রতিক্রিয়াশীল কাগজ তার হিন্দু বিদ্বেষের ম্রীয়মান পুঁজি দিয়ে বাণিজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাইলেও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকে তা এক বাক্যে স্বীকার করেন।

মহামান্য আগা খাঁর বক্তৃতা ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় তা নিয়ে হৈ চৈর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক থেকে হিন্দু ধর্মের স্থান মুছে ফেলে তার স্থলে ইসলাম ধর্মের স্থান তুলে ধরা হলো। 'স্বস্তিকা'র স্থলে এলো 'রাব্বি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম

১৯২১-১৯৫২

১৯৫২-১৯৭২

১৯৭২-১৯৭৩

১৯৭৩ থেকে চলছে

www.icsbook.info

জিদনী এলমা' সম্বলিত আল-কুরআনের প্রতীক। 'স্বস্তিকা'র স্থলে 'আল-কুরআনের' অবস্থান হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। তাই বাংলাদেশ হবার সাথে সাথে 'আল-কুরআনের' প্রতীক সরিয়ে ফেলা হয়। আল-কুরআনের এত বড় অবমাননা একটি মুসলিম দেশে (বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান) অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে আল-কুরআনের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়নি। বাংলাদেশের মুসলমান কি আদতেই মুসলমান! তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে আল-কুরআনের মান নেই?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার পর পূর্ব-বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হলো। শিক্ষা-দীক্ষা সর্বক্ষেত্রে যে ত্বরিৎ উন্নতি হচ্ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। মুসলমান যে তিমিরে, সেই তিমিরেই আবার নিক্ষিপ্ত হলো। মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিবাদে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ বৃটিশ সরকারের কে.সি.আই উপাধি বর্জন করেন। এটাকে তিনি সরকারের ঘুষ বলে মনে করেন। মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বৃটিশ সরকারের নিকট তার ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কলকাতা মোহামেডান এসোসিয়েশনের এক সভায় ক্ষতিপূরণ দাবী করে একটি প্রস্তাবও পাশ হয়।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

শের-এ-বাংলা এ.কে ফজলুল হক

মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ দেখা যায়। বিক্ষুব্ধ যুব সমাজের নেতৃত্ব দেন শের-ই-বাংলা এ.কে ফজলুল হক।

পূর্ব বাংলার অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকায় আসেন। নবাব সলিমুল্লাহ্, নবাব সৈয়দ আলী চৌধুরী, জনাব এ.কে ফজলুল হক প্রমুখ বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই দাবী মেনে নেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়।

www.icsbook.info

হিন্দু সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা

১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবে, তখন আর তাদেরকে সেবাদাস করে রাখা যাবে না। এই ভয়ে রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী পর্যন্ত এর বিরোধিতা করেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতায় গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে তারা সভা করলো। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং বিশ্বকবি। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ জমিদারীর আয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে বোলপুরে শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। অথচ পূর্ববঙ্গে সামান্য একটি পাঠশালা পর্যন্ত স্থাপন করেননি। তার মুসলমান প্রজারা শিক্ষিত হয়ে উঠলে জমিদারে শাসন ও শোষণ চালানো হয়ত বাধাগ্রস্ত হবে, এই ভয়ে তিনি চাননি মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। এই চরম মুসলিম বিদ্বেষী কবির 'সোনার বাংলা' আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হিন্দু সংবাদপত্রগুলো বিষোদগার করতে থাকে। হিন্দু বুদ্ধিজীবি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন শহরে মিটিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করে পাঠাতে লাগলেন বৃটিশ সরকারের কাছে। Calcutta University Commision Report, Vol. IV তে দেখা যায় বাবু গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ স্যার রাম বিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোশ মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলার এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি সহকারে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ডঃ স্যার রাম বিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধিগণ বড়লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবে না।

ঢাকার হিন্দুরা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করতে লাগলেন। 'এ হিস্ট্রি অব ফ্রীডম মুভমেন্ট' গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

The controversy that started on the Proposal for founding a university at Dacca throws interesting light on the attitude of the Hindus and Muslims. About two hundred prominent Hindus of West Bengal. `Headed by Babu Ananda Chandra Roy'. The peading pleader of Dacca submitted a memorial to the viceroy vehement by against the establishment of a university of Dacca. For a long time other wards, They tauntingly by termed this university as Macca University. -(Dacca University. Its role is freedom movement. A History of the Freedom Movement. Vol. IV, Page-10.)

অনুবাদ : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূচনা হলো তাতে হিন্দু ও মুসলিম

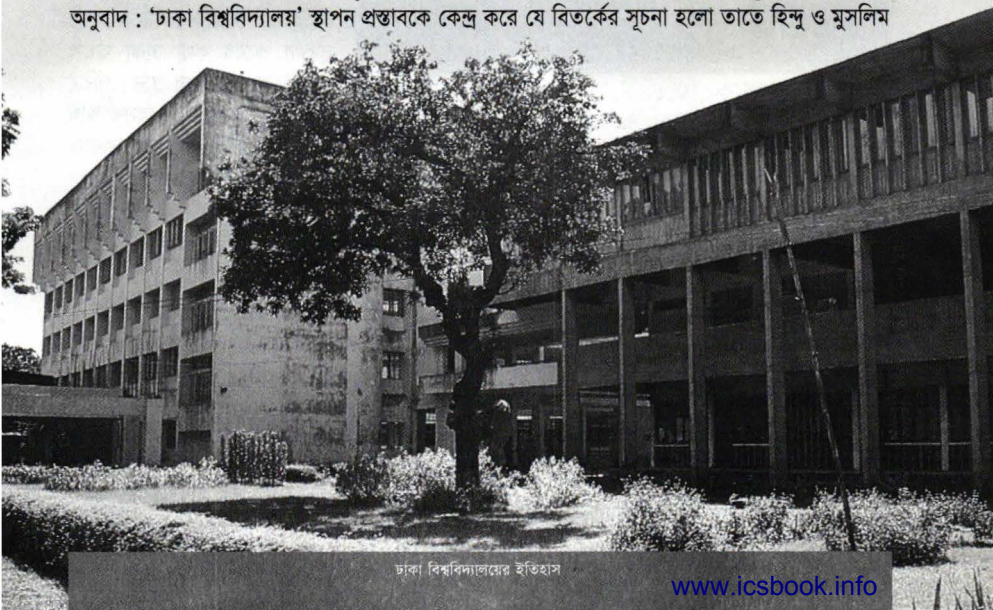

www.icsbook.info

দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ প্রকাশ পেল। ঢাকার নামকরা উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের প্রায় ২০০ (দুইশত) নেতৃস্থানীয় হিন্দু বড়লাটের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানায়। তারা বিদ্রুপ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যায়িত করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দুদের বিদ্বেষ প্রশমিত হয়নি বরং পূর্ণমাত্রায় বিদ্যামান ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক শ্রী দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া এক বক্তব্যে বলেন "কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা নদীর তীরে হরতনা নামক একজন অসূর জন্ম গ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋষি এবং তাদের শিষ্যগণ বাস করেন।এই অসূর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্য নানা প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রমে নিয়ে যাবে। যারা অর্থ লোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে ঐ অসূরের আকর্ষণে বৃদ্ধ গঙ্গার তীরে যাবে, তারাও ক্রমে অসূরত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তারা অশেষ দুর্দশা গ্রস্থ হবে।"

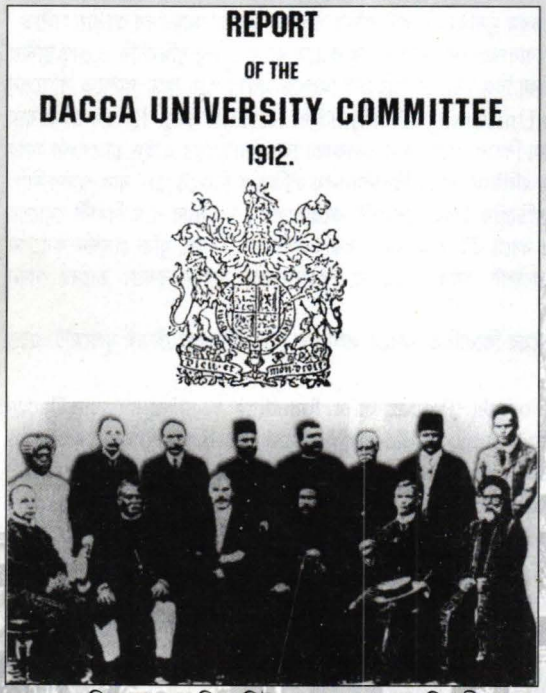

বসে বাম দিক থেকে : জি.ডব্লিউ. কুচলার, ড. রাসবিহারী ঘোষ, রবার্ট নাথান, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এইচ.কে জেমস্, নবাব সিরাজ-উল-ইসলাম। দাঁড়িয়ে বাম দিক থেকে : ড. এস.সি বিদ্যাভূষণ, সি.ডব্লিউ. পিক, ডব্লিউ. এ. আনন্দ চন্দ্র রায়, মোহাম্মদ আলী, ডি.এস ফ্রেজার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর স্যার ফিলিপ জে. হার্টস (১-১২-'২০ থেকে ৩১-১২-'২৫) কে হরতনা করেছেন শ্রী ভান্ডার কর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। শ্রী ভান্ডার করের বক্তব্য হরতনা- যে 'আশ্রম' বলতে বোঝানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। আমাদের 'বুড়িগঙ্গা' হয়েছে শ্রী ভান্ডার করের বক্তব্যে 'বৃদ্ধগঙ্গা'। আর মূল গঙ্গা-তীরের 'পবিত্র আশ্রম' বলতে শ্রী ভান্ডার কর বুঝিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। শ্রী ভান্ডার করের কথা ঢাকা অর্থাৎ পূর্ব বাংলা অসূরদের স্থান। পবিত্র স্থান কলকাতা থেকে যেসব ঋষি শিষ্য ঢাকায় চাকরি করতে আসবেন তারাও অসূর হয়ে যাবে। এ থেকেই বোঝা যায় তৎকালীন হিন্দুদের তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

৪ এপ্রিল ১৯১২ তারিখে ভারত সরকার চূড়ান্তভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব অনুমোদন করে। ২৭ মে ১৯১২ তারিখে বাংলা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি যা নাথন কমিটি নামে সর্বাধিক পরিচিত নিয়োগ করেন। মিঃ রিচার্ড নাথন ও মিঃ ডিঃ এম. ফ্রেজার যথাক্রমে কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন :

১. ডি. ডব্লিউ. ভোটান
২. ডঃ রামবিহারী ঘোষ
৩. নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ধনবাড়ি, ময়মনসিংহ

www.icsbook.info

৪. নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, উকিল, কলকাতা হাইকোর্ট
৫. বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়, জমিদার, ঢাকা
৬. শেখ মোহাম্মদ আলী
৭. মিঃ এম.আর. ম্যাস
৮. ডব্লিউ.এ.জে আর্চবলড, প্রিন্সিপাল, ঢাকা কলেজ
৯. মহামহোপাধ্যায় সতীন চন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ
১০. বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা
১১. সি.ডব্লিউ. ন্যাক, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা
১২. জনাব শামসুল উলামা আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহেদ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট পেশ

নাথন কমিটি যথারীতি ২৪ অধ্যায় বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। ঐ রিপোর্টে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি সবদিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। রিপোর্টটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে ইসলামী শিক্ষা, কলা, বিজ্ঞান, আইন, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়। আরও সুপারিশ করা হয় যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে একজন শিক্ষা পরিচালক স্বয়ং এর সরকারী পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করবেন। নাথন কমিটির রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বছরের জন্য ১২,৯৮,৯১৬ টাকা ব্যয় বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়।

কমিটির সদস্য নওয়াব সিরাজ-উল-ইসলাম, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেখ মোহাম্মদ আলী ও জনাব আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহেদ রিপোর্টে মুসলমান ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও বৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধির করার জন্যে সুপারিশ করেন এবং তারা প্রস্তাবিত বৃত্তি যে অপর্যাপ্ত সে কথাও উল্লেখ করেন। অন্যদিকে রামবিহারী ঘোষ তার মন্তব্যে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের অজুহাতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা স্থগিত রাখে।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সরকারের অনাগ্রহ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। তারা এ ব্যাপারে ক্রমাগত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প বাস্তবায়ন 'অনতিবিলম্বে' সম্ভব নয়।

উত্তরে শের-ই-বাংলা এ.কে ফজলুল হক বঙ্গীয় আইন পরিষদে ৩ এপ্রিল ১৯১৬ তারিখে বলেন যে যখন ব্যয় বহুলতার অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তখন কি করে নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো? সেটা কি ব্যয়বহুল নয়? বস্তুতঃ ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে বলেন- "With a view to prevent a setback in the education all progress of eastern Bengal, we are promised a University at Dacca. Ever since 1912 provinons were being made in every budget for this proposed University, and each year we were told to live on the hope that the university would soon be an accomplished fact. We are now to that a costly project like a university at Dacca is out of the bounds of possibilities in the near future. I can understand that a big scheme like this can not be developed in a day : but does it really take years and years for the scheme to matter and develop it only the will to carry the work through be not wanting?" বাংলায়- "পূর্ববঙ্গে শিক্ষার অনগ্রসরতা দূরীকরণ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস আমাদের দেয়া হয়েছিল। ১৯১২ সাল থেকে প্রতি বছর বাজেটে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় এবং প্রতি বছর আমাদের বলা হয় সেই আশায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাস্তবায়নের আশায় যেন আমরা থাকি। এখন আমাদের বলা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এত বিপুল ব্যয় বহুল প্রজেক্ট অদূর ভবিষ্যতে হাতে নেয়া সম্ভব নয়। আমি জানি এতবড় উন্নয়ন কার্যক্রম রাতারাতি করা সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলে বছরের পর বছর তো লাগার কথা নয়! বাস্তবায়নের ইচ্ছা থাকলেই হয়।"

www.icsbook.info

সেডলার কমিশন

এতদসত্ত্বেও সরকারের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের তৎকালীন সদস্য নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বিষয়টি পুনরায় পরিষদে উত্থাপন করেন এবং অনতিবিলম্বে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব' বাস্তবায়নের দাবী করেন। তখন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ডঃ (নরে স্যার) মাইকেল সেডলারকে সভাপতি করে যে কমিশন গঠন করেন, ঐ কমিশনের উপর প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও গঠনতন্ত্র প্রণয়েনের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং ২৬ নভেম্বর তারিখে আশ্বাস প্রদান করা হয় যে সেডলার কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পরই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব' বাস্তবায়ন করা হবে।

'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয়

২৬ নভেম্বরের ঘোষণা হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে নিন্দাজ্ঞাপন করতে থাকেন। তাদের অভিমত ছিল এই যে, যেহেতু বাংলাদেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান সেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে মুসলমানের এবং ইসলামী বিষয়াবলী প্রাধান্য লাভ করবে। তাদের অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে একান্তই যদি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সেটা হবে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এমতাবস্থায় সেডলার কমিশন একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে জনসাধারণের মতামত আহ্বান করেন। এ প্রশ্নমালার জবাব দিতে গিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফের পুত্র ও এ.এম আবদুল আলী বলেন, "The juries diction of Dacca University should be extended as much as possible." তিনি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে আরও বলেন যে, "এ ধরনের কোন বিশ্ববিদ্যালয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের জন্যে কোন ক্রমেই উপযুক্ত হতে পারে না। কেননা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বিলাসবহুল ও ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। সুতরাং "In my opinion, the Dacca University should be both residential as well as alhiliation university. All the Colleges of East Bengal may even those of Assam may be allied alhiliation to the university. বাংলায়- 'আমার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক ও অনাবাসিক উভয়ই হবে। পূর্ব বাংলা আসামের সব কলেজ এর আওতাধীন হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল

সেডলার কমিশন তখন ঢাকায় আবাসিক ও অনাবাসিক উভয় ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে পেশ করা হয়। ১৯২০ সালে পরিষদ কর্তৃক বিল অনুমোদিত হয়। ঢাকা কলেজ এবং স্বল্পকালের জন্যে গঠিত বাংলা আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারের পরিত্যক্ত দালানসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। মিঃ ফিলিপ জে. হার্টস (নরে স্যার উপাধিপ্রাপ্ত) প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। তিনি ইতিপূর্বে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে ১৭ বছরকাল যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সেডলার কমিশনের সদস্য ছিলেন। এরপরের বছর অর্থাৎ ১৯২১ সালের ১ জুলাই তারিখে ৮৭৭ জন ছাত্র, ৬০ জন শিক্ষক, ৮টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

লেখক : প্রবীণ নাট্যকর্মী, কলাম লেখক

www.icsbook.info

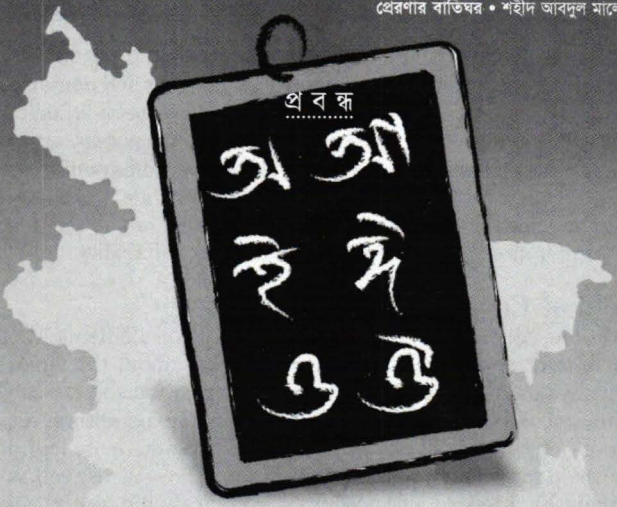

The vast majority of population of Bangladesh are Muslims. They demand in their collective life an Islamic idealism based education in the text books easily but to our utter surprise, we observe that the exposure of the Oneness of Allah based on science is yet to make room in these text books. On the contrary, the unrealistic dogmatism of Darwin has taken deep root herein. Islam absolutely denounces the worn out idea about the Aborigines as available in the anthropology.

Islamization of Education

in the Primary and the Secondary levels in the perspective of Bangladesh.

Sk. Sobdar Ali

Education may be defined as the collection of the realization of life, unflinching faith in Allah, observance of mundane life, moral values, upliftment of the spiritual power and acquiring the knowledge how to solve the problems of life through, concerted efforts. Education lies at the root of building a civilized, advanced and model nation of refined taste.

A national, model and balanced education system tinged with realization, morality, science and technology can ensure the foundation of a welfare oriented society.

The vast majority of population of Bangladesh are Muslims. They demand in their collective life an Islamic idealism based education in the text books easily but to our utter surprise, we observe that the exposure of the Oneness of Allah based on science is yet to make room in these text books. On the contrary, the unrealistic dogmatism of Darwin has taken deep root herein. Islam absolutely denounces the worn out idea about the Aborigines as available in the anthropology.

www.icsbook.info

In the field of Bengali literature

It is desirable that Islamic culture would be reflected in art and literature. The syllabuses of primary and secondary education could have been arranged with the islamic elements. But they were not done so. Rather some poems, articles, stories novels colored with anti-Islamic ingredients have made safe room in these arena. As there is no evidence of successful accumulation of ideas and thoughts that could revive the renaissance spirit among the teenagers in this stage, some policies devoid of morality and ethics came into existence in reality.

In the field of Economics

At present in our educational system there are lots of elements of capitalism and socialism. But no discussion is available here about the equal and balanced charity system that can eradicate poverty from the society easily. In the capitalism there is no balanced-sheet of income and expenditure. Again in the socialism, the state is the sole owner of all assets. But there are legitimate economic policies in the Islamic State. In this system the state as well as the society can demand-its rights. Hence economic system should be embedded in the policies as laid down in the Quran and the Hadith.

In the field of Civics

The political policies and philosophies that generally deal with civics are controversial and paradoxical with the Islamic ideas. As for example, in the democratic system it is upheld that general mass are the source of all power while in Islam it is rightly acclaimed that Almighty Allah is the owner of all sorts of power. Such many other anti-religious materials are available here which should be expunged immediately.

It is only an Islamic state that guarantees all types of human rights, as well as equal right of every citizen in the state and uprightness for all. As the curriculums and syllabuses are prepared in the model of the western ideas, the related evil consequences are deeply ingrained quite unconsciously in the juvenile minds. Those who are in the helm of the nation are solely responsible for this grave offense. It should be discarded immediately.

In the field of Commerce

In this field many ideas of capitalism and socialism that go against Islamic sentiment have been inserted quite subtly. Prevailing banking and commerce system is anti-Islamic which is tantamount to a grave offense. Islamic policies related to trade and commerce could have been upheld vis-a-vis the current ideas. Though some positive light has been thrown in the text books yet the total scenario is far from the stern reality.

In the field of History

Lots of ingredients like coins, rocks, architectures, auto-biographies and the writings of the contemporary writers have been used while writing the history. But in case of writing an Islamic history, the laws, by laws of the Holy Quran and the Hadith, the autobiographies of the companions of the prophet(SM), the life history of the comrades of the prophet(SM), the interpretations of the Holy Quran etc. are deemed as the undisputed materials. Hitherto the elements of the running history are prehistoric, mostly airy, results of self notions and self-will-power. Hence the actual philosophy of his-

www.icsbook.info

tory has been perverted and the characters of the Muslim Kings and rulers were scandalized in the writings of the disbeelievers. Whereas if the history had been shaped in the light of Islamic philosophy, the scenario would have been full of true facts and quite impartial.

In the field of Mathematics

In this field lots of anti-Islamic ingredients have been heaped up also. As for example, adulteration and interest based sums are still practiced in schools which result in malpractices in the sub-conscious minds of the young learners and evil tendencies are being aggravated in the society day by day.

In the field of Social Science

In the perspective of geographical-locations and variations, some differentiation in appearances and languages are prevalent. In the language of anthropology, these variations are defined as the impact of the primitive age and of aborigines. Islam boldly denounces this very fictitious theory. In the Holy Quran it has been delineated that Adam(AS) was the first man and the first prophet of Allah. So the theory of origin of species from the apes and the theory of evolution are opposed to Islamic belief. Apart from these, there are more structural fallacies and conceptions which have to be eliminated and eradicated shortly.

In the field of English Literature

It is quite natural that the English language and literature will reflect the social orders and cultures of the English. For obvious reasons, our learners are unconsciously influenced by the western culture and ideas. Since the vast majority of them are infidels and: disbelievers, i.e. their writings are conflicting, with the Islamic beliefs and culture, a contradictory sentiment is noticeable in self-exposed position herein. Islam has never imposed any restriction on mastering any language. Rigid precautionary measures must be taken so that no foreign conception can make room in the young minds of the teenagers in the name of exercising foreign literature.

In the field of Philosophy

The main tone of the current philosophy is acquiring knowledge on the basis of assumption. In other words, philosophy is nothing but searching a black cat in a dark room where it is not, while Islam upholds it that the doer will be held responsible for the self will power and summation of efforts but he will never be held responsible for the consequences. The consequences will be measured in terms of fatalism. Fantastically there is no room for fatalism in the modern philosophy.

In the field of Islamiat

This very subject is destined to shape up the faith of the learners in the ideology of Islam i.e. in terms of the Oneness of Allah, His prophet and the life of the hereafter so that an Allah-fearing man is created to discharge his duty in every sphere of life with undaunted spirit and spotless character. But at present, its volume has been reduced to a great extent and its influencing factors are too inadequate to serve the purpose from the inception to conclusion. The factors that arouse the sense of accountability in the life of hereafter as well as an all pervading welfare oriented mentality on the surface of this mundane world should be inserted in no time.

www.icsbook.info

In the mentioned ways, if the righteousness and even handed justice are dispensed to both the stages viz viz primary and secondary education, the correct reflection of the realistic structure of Islamic society will be easily ingrained in the minds of the teaching staff and other employees saturated with this glorified system.

In the field of C0-Education:

Co-education is equivalent to the deterioration of the sense of morality and ethics of the whole nation. In Islam it is totally forbidden. The purpose of education is demolished in case of continuing co-education of adult men and women and it gives rise to many complexities. The burning example of lots of adulterations, sexual abuses in the highest-seat of learning as reflected in the leading dailies and illustrated magazines are undoubtedly the evil cousequences of co-education. Separate educational institutions must be set up to avoid all sorts of nuisances and to flourish independent individuality spotlessly.

The great expectations of the teeming millions of this land harboring unshakable faith in Allah and His prophet are that we may destine to the pinnacle of glory and honor to the community of the world being imbibed with the light of education and culture getting freed from the clutch of devastation of education, culture, life-style and economics. Our these expectations are yet to be materialized. Political instability, session jams in the educational institutions, terrorism, economic sterility, the ever increasing rate of unemployment, moral decay of the young, drug addiction, the narrow partisanship that pose threats. Instead of entire welfare oriented mentality, conflicts, uneven and unhealthy individual and party competitions etc. have confronted us to a critical situation. The whole society is now facing a dangerous challenge.

Our aimlessness and purposelessness specially in the realm of spreading education, lack of taking neutral steps in the area of expansion of education, want of practical principles of work in the field of adopting realistic measures is dragging us behind and we are going to be identified as an unsophisticated nation swiftly.

We have got our own spheres of language, tradition, culture and literature in determining our own aims and objectives in the educational sector. The preservation of traditions, self consciousness and values of life which are not opposed to our religious faith and values are not maintained and nourished justifiably. In determining the aims and objectives of our educational system, the aforesaid ideas must be given priority. We have to build up ideal, honest competent administrators, citizens, teachers, scientists, mothers and housewives. Priority must be given to work biased and productive education that can ensure our livelihood and way of living. Today's world has far advanced in the field of science and technology. No man can live quite isolatedly and separately being deprived of the contemporary knowledge of science and technology. All these things must be kept in view when educational policies will be promulgated.

May Allah, the exalted, provide us with the power of executing these activities. Amen.

Writer : Headmaster, Monipur High School, Dhaka.

www.icsbook.info

প্র ব ন্ধ

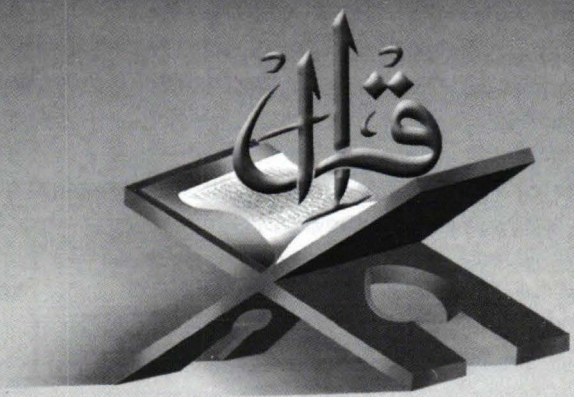

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের অনিবার্য বাস্তবতা

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

ভূমিকা

'Education is a process of Teaching, Training & Learning to improve knowledge and develop skills' -Oxford Dictionary.

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জ্ঞান অর্জন। আর জ্ঞান অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'প্রথম জ্ঞান আল্লাহকে জানা আর শেষ জ্ঞান হলো আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করা।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মদ (সা) এর নিকট প্রেরিত তার প্রথম ওহীতেই বলেছেন- 'পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে (জমাট রক্তপিণ্ড হতে)। পড়, আর তোমার রব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।' (আল কুরআন ৯৬ : ১-৫)

আল কুরআন ও আল হাদিসের উপরিউক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পর্যায়েই আল্লাহকে দূরে রাখতে পারি না। বরং তিনি থাকবেন আমাদের চিন্তা ও কর্মে সদা বর্তমান।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- উমাইয়া, আব্বাসীয় অথবা উসমানীয় খেলাফত এমন কি মুঘল সাম্রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল Integrated, যেখানে একজন মিলিটারী অফিসার কিংবা সিভিল সার্ভেন্টস্ একদিকে যেমন কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্হ জানতেন, অপরদিকে

www.icsbook.info

তেমনি অন্যান্য সাধারণ তথা আধুনিক বিষয় জানতেন। অর্থাৎ অনুর্ধ দু'শ বছর আগ পর্যন্তও শিক্ষা ব্যবস্থা Unified System এ ছিল। অথচ, বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় Ethics & Morality কে উপেক্ষা করা হচ্ছে। আর এ উপেক্ষাই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানবতার সংকটের মূল কারণ।

শিক্ষা সংক্রান্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

প্রকৃত অর্থে সরকারীভাবে বাংলাদেশে এখনও কোন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য বাংলাদেশ এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার গঠিত সে সকল কমিশন/কমিটিগুলো শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধ প্রাসঙ্গিকতাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ (ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন)

● 'শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাংখা রূপায়ণের ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বঞ্চিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতিমালার যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়-

● দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব

ক. জাতীয়তাবাদ (খ) সমাজতন্ত্র (গ) গণতন্ত্র (ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা

(অধ্যায় ১; শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য : ১.১ ও ১.২)

উপরিউক্ত বিষয় থেকে পরিষ্কার যে, এ কমিশন শ্রেণী সংগ্রামে আস্থাবান বিধায় তারা একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মী সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, অপরদিকে তেমনি ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিবর্জিত সেক্যুলার জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে কমিশন রিপোর্টের অন্য অংশে বলা হয়েছে-'নৈতিক মূল্যবোধ : শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।' -(১ম অধ্যায় : ১.৪)

এখানে (১.৪-এ) যদিও মূল্যবোধ এবং চরিত্র গঠনকে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি এজন্য ধর্মশিক্ষা ও নীতিশাস্ত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি, বরং চরিত্র গঠন ও সুনাগরিক তৈরির জন্য ১.২-এ প্রস্তাবিত চার মূলনীতির উপরই গুরুত্বারোপ করেছেন।

ডঃ কুদরত-এ-খুদা কমিশনের এই মতামত তখনকার সময়ে তার পরিচালিত জনমত জরিপের ফলাফলেরই পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কমিশন সে সময় জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা বিতরণ করেছিল- যা সকল বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবিদ ও সংসদ সদস্যগণের কাছে পাঠানো হয়। প্রশ্নমালার ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্ন ছিল ধর্মশিক্ষা বিষয়ক। এ দু'টো প্রশ্নের উত্তরের ফলাফল দেখা যায় যে, উত্তরদাতার ৭৪.৬৯% (২৮৬৯ জনের মধ্যে ১৯৫১ জন) মনে করেন যে, ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। এছাড়াও ৮৮.৯% উত্তরদাতা কমপক্ষে প্রাথমিক স্তরে, ৮১.২৪% উত্তরদাতা মাধ্যমিক স্তরে ও ৪০.০৭% উত্তরদাতা সর্বস্তরে ধর্মশিক্ষা থাকার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। (দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ পরিশিষ্ট পৃষ্ঠ-৪১,৬১)

 www.icsbook.info

২. জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ ১৯৭৯
(সভাপতি-জনাব আবদুল বাতেন ও কাজী জাফর আহমদ)

● 'জনগণকে সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণ ও মানবচিত্ত বিকাশের জন্য জ্ঞান, কর্মকুশলতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করার সুযোগ প্রদান করা এবং নীতি বজায় ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন সুস্থ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।'
(অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি ; শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য- ১.১)
'জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য শ্রেণী চেতনার বিকাশ করা।' (অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি ; শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য- ১.১১)
-এ কমিটি ১.১১ তে সমাজতান্ত্রিক চেতনার কথা বললেও ১.১-এ সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আদর্শ মানুষ গড়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন।

৩. শিক্ষা কমিটি ১৯৮৭
(আহ্বায়ক: অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান)

● এ কমিটির মতে এদেশের মানুষ অত্যন্ত সরল ও ধর্মপ্রাণ। ধর্মবিশ্বাস তাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এ দেশের মানুষ সকল সৃষ্টির মূলে মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং ধর্মের কয়েকটি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে চায়। সেই কারণে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে কমিটি কয়েকটি বিবেচনাকে প্রাধান্য দিতে চায়। বিবেচনাগুলো নিম্নরূপ-
(ক) বিশ্বাস ও মূল্যবোধ
(খ) বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ এবং সামাজিক বোধ

● এছাড়া এই কমিটি এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চারটি মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করে দেশের জন্য কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ-
ক. প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী পরীক্ষা করা, তার মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে একটি নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা।
খ. শিক্ষার দ্বিধাবিভক্তি দূরীকরণের জন্য উভয় প্রকার শিক্ষার একটি মৌলিক কাঠামো এবং কো-কারিকুলাম প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আর এই কো-কারিকুলাম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত 'নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা' নতুন করে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।
গ. শিক্ষার সকল বিষয়ের জন্য 'ফ্রেইম অব রেফারেন্স' অর্থাৎ ইসলামী প্রসংগ কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।
-এ কমিটি ধর্ম ও বিশ্বাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে বিস্তারিত সুপারিশ করেছেন।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- উমাইয়া, আব্বাসীয় অথবা উসমানীয় খেলাফত এমন কি মুঘল সাম্রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল Integrated, যেখানে একজন মিলিটারী অফিসার কিংবা সিভিল সার্ভেন্টস্ একদিকে যেমন কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্‌হ জানতেন, অপরদিকে তেমনি অন্যান্য সাধারণ তথা আধুনিক বিষয় জানতেন। অর্থাৎ অনুর্ধ দু'শ বছর আগ পর্যন্তও শিক্ষা ব্যবস্থা Unified System এ ছিল। অথচ বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় Ethics & Morality কে উপেক্ষা করা হচ্ছে। আর এ উপেক্ষাই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানবতার সংকটের মূল কারণ।

www.icsbook.info

৪. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮ (মফিজ উদ্দিন আহমদ কমিশন)

● বাংলাদেশের শিক্ষা হবে সার্বজনীন। সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের ভিতর গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সচেতনতা।

● শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। (অধ্যায় ১ : শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য-১.১, ১.২) এ কমিশন চেয়েছেন আদর্শ মানুষ তৈরি করতে যাদের মধ্যে থাকবে নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ।

৫. জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

● ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হবে শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য।

-জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। (প্রথম অধ্যায় : পটভূমি, শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য - ১.২)

৬. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ৯৭ (সামসুল হক কমিশন)

● ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

● গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশে সহায়তা করা।

● জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। (অধ্যায় ১ : সারসংক্ষেপ, শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য-১.৭.৯)

● 'শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।' (অধ্যায় ১ : সারসংক্ষেপ : শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক : সুপারিশ ক-৩, পৃষ্ঠা-৩১)

উপরিউক্ত রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ পর্যন্ত যতগুলো শিক্ষা কমিশন/কমিটি গঠিত হয়েছে, তার কোনটাই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় বা নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কথা এড়িয়ে যেতে পারেনি। যদিও কোন কোন কমিশন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের বিশ্বাস থেকে বিতর্কিত রূপরেখা পেশ করেছেন। আবার ২/১ টি কমিশন/কমিটি ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক রূপরেখাও পেশ করেছেন। তাহলে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে নীতিগতভাবে অন্তত একটি বিষয়ে প্রমাণ মেলে যে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ যা কেবল ধর্ম (মুসলিমদের জন্য ইসলাম) থেকেই অর্জন করা সম্ভব। অন্য কোন ভাবে নয়।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা উদ্যোগ ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

১. ইউনেস্কোর শিক্ষা বিশেষজ্ঞ জীন টমাস বলেন, Modern Education is an artificial barrier between education and society, between education Institutions and Life. (UNESCO press, Paris, ১৯৭৫, চ-১০৪)

-এ দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে ১৯৮০ সালে ইউনেস্কো সম্মেলনের প্রস্তাবনায় একটি দেশের শিক্ষানীতি প্রনয়ণে সে দেশের ধর্ম, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নীতিবিজ্ঞান অন্তর্ভূক্ত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

 www.icsbook.info

২. মুসলিম শিক্ষার উপরে চারটি World Conference (মক্কা-১৯৭৭, ইসলামাবাদ-১৯৮০, ঢাকা-১৯৮১ এবং জাকার্তা-১৯৮২) অংশগ্রহণকারীর সকলেই ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুধু তাদের প্রতিশ্রুতিই ব্যক্ত করেননি, বরং Detail work plan ও তৈরি করেছেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন প্রসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক জার্নালের সংবাদ ছিল-

President Ziaur Rahman's Support for Islamic Education

President of Bangladesh H. E. General Ziaur Rahman, was to inaugurate the Third World Conference on Muslim Education but could not do so as he was away as a member of the Islamic Summit Goodwill Mission for the Gulf War. He sent a message wishing the Conference 'a grand success'.

On his return the president invited the delegates to the President's House. He stressed that progress and prosperity of the Muslims depended on unity.

President Ziaur Rahman recalled that his Government had taken various initiatives in the international Islamic forums to promote the cause of the Muslims. He referred to the initiatives of the Bangladesh Government in the recently concluded Islamic Summit at Taif and spoke of the Makkah Declaration. He made a strong plea for evolving a suitable curriculum catering to the growing needs of the Muslim World.

He expressed firm hope that the deliberations of the Third World Conference on Muslim Education would produce positive results.

(Source : News & Views- Vol-1, No. 2 & 3(A bi-monthly magazine of World center for Islamic education Makkah and King Abdul Aziz University Jeddah)

৩. ও.আই.সি (O.I.C) এর উদ্যোগে ১৯৮১ সালের ২৫ জানুয়ারী মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণকারী সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানগণ এক ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন যা 'মক্কা ঘোষণা' নামে খ্যাত। এ ঘোষণায় শিক্ষা প্রসঙ্গটি নিম্নরূপ-

● Believing the tenets of Islam which preach that the quest of knowledge is an obligation on all Muslim, we declare ourselves determined to co-operate in spreading education more widely and strengthening educational Institutions until ignorance and illiteracy have been eradicated and to take measure aimed towards the strengthening of Islamic educational curriculum and to encourage research and Ijtihad among Muslim thinkers and Ulema while expanding the studies of modern sciences and technologies.'

(Source : News & Views- Vol-1, No. 2 & 3 (A bi-monthly magazine of World center for Islamic education Makkah and King Abdul Aziz University Jeddah)

অর্থাৎ 'জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য, ইসলামের এই নীতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা ঘোষণা করছি অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার মূলোচ্ছেদ না ঘটা পর্যন্ত আমরা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য পরামর্শের সহযোগী হব এবং শিক্ষা কারিকুলামকে ইসলামীকরণের পদক্ষেপ শক্তিশালী করতঃ এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও কলা-কৌশল শিক্ষার সাথে সাথে মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেমদের ইজতিহাদ ও গবেষণাকে উৎসাহিত করব।'

৪. মালয়েশিয়ার শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে- The National Education Philosophy (NEP) states that : Education in Malaysia is an on-going effort towards fur-

www.icsbook.info

ther developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner, so as to produce individuals who are intellectually, spiritually, emotionally and physically balanced and harmonious, based on a firm belief in and devotion to God. Such an effort is designed to produce Malaysian citizens who are knowledgeable and competent, who possess high level of personal well being as well as being able to contribute to the harmony and betterment of the family, the society and the nation at large.

(Source : Education in Malaysia, Educational planning and research division, Ministry of Education Malaysia, P-VII)

মালয়েশিয়া সরকার তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে অর্থাৎ Primary School, Lower Secondary School, Higher Secondary School, Technical Secondary School, Vocational Secondary School এর Curriculum এ Islamic religious education এবং Moral Education নামে দু'টি কোর্সকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এছাড়া Teacher Education, Higher Education এবং Research area তেও Islamic religious education কে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া International Islamic University Malaysia (IIUM) তার প্রত্যেকটি Discipline-এ Islamic Civilization কোর্সকে Introduce করেছে।

(Source : Education in Malaysia : Curriculum, Teacher Education, Higher Education chapter)

৫. ভারতের শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে- The National system of Education will be based on a national curricular that are flexible. The common core will include the history of India's freedom movement, the constitutional obligations and other content essential to nurture national identity. These elements will cut across subject areas and will be designed to promote values such as India's common culture heritage, egalitarianism, democracy and secularism, equality of the sexes, protection of the environment, removal of social barriers, observance of the small family norm and inculcation of the scientific temper. All educational programmers will be carried on in strict conformity with secular values.

(Source : National Policy on Education-1986, Ministry of Human Resource Development, Department of Education New Delhi-3,4)

৬. এছাড়া বৃটিশ সরকার ১৯৪৪ সালেই ধর্মশিক্ষাকে ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

১. শিক্ষা কাঠামো

দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিধাবিভক্তি দূর করে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে একই Stream-এ নিয়ে আসতে হবে। এজন্য বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা সহ সকল ধারার যে কোন একটি প্রান্তিক লেবেল পর্যন্ত (প্রথম পাবলিক পরীক্ষা পর্যন্ত হতে পারে) শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যবোধ ভিত্তিক Unified System-এ হতে হবে। প্রস্তাবিত প্রান্তিক লেবেল পর্যন্ত Unified System-এ পড়াশুনা শেষ করে শিক্ষার্থীগণ তাদের নিজ নিজ Vision/চাহিদা অনুযায়ী প্রচলিত ধারায় উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাবে।

এ লক্ষ্যে শিক্ষানীতিতে জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে মতবিনিময় সভা বা গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারেন।

 www.icsbook.info

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

(ক). প্রস্তাবিত প্রান্তিক লেবেল পর্যন্ত কারিকুলাম হবে অভিন্ন যেখানে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ হবার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাবে।

(খ). সকল ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় 'ধর্মীয় শিক্ষা' ও 'নৈতিক শিক্ষা' নামে দু'টো পৃথক বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এছাড়া প্রচলিত প্রতিটি বিষয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিপন্থি অধ্যায়/লেখাগুলো বাদ দিয়ে নতুন অধ্যায় সংযোজন করতে হবে।

(গ). উচ্চতর শিক্ষার প্রতিটি Discipline-এ 'Islamic Civilization' নামে অন্তত একটি কোর্সকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 'ইসলামী দৃষ্টিকোণ' নিরূপণ করে অন্য আরেকটি কোর্সকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTBB), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম বিভাগে ইসলামী স্কলারদের অন্তর্ভূক্তি জরুরী যারা উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩. শিক্ষক নিয়োগ

(ক). সরকারী/বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষক নিয়োগে একটি সমন্বিত নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত। এ লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগের বর্তমান প্রক্রিয়া কিছুটা সংস্কার সাপেক্ষে অব্যাহত রাখা যায়। যেমন- লিখিত পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে Value Oriented প্রশ্নের জন্য কিছু মার্কস নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীর শিক্ষাপেশায় Commitment এবং Aptitude-কে যথাযথ মূল্যায়নে আনতে হবে।

(খ). শিক্ষক নিয়োগের প্রতিটি নির্বাচনী বোর্ডে 'ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব' কে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যিনি শিক্ষক নিয়োগে আদর্শবান ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পন্ন যোগ্য প্রার্থীর বাছাইয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

(গ). সরকারী/বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচনের পরপরই প্রত্যেককে অন্তত এক মাসের ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন করতে হবে; যেখানে শিক্ষক হিসেবে তার Vision, Commitment, Values এবং Social Responsibility সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট Guide Line থাকবে। এছাড়া দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানে অনুশীলন ক্লাসও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

সর্বোপরি সমন্বিত নীতিমালার আওতায় দেশের সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে PSC (পি.এস.সি) এর মতো পৃথক 'Education Service Commission' গঠন করা উচিত। তবে সে কমিশনেও ইসলামী শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভূক্তি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

(ক). দেশের প্রচলিত সি.ইন.এড, বি.এড এবং এম.এড ডিগ্রীর কোর্স কারিকুলাম-এর প্রতিটি বিষয়ে অন্তত একটি করে 'Islamic Concept Paper Chapter' অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(খ). শিক্ষকদের জন্য প্রণীত বিভিন্ন Professional Training এবং Refressure কোর্সেও Value-based Motivation নিশ্চিত করতে হবে। যাতে শিক্ষকরা একদিকে সংশ্লিষ্ট পেশায় দক্ষ হতে পারে আবার অপরদিকে সমাজে একজন পথ প্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করতে পারে।

৫. প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি : গঠন ও দায়িত্ব

(ক). প্রত্যক্ষভাবে দলীয় রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কমিটিতে অন্তর্ভূক্তি নিষিদ্ধ করতে হবে। তবে পৃষ্ঠপোষক বা উপদেষ্টা হিসেবে রাজনীতিকরা জড়িত থাকতে পারবেন।

(খ). 'ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব' কোটা সংযোজন করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তত একজনের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

www.icsbook.info

(গ). ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার গরীব ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের তালিকা করে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার দায়িত্ব নিবে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত ক্যারিয়ার গঠনে বিশেষ ব্যবস্থা নিবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও অপসংস্কৃতির রোধে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিবে এবং প্রয়োজনে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

৬. বিবিধ

(ক). শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস : ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি

শিক্ষাঙ্গণে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ থাকবে যেখানে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি রদ করে প্রতিটি শ্রেণী/বিভাগের মেধাবী, চরিত্রবান ও Cultural Background সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ছাত্র সংসদ গঠন করবে।

(খ). সহ-শিক্ষা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার সকল পর্যায়ে সহ-শিক্ষা নিষিদ্ধ করতে হবে। তবে ছেলে-মেয়েদের পৃথক ক্যাম্পাস, পৃথক শিফট্ চালু এবং ড্রেস কোর্স অনুসরণ সাপেক্ষে বর্তমানে চালুকৃত একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে সহ-শিক্ষা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

(গ). পরীক্ষা পদ্ধতি ও নকল প্রবণতা

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির (বিশেষ করে S.S.C ও H.S.C লেভেলে) সংস্কার করে Term/Semester ভিত্তিক পরীক্ষা নিলে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমবে। এছাড়া প্রশ্নপত্রও এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সারা বছরই প্রতিযোগিতামূলক পড়াশুনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর এতে করে নকল প্রবণতা অনেকাংশে কমে যাবে। তাছাড়া বিগত পাবলিক পরীক্ষায় বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর (নকলকারী শিক্ষার্থী/নকল সরবহারকারী/সহায়তাকারী শিক্ষক-পরিদর্শককে বহিষ্কারসহ দ্রুত বিচার আদালতে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি) যথাযথ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস- বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি। এ দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। এছাড়া বর্তমান ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গিকারও ছিল ইসলামের পক্ষে। তাই ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা-ই হতে হবে বাংলাদেশের শিক্ষানীতির প্রধান নিয়ামক। সর্বোপরি উল্লেখ্য যে, ইসলামের ম্যাসেজ ইউনিভার্সাল, তাই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও এ শিক্ষাব্যবস্থা কোন বাধা না হয়ে বরং সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

অতএব ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য।

লেখক : সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা

 www.icsbook.info

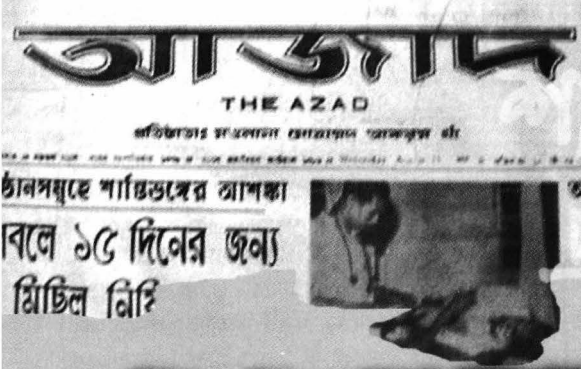

শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া

www.icsbook.info

শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া

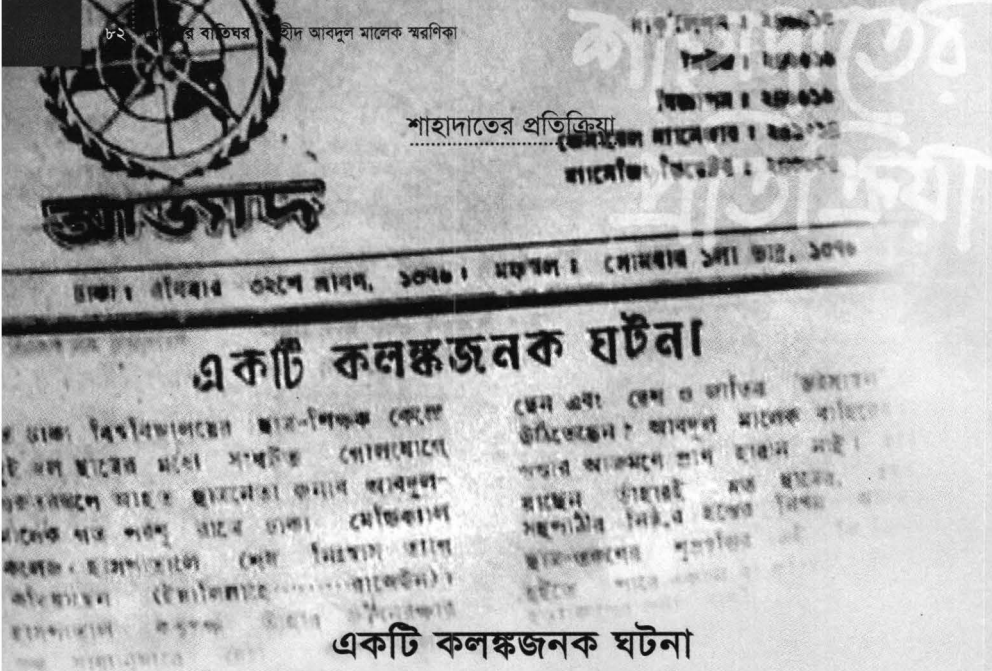

একটি কলঙ্কজনক ঘটনা

(দৈনিক আজাদ-এর ১৮আগস্ট ১৯৬৯ এর সম্পাদকীয় থেকে)

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘটিত গোলযোগে গুরুতর রূপে আহত ছাত্রনেতা জনাব আবদুল মালেক গত পরশু রাত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহার জীবন রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি করাচী হইতে প্রখ্যাত মস্তিষ্করোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জুম্মাকেও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই কৃতি ও বিশেষ নেতৃত্বগুণের অধিকারী তরুণটিকে বাঁচানো গেল না। উম্মত্ত হানাহানির শিকার হইয়া একটি অমূল্য ও সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল অবসান ঘটিল।

ছাত্র সমাজ আমাদের জাতীয় আশা ভরসার স্থল। সেই ছাত্র সমাজেরই আচরণে যদি এরূপ বিয়োগান্তক ঘটনা পূনঃ পূনঃ সংঘটিত হয়, তবে জাতির দুঃখ রাখিবার আর স্থান কোথায়? - ছাত্রসমাজকে বৃহত্তর দায়িত্ব প্রদানের কথা শিক্ষানীতি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। এটাই কি তাহাদের দায়িত্ববোধের নমুনা? অভিভাবকগণ কি এইরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই তাহাদিগকে এত অর্থ ব্যয় করিয়া শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনে পাঠাইয়াছেন? এভাবেই কি তাহার মাতা-পিতার আশা পূর্ণ করিতেছেন এবং দেশ ও জাতির ভরসাস্থল হইয়া উঠিতেছেন? আবদুল মালেক বাহিরের কোন গুণ্ডার আক্রমণে প্রাণ হারান নাই। হারাইয়াছেন তাহারই মত ছাত্রের হয়ত বা সহপাঠীর নিষ্ঠুর হস্তের নির্মম আক্রমণে। ছাত্র তরুণের শুভবৃত্তির এই কি বিকাশ? হইতে পারে একজন বা কতিপয় ছাত্র এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী, কিন্তু তবু এই কলঙ্কের বোঝা প্রতিটি ছাত্রের মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আর যদি তাহা তাহারা লইতে পারেন, অনুশোচনার অশ্রুতে যদি প্রতিটি ছাত্রের বক্ষ সিক্ত হয়, যদি তাহারা গুণ্ডামীর পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন, তবেই এ কলঙ্ক কালিমা কিছুটা মুছিয়া যাইতে পারে। যে উম্মত্ত হানাহানির এরূপ একটি বিয়োগান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা যেমন আমাদের নাই, তেমনই একটি বিধবা

মাতার আশা-ভরসার স্থল আবদুল মালেকের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশেরও ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিজনকে জানাই গভীর সমবেদনা। এই প্রসঙ্গে ছাত্রসমাজকে আজ আত্মানুসন্ধান করিয়া অশান্তি ও হানাহানির সর্বনাশা পথ পরিহার করিতে এবং সর্বপ্রথমে শিক্ষায়তনের এ্যাকাডেমিক পরিবেশ রক্ষা করিতে অনুরোধ জানাই।

দৈনিক আজাদ : ঢাকা

• • • • • •

একটি উদ্বেগজনক ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল মালেককে হত্যা করা হয়েছে। একটি মূল্যবান প্রাণের এভাবে হিংস্রতার শিকারে পরিণত হওয়া শিক্ষা জীবনের একটা অতীব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা চলাকালে দু'টো ছাত্রদলের মধ্যে বিতর্ক ও সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হওয়া এবং তারপর একদল কর্তৃক অন্যদলের উপর সংঘবদ্ধ ও সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। এ জাতীয় ঘটনা দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এ থেকে এমন এক বিপজ্জনক প্রবণতার টের পাওয়া যায়, যা অবিলম্বে আয়ত্তে না আনলে হিংসাত্মক শক্তিগুলো আরো মারাত্মক খেলা দেখাবার সুযোগ পেয়ে যাবে এবং তার পরিণাম হবে ভয়াবহ।

আবদুল মালেকের মৃত্যু কোন রাজনৈতিক মতবিরোধের ফল নয়, বরং তা হচ্ছে আদর্শিক মতবিরোধের পরিণতি। এ সংঘর্ষ যে ছাত্রদের বামপন্থী ও ডানপন্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। ডানপন্থীদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম ও জাতীয় ভাষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতী। অন্যদিকে বামপন্থীরা চায় ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে, এমন মুহূর্তে দ্বিমত প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু মতবিরোধের কখনো সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করা উচিত নয়। আলোচনা ও বিতর্কের উদ্দেশ্যে এই হয়ে থাকে যে, শ্রোতাদের সামনে বিভিন্ন রকমের মতামত উপস্থাপিত হবে এবং তার মধ্যে থেকে যে প্রস্তাব বা মত অধিকতর উপকারী ও কার্যোপযোগী বলে বিবেচিত হবে, তাকেই চূড়ান্ত রূপ দেয়া হবে। তাই আলোচনাসভা ও বিতর্ক সভাসমূহে যোগদানকারীদের বিভিন্ন মতামত হাসিমুখে গ্রহণ করার মনোবৃত্তি থাকা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নয়, বরং এগুলো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও চিন্তাগত প্রশিক্ষণের উপায় ও পন্থা মাত্র। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনাসভার যে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হয়েছে, তা থেকে অসুস্থ রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতবিরোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সংঘর্ষের ফলাফল থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশে কি ধরনের চিন্তা-পদ্ধতি প্রসার লাভ করেছে এবং হিংসাত্মক পন্থার কার্য উদ্ধারের প্রবণতা কতদূর শিকড় গেড়ে বসেছে।

ইসলাম ও জাতীয় ভাষাসমূহের প্রচলন পাকিস্তানের আদর্শের ভিত্তি স্বরূপ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং পরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বরাবর এ বুনিয়াদি নীতি সমর্থন করে এসেছে। এর বিরোধিরাও বিভিন্ন বাহানায় নিজেদের ধারণা বিশ্বাস প্রচার করে এসেছে। গণতন্ত্রের দাবীও ছিল এই যে, ইসলাম, জাতীয় সংহতি ও পাকিস্তানবাদের বিরোধীদেরকে শক্তি প্রয়োগে দমন করার চাইতে জনমতের অস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করা প্রয়োজন। কিন্তু এখন স্বয়ং এই শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে হিংসাত্মক কর্মপন্থার আশ্রয় গ্রহণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সামরিক আইনের পূর্বেকার

www.icsbook.info

গোলযোগের সময় এই সব লোক বিশৃংখলা ও বে-আইনী কার্যকলাপকে প্রসারিত করতে মোটেই ত্রুটি করেনি। তারা এখনও বিভিন্ন শ্লোগান ও মতাদর্শের আড়ালে কর্মতৎপর রয়েছে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সর্বাবস্থায়ই বহাল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কোন দলেরই আইনকে স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক হত্যা ও লুটতরাজের অনুমতি লাভ করা উচিত নয়। এরপর এই বিশৃংখলা যে বিপজ্জনক রূপ ধারণ করবে না- সে নিশ্চয়তা লাভ করতে হলে সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালনে এবং জনগণকে এই সব ঘৃণ্য কার্যকলাপের নিন্দা জানিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের নিরুৎসাহিত করতে এগিয়ে আসতে হবে।

দৈনিক হুররিয়াত : করাচী

.....

শুভ বুদ্ধির জয় হউক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আলোচনাসভার দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র আবদুল মালেক গত ১৫ই আগস্ট রাত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে দিয়া প্রদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একটি কৃতি ছাত্র এইভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করিবে, ইহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। স্বভাবতঃই, মালেকের বিধবা মাতার মনে আজ যে ব্যথা ও বেদনা, সেই একই ব্যথা ও বেদনায় প্রদেশের প্রত্যেকটি মানুষের মন ভারাক্রান্ত হইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

আমরা বা এদেশের অভিভাবকমহল ছাত্রসমাজকে কোন দল বা মতের প্রেক্ষিতে বিচার করি না। ছাত্র মাত্রেই আমাদের সন্তান- জাতির ভবিষ্যত। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াই আমরা মনে করি, যেমন করিয়া যে কোন অভিভাবকও মনে করিবেন, মালেকের মৃত্যু আমাদেরই সন্তানের মৃত্যু। তাই মালেকের মৃত্যুতে আমরা তার শোকাতুর মাতা ও আত্মীয়-পরিজনের প্রতি কেবল সমবেদনা জানাইয়াই কর্তব্য শেষ করিব না; বরং বলিব, যে দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়া মালেককে মৃত্যুবরণ করিতে হইল, তজ্জন্য আমরা সকলেই আজ অনুতপ্ত।

কায়মনোবাক্যে আমরা কামনা করি, এক মালেকের রক্ত তরুণ ছাত্রসমাজ তথা এ দেশের বার কোটি মানুষের মনে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করুক, প্রেরণা জোগাক পরমত সহিষ্ণুতার এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠার।

দৈনিক ইত্তেফাক : ঢাকা

১৭আগস্ট ১৯৬৯

www.icsbook.info

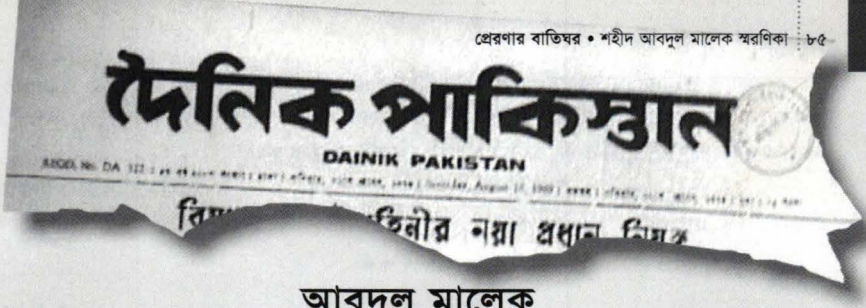
দৈনিক পাকিস্তান
DAINIK PAKISTAN

আবদুল মালেক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আহূত ছাত্রসভায় গোলযোগের ফলে কয়েকদিন আগে জনাব আবদুল মালেক নামক যে ছাত্রটি আহত হইয়াছিলেন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত ও চিকিৎসিত হওয়ার পর তিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)। এমন একজন উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রের এই করুণ মৃত্যু সত্যই অত্যন্ত শোকাবহ ও দুঃখজনক। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে তাঁর পিতামাতা ও পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইবার ও সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নাই। পরম করুণাময় আল্লাহ তাদের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। আমরা মরহুমের পবিত্র রূহের মাগফেরাত কামনা করি।"

দৈনিক পাকিস্তান : ঢাকা

.....

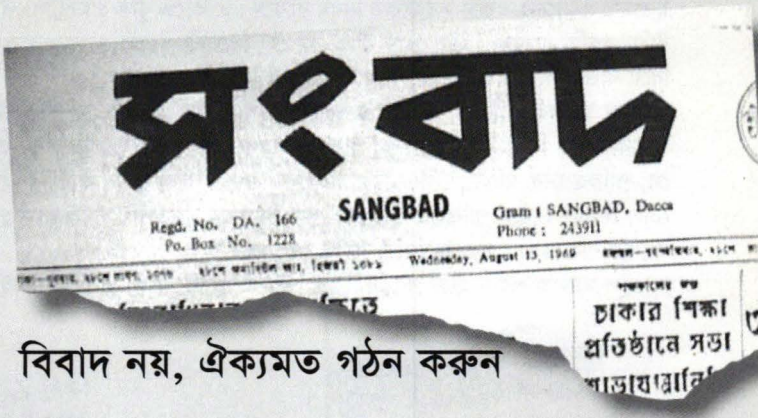
সংবাদ
SANGBAD
Regd. No. DA. 166
Po. Box No. 1228
Gram : SANGBAD, Dacca
Phone : 243911
Wednesday, August 13, 1969

বিবাদ নয়, ঐক্যমত গঠন করুন

গত ১২ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুঃখজনক ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার পরিণতিতে একটি সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। সেদিনের গোলযোগে আহত ছাত্র আবদুল মালেক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিতেছি এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের নিকট আমাদের অন্তরের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ২২ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি, আলোচনা-সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক অশান্তি, অনেক দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিয়াছে। এই অসহিষ্ণুতা যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে, তেমনি বিদ্যার্জন ও জ্ঞান অনুশীলনের

www.icsbook.info

ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব ডাকিয়া আনিয়াছে। বস্তুতঃ সংকীর্ণতা ও সহনশীলতার অভাব রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যাঙ্গনে অধিকতর ক্ষতিকারক। কেননা রাজনীতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আশুক্ষতির কারণ, বিদ্যালয়ে সংকীর্ণতা জাতির গোটা ভবিষ্যতের পক্ষেই ক্ষতিকারক।"

দৈনিক সংবাদ : ঢাকা

• • • • • •

আবদুল মালেক শহীদের 'অপরাধ'

সম্প্রতি ঢাকায় যে রক্তাক্ত নাটকের অভিনয় হয়ে গেল, সেই সম্পর্কে যতই দুঃখ প্রকাশ করা হোক, তা যথোচিত হবে না। আবদুল মালেক কে যে শুধুমাত্র আদর্শিক মতবিরোধের জন্যেই শহীদ করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইরূপ ঘটনা পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোথাও সংঘটিত হলে হয়তো এত গুরুত্বপূর্ণ হতো না। কিন্তু পাকিস্তানে এরূপ ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার।

ইসলামের নামে অর্জিত এই দেশে 'ইসলামের প্রবক্তা' এবং ইসলামেরই এক সিপাহীর এরূপ নৃশংসভাবে শহীদ হওয়া থেকে প্রকৃতপক্ষে এই সত্যই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, দুস্কৃতিকারীদের ধৃষ্টতা মাত্রাতিরিক্ত রকমে বেড়ে গেছে এবং তাদেরকে প্রতিহত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যদি ছাত্রের মুখোশধারী এরূপ পেশাদার গুণ্ডার দল কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে থাকে, তবে তাদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদান করা এবং উৎসাহ ভঙ্গ করা অপরিহার্য।

মতামত প্রকাশের একটা সর্বস্বীকৃত নিয়ম রয়েছে। এ কাজে যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করারও বিশেষ রীতি পদ্ধতি রয়েছে। এটা কোন রীতি নয় যে, বিরোধী মতের লোকদেরকে লাঠি-সোটা, রড নিয়ে ধাওয়া করতে হবে এবং একা পেলে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

আবদুল মালেক শহীদকে শুধু এ অপরাধেই শহীদ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী। তিনি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থনে আওয়াজ তুলেছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব ইসলামেরই অবদান। এখানে অন্য কোন আদর্শ কিংবা জীবন দর্শনের ঢোল পিটানো খোদ পাকিস্তানের মূলেই কুঠারাঘাতের সমতুল্য। পাকিস্তানে ১০ কোটি আবদুল মালেক বাস করে। এর ক'জনকে শহীদ করা সম্ভব হবে?

আবদুল মালেক শহীদ হতে পারেন, কিন্তু তিনি মরেননি; তিনি চিরঞ্জীব। শহীদ কোনদিন মরে

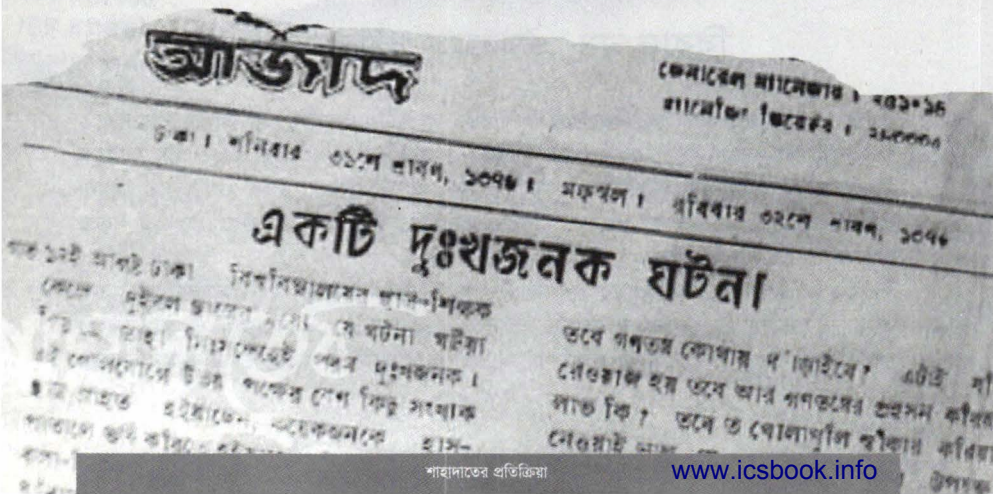
আজাদ
একটি দুঃখজনক ঘটনা

www.icsbook.info

না, আবদুল মালেকও মরেননি। তিনি অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবেন চিরদিন। তিনি জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন। আজ তার জন্যে প্রতিটি লোকের মনে অফুরন্ত শ্রদ্ধা বিরাজমান। এ দেশে এ ধরনের জঘন্য কীর্তি-কলাপের উৎসাদন একান্ত জরুরী। আমরা অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির প্রতীক্ষায় রইলাম। আশা করি, প্রেসিডেন্ট অবিলম্বে এ ঘটনার তদন্ত অনুষ্ঠিত করবেন- যাতে করে দেশের ছাত্র ও জনতা নিশ্চিন্ত হতে পারে।"

দৈনিক মাশরিক : করাচী

••••••

আবদুল মালেক শহীদ
একটি নতুন প্রভাতের বার্তাবহ

মুহাম্মদ হোসেন হায়কল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'উমর ফারুকে আজম' লিখছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্ব-প্রকৃতির অগণিত শক্তিসমূহের মধ্যে একটি শক্তি। তাকে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে বিশ্ব-প্রকৃতির কোন সার্থকতা থাকে না।'

মুমিনের জীবন মহৎ বটে, কিন্তু তার মৃত্যু মহত্তর। কারণ সে খোদায়ী আইনের বাস্তবায়নের জন্যে সদা কর্মতৎপর থাকে এবং খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার দাবী পূরণ করতে গিয়ে বীরপুরুষের ন্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

শহীদ আবদুল মালেকের জীবন ছিল মুমিনের জীবন আর তার মৃত্যু ছিল মুমিনের মৃত্যু।

এই দুনিয়ায় অগণিত মানুষ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয়, ক্ষমতায় পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করে, বস্তুগত জীবনের স্থিতি ও সমৃদ্ধির জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কল্পিত আশা-ভরসায় জীবন অতিবাহিত করে এবং অবশেষে এক ব্যর্থ স্বপ্নের মত তা বিলীন হয়ে যায় চিরদিনের জন্যে। এহেন পৃথিবীতে এক উচ্চতর আদর্শভিত্তিক জীবন সত্যই তুলনাবিহীন। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এরূপ জীবন অবলম্বন করেন, তারাই হচ্ছেন বিশ্ব জগতের প্রাণস্বরূপ।

আবদুল মালেক এক মহান আদর্শের জন্যে জীবন যাপন করে আসছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর চোখের সামনে সেই আদর্শিক জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন বলে মনে হলো, তখন তাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তিনি জুলুম-পীড়নের ধারক-বাহকদের সাথে মরণপণ সংগ্রাম করে শাহাদাত বরণ করলেন।

আবদুল মালেক! আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত, আমাদের হৃদয় বেদনাহত, কিন্তু আপনি নিশ্চত থাকুন, যে মহান উদ্দেশ্যে আপনি প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তার পতাকা বহনে আমরা সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করবো।

সন্দেহ নেই, আপনার শাহাদাত জাহেলিয়াতের আঁধারে বিভ্রান্ত মানুষকে একাগ্রতা ও দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দান করেছে। যারা সত্যকে জেনে বুঝে তা থেকে পশ্চাদপসরণ করে, তাদের জন্যে আপনার শাহাদাত পথের দিশাস্বরূপ। আবদুল মালেক! আপনার জীবন সেই প্রভাত-তারকার মত, বা জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিশ্ববাসীকে শুনায় নতুন প্রভাতের আগমন বার্তা। সে ক্ষেত্রের জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও অতীব মনোহর।

আবদুল মালেক! আমরা তিমির রাতের অভিযাত্রী। আমাদেরকে বড় বড় সংকটের পর্বত ও সমস্যার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গন্তব্যস্থানে উপনীত হতে হবে। আমাদের হৃদয়ে অনেক আঘাত রয়েছে- নবীদের আবাসভূমি ফিলিস্তিনের অবমাননা, মিশরের লোমহর্ষক ঘটনাবলী এবং ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া, সুদান ও ইরাকের আঘাত। এরপরে আবার আপনার শাহাদাতকে কোন

www.icsbook.info

নতুন নাটকের পটভূমি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা এই দেশে ও এই বিশ্বপ্রকৃতিতে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে বদ্ধপরিকর। আমরা জাহেলী সমাজব্যবস্থার ধ্বজাবাহীদের এ ভুল ধারনা অপনোদন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তারা সত্য ও সততার দীপশিখাকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে পারবে। কারণ একটি সত্যের প্রদীপকে তারা নিভিয়ে দিলে আঁধার রাতের বুক চিরে লক্ষ লক্ষ সূর্য জেগে উঠবে। আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন এবং দৃষ্টিহীনরা যাতে এ সব ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং বিবেকসম্পন্ন লোকেরা যাতে তাদের পূর্বসূরীদের পদানুসরণ করে খোদাহীন ব্যবস্থার সাথে চরম সংঘাতে লিপ্ত হতে পারে, সেই শক্তি কামনা করুন। সুলতান টিপু শহীদের এই বাণীকে যেন তারা বাস্তব রূপ দান করতে সক্ষম হয়-
'পৃথিবীতে যদি বীরপুরুষের জীবনধারণ করা সম্ভব না হয় তাহলে বীরপুরুষদের মত জীবন উৎসর্গ করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জীবন'।

দৈনিক নেদায়ে মিল্লাত : লাহোর

•••••••

একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

দেশের একজন প্রতিভাবান ছাত্র এবং সম্ভাবনাময় তরুণ হিংস্রতার শিকারে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১২ আগস্ট শিক্ষানীতি সম্পর্কিত এক সেমিনারে ছাত্রদের দু'টো গ্রুপের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি হয়। পরে এই তিক্ততা ভয়াবহ সংঘর্ষ ও মারামারির রূপ ধারণ করে। কিছু সংখ্যক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক এতে লোহার রড পর্যন্ত ব্যবহার করে। আবদুল মালেক মাথায় গুরুতর আঘাত পান। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি গত ১৫ আগস্ট পর্যন্ত জীবন ও মৃত্যুর টানা-পোড়ানে লিপ্ত ছিলেন। মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তারদের অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রাণ রক্ষা পায়নি।
গত গোলযোগের অবসান ও শান্তি-শৃংখলা বহাল হওয়ার পর বল-প্রয়োগের এটাই প্রথম ও ভয়াবহ ঘটনা। এ ঘটনা একজন যোগ্য ও কৃতি ছাত্রের মৃত্যুতে এসে সমাপ্ত হয়েছে। এই বেদনাদায়ক ঘটনার দরুণ দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ নিদারুণভাবে মর্মাহত হয়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সামরিক আইনের পূর্বেকার গোলযোগ ও তার ধ্বংসাত্মক ফলাফলও কিছুসংখ্যক লোককে হিংস্রতা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা এখনও গোলযোগ বাধাতে ও হত্যা লুটতরাজ চালাতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে তরুণ ও ছাত্রসমাজের মধ্যে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা পরিলক্ষিত হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক ব্যাপার।
এই একটি ঘটনা থেকে এ কথাও উপলব্ধি করা যায় যে, কিছু সংখ্যক সংকীর্ণ দৃষ্টির লোক গত গণ-আন্দোলনের সময় হিংসাত্মক কর্মপন্থার যে শিক্ষা দেন, তা আমাদের তরুণ সমাজকে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। আগামীকাল যাদের কাঁধে দেশগঠন ও ভবিষ্যতের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পিত হবে, তাদের মধ্যে বিদ্বেষ, হিংস্রতা, হত্যা ও লুটতরাজের প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা যদি এখনও ছাত্রদের মধ্যে মতবিরোধ বরদাস্ত করার গুণ সৃষ্টি করতে মনোযোগী না হই, তাহলে তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর কোন গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না। এদিকে আমাদের শিক্ষক, সুধী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি দেয়া এবং ছাত্রদের মন থেকে বিদ্বেষমূলক মনোভাব ও হিংসাত্মক প্রবণতা দূর করা কর্তব্য। সরকারেরও এ ঘটনার কঠোর প্রতিকারে এগিয়ে আসা উচিত। যদি সূচনায়ই এসব হিংস্রপন্থীদের উৎসাদন করা যায়, তাহলে এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ করার কেউ সাহস পাবে না।

দৈনিক জং : করাচী

www.icsbook.info

ঢাকার বিয়োগান্তক ঘটনা

ঢাকায় যা কিছু ঘটেছে তা নিন্দা করে শেষ করা যায় না। কিন্তু নিন্দাবাদকে যথেষ্ট মনে না করে ইসলাম বিরোধী মহলের এ ধরনের দুষ্কৃতির মূল কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যদি ইসলামপ্রিয় মহল পাকিস্তানে ইসলামী নীতিসমূহের বাস্তবায়ন ও জয়যুক্ত হওয়ার প্রত্যাশী হন, তাহলে তাদেরকে সেজন্যে দিনরাত কাজও করতে হবে। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর ইসলামের বহু বুলি আওড়ানো সত্ত্বেও কোন সরকারই ইসলামের নীতিগুলো বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হননি। সরকারী নেতৃবৃন্দ ইসলামের প্রতি পরম আনুগত্য ও ভক্তি প্রকাশ করে বাণী ও ভাষণ দিতে কসুর তো করেননি, বরং পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী কোন ব্যবস্থা ও মতাদর্শ বরদাশত্ করবেন না বলেও ঢাকঢোল পিটিয়েছেন। কিন্তু তাদের কথা ও কাজে যেমন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়নি, তেমনি তারা ইসলামপ্রিয় শক্তিগুলোকেও স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে দেননি। সেই সাথে কিছু সংখ্যক রাজনীতিকও জনগণের দৃষ্টিকে তাদের আসল সমস্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে এমন সব আঞ্চলিক দাবীদাওয়ার ধুঁয়া তুলেন এবং ভাষাগত ও দলগত বিদ্বেষকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পান, যা সর্বতোভাবে ইসলামের পরিপন্থী।

এমনকি এক পর্যায়ে সরকারী তত্ত্বাবধানেও ধর্মহীনতার অভিযান চালানো হয় এবং সরকারী প্রচারযন্ত্রকে দেদার এ কাজে ব্যবহার করা হয়। এভাবে সব সময় নামকরা ব্যক্তিত্বের আড়ালে থেকে কার্যত আদর্শ উচ্ছেদের নীতিই অনুসৃত হয়। যদি এই শাসকরা ইসলামের ন্যায়নীতি প্রচলন করার চেষ্টা করতেন, তাহলে সেটা হতো ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ।

এহেন পটভূমিতে কিছু লোকের মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হওয়ায় প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী সমাজ ব্যবস্থাকে (পাকিস্তানে) কায়েম করবার জন্যে ওকালতি করার ধৃষ্টতা এবং ইসলামের নাম নেয়ার অপরাধে একজন প্রতিভাবান ছাত্রকে শহীদ করে ফেলার মত পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে এ দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্যে আমাদের সাবেক সরকারসমূহ, জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সকল পর্যায়ের জননেতৃবৃন্দই দায়ী।

পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রের সমর্থকদেরকে আমরা পরামর্শ দিতে চাই যে, তাদের বিরোধীপক্ষকে গালিগালাজ করা ও হিংসাত্মক পন্থার দমন করার নীতি পরিহার করা উচিৎ। এক শ্রেণীর পেশাদার আলেমের আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে খোলাখুলি আত্মপ্রকাশ করা ও প্রকাশ্যে একথা বলার সাহস প্রদর্শন করা উচিৎ যে, আমরা পাকিস্তানে ইসলামের পরিবর্তে খালেস সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম কায়েম করতে চাই। আমরা স্বীকার করি যে, যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন মত প্রচারের স্বাধীনতা নেই, তথাপি পাকিস্তান বাসীদের মধ্যে উদারতা ও সহনশীলতা এবং একে অপরের মতামত শ্রবণের ধৈর্য থাকা প্রয়োজন। আমরা পাকিস্তানকে এমন একটা আদর্শ দেশ বানাতে ইচ্ছুক, যেখানে ভদ্রতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে মতামত প্রকাশে কোন বাধা থাকবে না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দ্বারা পাকিস্তানে ইসলামের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা এই জন্যে নেই যে, ইসলামকে সতর্কভাবে পেশ করলে তার মোকাবিলায় অন্য কোন মতবাদের জনপ্রিয়তা অর্জন সম্ভবই নয়। কিন্তু মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করা সত্ত্বেও আমরা সমাজতন্ত্রীদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে, পাকিস্তানের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের শাসকবৃন্দ, নেতৃবৃন্দ ও আলেমদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এখনও ইসলামের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মালেক

www.icsbook.info

শাহাদাত এবং মসজিদে আসার দুর্ঘটনায় সারা দেশে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তা সমাজতন্ত্রীদের চৈতন্য হওয়ার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

দৈনিক নাওবায় ওয়াকত : লাহোর

•••••

ঢাকার রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গত ১২ই আগস্ট সরকারের নতুন শিক্ষানীতির ওপর আলোচনা কালে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষের যেসব বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা অত্যন্ত শোচনীয় ও মর্মান্তিক। এই সংঘর্ষে আহত আবদুল মালেকের মৃত্যু দ্বারা ঘটনার তীব্রতা ও বীভৎসতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

'সংবাদপত্রের বিবরণ অনুসারে, বিতর্ক চলাকালে সমাজতন্ত্রীরা ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করে। এ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। ফলে হলের মধ্যে হাংগামার সৃষ্টি হয়। শ্রোতাদের অধিকাংশকে বিরুদ্ধে দেখে সমাজতন্ত্রীরা সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণ পর যখন আবদুল মালেক ও তার সঙ্গীরা সভাস্থল থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন রাস্তার পার্শ্বে ছোরা, চাকু, বল্লম, হকিস্টিক, লোহার রড প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত অপেক্ষমান সমাজতন্ত্রী ছাত্ররা আবদুল মালেক ও তার সংগীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তারা কতিপয় ছাত্রকে আহত করে এবং আবদুল মালেকের মাথায় ছোরা ঢুকিয়ে দেয়। আবদুল মালেক আঘাত বরদাশত্ করতে না পেরে গত ১৫ই আগস্ট ইন্তেকাল করে।

ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শবিরোধীরা এই ঘটনায় যেরূপ নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তা শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারীদের জন্যে হুমকি স্বরূপ। এ ঘটনা এমন এক মুহূর্তে সংঘটিত হয়েছে যখন প্রধান সামরিক প্রশাসকের ইসলাম, পাকিস্তানের আদর্শ ও কায়েদে আজমের বিরোধীতাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা সম্পর্কিত নির্দেশের কালি শুকাতে পারেনি।

এ ঘটনার দ্বারা পাকিস্তানের জনগণের চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত এবং সমাজতন্ত্রীরা দেশে কি ধরনের হিংসাত্মক খেলায় নেমেছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। এরাই সামরিক আইন চালু হওয়ার পূর্বে গণ-আন্দোলনকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে রক্তক্ষয়ী দাংগার অনুষ্ঠান করেছিল এবং নিরীহ ও নিরপরাধ জনগণের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। এভাবে বিশৃংখলা ও হাংগামার সৃষ্টি করে দেশের আদর্শিক ভিত্তির মূলোৎপাটনই ছিল এদের উদ্দেশ্য। যথাসময়ে সামরিক আইন চালু হওয়ায় এই দুষ্কৃতিকারীদের জঘন্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও এদের মনে ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের বিরুদ্ধে যে বিষ ভর্তি রয়েছে তা মোটেই প্রশমিত হয়নি। অত্যন্ত পীড়াদায়ক ব্যাপার এই যে, পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছে এবং যাকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজমের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন উক্তি বর্তমান রয়েছে, সেখানে থেকে কিছু লোক ইসলামকে নির্বাসিত করতে ইচ্ছুক। এই সব লোকের পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যও সন্দেহযুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ইসলামের দুশমন, সে কখনও পাকিস্তানের অনুগত হতে পারে না। আমরা একথা উচ্চারণ না করে পারিনা যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দুর্ঘটনা- যাতে একজন মুসলিম তরুণের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে- একটি বিপদসংকেত স্বরূপ। বিপদের এ সংকেত শুধু ইসলামপন্থী দলসমূহ ও ব্যক্তিদের জন্যেই নয়, বরং স্বয়ং প্রশাসনযন্ত্রের জন্যেও।

এ দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে হাইকোর্টের কোন বিচারপতি দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠান করা এবং প্রকাশ্য সভায় ইসলাম ও ইসলামী মূলনীতিসমূহের ওপর যারা জঘন্য হামলা চালিয়েছে প্রধান সামরিক

www.icsbook.info

প্রশাসকের জারী করা নির্দেশের অধীন তাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া অপরিহার্য। যারা আবদুল মালেকের রক্ত দিয়ে নিজেদের হাত শুধুমাত্র এ জন্যেই রঞ্জিত করেছে যে, তিনি এবং তাঁর সাথীরা ইসলামের ওপর হামলা চালানোর নিন্দা করেছিলেন, তাদেরকে কোনরূপ দয়া-সহানুভূতি না দেখিয়ে চূড়ান্ত শাস্তি দেয়া সরকারের কর্তব্য। আইনকে স্বহস্তে গ্রহণের এই মারাত্মক প্রবণতাকে যদি এখনই প্রতিহত না করা হয়, তাহলে এর অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি দেখা দেবে। আমরা আশা করি, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক এ দুর্ঘটনার ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব পালনে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব কিংবা দ্বিধা করবেন না।

দৈনিক ভেফাক : লাহোর

• • • • • •

গুরুতর দুর্ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল মালেক শহীদ হয়ে গেছেন। এটি একটি অত্যন্ত মর্মবিদারী সংবাদ এবং অতীব যুক্তিসংগতভাবেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। একজন ছাত্রের শাহাদাত অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার হলেও তার চেয়েও অনেক বেশী উদ্বেগজনক হচ্ছে কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন লোকদের হিংসাত্মক প্রচারণা, হত্যা ও লুটতরাজে প্রলুব্ধ হওয়া, শক্তির প্রাবাল্য প্রদর্শনের জন্যে অস্ত্র ব্যবহার এবং বিরোধী মতাবলম্বীদের প্রতি প্রতিশোধমূলক ও অপরাধপ্রবণ মানসিকতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের দুর্ঘটনা যে কত দূর সঙ্গীন, তা বুঝাবার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সারা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিলেও খোদ ঘটনাস্থল পূর্ব পাকিস্তানে কতিপয় রাজনৈতিকদল এর প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের এই অবস্থা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামের নাম উচ্চারণকারীদের হত্যাকারীরা কি পরিমাণ শক্তির অধিকারী। পশ্চিম পাকিস্তানে একদিকে মরহুম আবদুল মালেকের পাশবিক হত্যার গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হলেও আমাদের অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এখানকার কম্যুনিষ্টদের আড্ডা এ ঘটনার তীব্রতা হ্রাস এবং তার স্মৃতি মলিন করার ন্যাক্কারজনক অপচেষ্টা চলছে। যে সব অপরাধীকে এখনো পাকড়াও পর্যন্ত করা হয়নি, তাদের সাফাই ও ওকালতি শুরু হয়ে গেছে। এই বিশেষ মহলটি নিজেদের এই জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর পেছনে মরিয়া হয়ে লেগেছে। অথচ মাওলানা মওদূদী, জামায়াতে ইসলামীর সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য ইসলামদরদী মুসলমানরা শুধুমাত্র একজন মজলুম ছাত্রের শাহাদাতে ক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া কিছু করেনি। মরহুম আবদুল মালেকের হত্যাকারীদের জন্যে যারা ওকালতি ও সাফাই করে গলদঘর্ম হচ্ছেন, তাদের নিকট আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই সাফাইয়ের জন্যে ঘটনাকে বিকৃত করার চাইতে উক্ত জালেমদের প্রকাশ্য নিন্দা করাই কি উত্তম ছিল না? যেসব ছাত্র নিজেদেরই এক ভাইকে এমনি পৈশাচিকভাবে শহীদ করেছে, তাদেরকে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদনও কি তারা জানাতে পারতেন না? জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করার কোন অধিকার আমাদের নেই। মানুষের মনের খবর শুধু আল্লাহ্ই জানেন। তবে প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানে যারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বিরোধী, তারাই ছাত্রদেরকে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করছে এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত করছে।

দৈনিক ভেফাক : লাহোর

www.icsbook.info

আলোর দিশারী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানীতি সম্পর্কে আয়োজিত এক সেমিনারের পর আবদুল মালেক শহীদ হয়েছেন, সে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। মাত্র কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত যে তরুণ দেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষা অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি অবৈধ বলপ্রয়োগ ও দুঃখজনক সংকীর্ণতার শিকার হলেন। কিন্তু এমনভাবে হলেন যে, একটি ক্ষুদ্র বিন্দু যেন সূর্যের উচ্চতা ও প্রাখার্য লাভ করলো এবং ঘুটঘুটে অন্ধকারে যেন একটি প্রদীপ জ্বলে উঠলো। কাল আবদুল মালেক শুধু একটি যুবকের নাম ছিল; কিন্তু আজ তা পাকিস্তানের প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন তরুণের মনে বদ্ধমূল এক মহান আবেগের নাম- যে আবেগ সত্যের জন্যে (পাকিস্তানের) আদর্শের জন্যে এবং সর্বোপরি ইসলামের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সত্যের সেবকদের মহিমান্বিত অঙ্গনে আবদুল মালেকের রক্তের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। এখন এ পতাকা পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উড্ডীন থাকবে পরম বিজয়ী গৌরবে। আমরা এ পতাকাকে সালাম জানাই।

আবদুল মালেকের শাহাদাত দুটি দিক দিয়ে (পাকিস্তানের) প্রত্যেক ছাত্রকে চিন্তা গবেষণার আহ্বান জানায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যনীয় হচ্ছে এই যে, বগুড়ার এ জলন্ত দ্বীপশিখাটি ইসলামের আওয়াজকে নিজের বক্ষের মধ্যে দাবিয়ে রাখেনি। সে পূর্ণ ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে বিতর্ক সভায় ইকবালের শাহীনের মত অনমনীয় ভূমিকা পালন করে। আবদুল মালেকের এ দৃঢ়তা, আন্তরিকতা, কর্মতৎপরতা ও ভাবাবেগ নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্যে ছিল না, নিজের প্রদেশের জন্যে ছিল না, নিজের দেশের জন্যেও ছিল না, বরং তা ছিল তার জাতির জন্যে- যে জাতি আজ মসজিদে আক্সার অবমাননায় বিক্ষুব্ধ। সম্ভবত তার অপরিপক্ক মনে কেউ একথা চুপি চুপি বলে দিয়েছিল যে, জাতির বর্তমান অসহায়তা ও রিক্ততার জন্যে তরুণ সমাজের নিষ্ক্রিয়তা এবং উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থাই দায়ী।

আবদুল মালেকের এ দৃষ্টিভঙ্গি আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নেই। কায়েদে আজম এবং আল্লামা ইকবাল এরূপ জোয়ানদেরই দেখতে চেয়েছিলেন। এরূপ তরুণরাই ছিল তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। পাকিস্তানে এরূপ জওয়ানরা গড়ে তুলবে পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বপ্রথম আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র- এই ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। কাজেই আজ পাকিস্তানের প্রতিটি তরুণকে তারই মত কর্মচঞ্চল এবং তারই মত আবেগ উদ্দীপ্ত হতে হবে, হতে হবে তারই মত দুর্জয় সাহস এবং শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

আবদুল মালেকের শাহাদাতের দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রটি আদর্শিক মতবিরোধের দরুণ শহীদ হয়েছে। আমাদের দেশের আদর্শিক বিরোধ যে ক্রমান্বয়ে হিংসাত্মক পথে চালিত হচ্ছে, এটি অত্যন্ত উদ্বেগের কথা। যে ব্যক্তি আদর্শিক দিক দিয়ে বিরোধী, তাকে অমনি কোন বিদেশী শক্তির দালাল এবং তারপর কয়েক পা অগ্রসর হয়েই তাকে 'জানী দুশমন' বলে আখ্যায়িত করা হয় (পাকিস্তানী)। তরুণ সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার খাতিরেই হিংসাত্মক কর্মপন্থা পরিহার করা কর্তব্য। আদর্শিক মতবিরোধ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং চিন্তা-গবেষণার লক্ষণ। আমাদের দেশে যদিও মতামত গঠনে অত্যন্ত দ্রুততা অবলম্বন করা এবং বেশি অধ্যয়ন-অনুশীলনের চেষ্টা করা হয় না, তথাপি একথা স্বীকার করতেই হয় যে, আদর্শের দিক থেকে কোন মতামত গঠনকারী লোকেরা অপেক্ষাকৃত চেতনাশীল ও মেধাবী। এই সব লোকের দৃষ্টিভঙ্গি এই হওয়া উচিত, যে ব্যক্তি আদর্শ ও মতবাদের দিক থেকে আমার বিরোধী সে আমার জানী দুশমন নয় বরং মানবতার পর্যায়ে সে আমার বন্ধু। বলার অপেক্ষা রাখে না যে অপরের চিন্তা পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমেই এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন সম্ভব।

আজ আমরা (পাকিস্তানের) তরুণ সমাজের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানাবো যে, দেশের সমস্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উৎপাদনকে সমালোচকের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন অনুশীলন করে

www.icsbook.info

একটি মতামত গঠন করুন। অতঃপর উক্ত মতামতের বিরোধী লোকদেরকে সহ্য করার প্রবৃত্তি গড়ে তুলুন। পড়াশুনা না করে শুধু হুজুগে পড়ে কোন মতবাদ গ্রহণ করে কোন নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ জন্যে বিপুল অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এ দুটো জিনিস ছাড়া বিরোধী পক্ষের মতামত সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ও তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্ভব নয়। একটু চিন্তা-গবেষণা করলেই প্রত্যেক শিক্ষিত তরুণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে যে, স্বয়ং বিদ্যার্জন মানুষের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা ও সহনশীলতার মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষা লাভের সাথে সাথেই হিংসাত্মক প্রবণতা দূর হয়ে যায়।

বিশেষ নিবন্ধ : দৈনিক জং : করাচী

• • • • • •

খাঁটি শহীদ

ইসলামের জন্যে বাঁচা ও ইসলামের জন্যে প্রাণবিসর্জন দেয়ার চাইতে গৌরব ও সম্মানজনক কাজ মুসলমানদের জন্যে আর কিছুই হতে পারে না। আবদুল মালেক তাই করেছেন। তিনি ইসলামের জন্যেই বেঁচে ছিলেন এবং ইসলামের জন্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এ ধরনের খাঁটি ঈমানদার ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানরাই চূড়ান্ত কোরবানীর মাধ্যমে সেই অমর জীবন লাভ করেছেন, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন শরীফে বলেছেন- যারা আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছে, তাদের মৃত বলো না, তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা জান না।

তাঁর হন্তাদের চোখে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি আবদুল মালেকের অপরাধ ছিল এই যে, তিনি এয়ার মার্শাল নূর খান প্রস্তাবিত ইসলামী শিক্ষা পাকিস্তানে কায়েম করতে চেয়েছিলেন। আল্লাহর দুশমনরা নিরস্ত্র, অরক্ষিত, বিনয়ী ও নম্র মালেককে ক্ষিপ্ত পশুর মত তাড়িয়ে (Ferociously chased) নিয়ে পৈশাচিকভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনে মৃতপ্রায় করে ফেলে। একদিকে এক নিষ্পাপ ভিকটিম (Victim) ইসলামের গৌরব ও দেশের আদর্শের জন্য খাঁটি শহীদ হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা তাদের জংলী বিধানের (Jungle laws) পৈশাচিকতা প্রদর্শন করেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি দৃষ্টি উন্মীলন করে এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন না? ইসলামী আন্দোলনের তরুণ কর্মীরা, জাতির উজ্জ্বলতম হীরকরা সেই আল্লাহর কাছে রক্তদান করেছে যিনি তাঁর বিধানকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমাদের এ দেশ দান করেছেন।

এই আত্মদান তথা খাঁটি শাহাদাত অবশ্যই মুসলমানদের অন্তর্নিহিত ঈমানী চেতনা জাগ্রত করবে। তাদের অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করবে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সর্বস্ব কুরবানী দিতে, যার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতির ভবিষ্যত কর্মধারা হোক কবির সেই অন্তর নিঙড়ানো বাণী-'শহীদ কি জো মওত হ্যায় ও কওম কি হায়াত হ্যায়' (শহীদের মৃত্যু- মুসলিম জাতির নব জীবনকেই সূচিত করে।)

Young Pakistan : Dhaka

আবদুল মালেক শহীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে নয়া শিক্ষানীতিতে প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক ইসলামিয়াতের প্রতি সমর্থন জানানোর 'অপরাধে' নাস্তিক্যবাদীরা যেরূপ নৃশংসভাবে তরুণ ছাত্রনেতা আবদুল মালেককে শহীদ করেছে, প্রতিটি ইসলামপ্রিয় মহল থেকেই তার নিন্দা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অধিক কিছু বলতে চাইনে।

www.icsbook.info

প্রথমত, মাওলানা আবুল আলা মওদূদী এ সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করেছেন, আমরা হরফে হরফে তাকে সমর্থন করি।

দ্বিতীয়ত, আশা করি যে, সরকার এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের নায়কদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

তৃতীয়ত, আমরা এ দেশের নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মদ্রোহীদের সকল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি এবং ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করা পবিত্র কর্তব্য ভাবছি। শহীদ আবদুল মালেক জাতির এক পরম মূল্যবান সম্পদ ছিল। তার রক্তের ব্যাপারে যারা ঔদাসীন্য দেখিয়েছে, আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তাদের রক্ত সাদা হয়ে গেছে।”

সাপ্তাহিক চাটান : লাহোর

• • • • • •

ওদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে হবে

আমাদের প্রিয় ছাত্র বন্ধু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রনেতা জনাব আবদুল মালেক শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেছেন। মানবতারূপী শ্বাপদের হিংস্র আক্রমণের পরিণামে গত ১৫ই আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি চিরতরে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এ দেশের ইসলাম প্রিয় ছাত্র-জনতাকে অন্তহীন শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি উত্তরণ করেছেন এক মৃত্যুহীন মহাজীবনে। আল্লাহর পথে প্রাণ দান করে তিনি লাভ করেছেন দূর্লভ অমরত্ব। তাই আবদুল মালেকের দেহান্তর ঘটলেও শহীদ মালেকের মৃত্যু হয়নি। তাঁর প্রোজ্জ্বলিত আদর্শের দীপশিখা অনির্বাণ। সে দীপের আলোকরশ্মি জ্বালিয়ে তুলবে এদেশের শত সহস্র দীপ শিখা এবং তা ভস্ম করে দেবে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী জাহেলিয়াতের সকল দর্পকে।

কিন্তু শহীদ মালেকের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড একটি কারণে আমাদের কাছে অতীব মর্মান্তিক, অত্যন্ত অসহনীয়। পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত। ইসলামী শিক্ষা, শাসন ও সমাজ ব্যবস্থাই এদেশের মুসলিম জনগণের প্রাণের দাবী। এহেন পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষার প্রতি সমর্থন জানানোর 'অপরাধে' ধর্মবিরোধী ও সমাজতন্ত্রীরা ছাত্রনেতা মালেককে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে শুধু একটা বিরাট প্রতিশ্রুতিশীল সম্ভাবনাময় জীবনেরই অবসান ঘটায়নি, বরং মূলতঃ দেশের কোটি কোটি ইসলামী জনতাকেই তারা হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ড আজ প্রতিটি ইসলামপ্রিয় ছাত্র-জনতার পক্ষে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জকে পূর্ণ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ধর্মরিবোধী ও সমাজতন্ত্রী শ্বাপদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলার জন্যে আজ তাদের কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।

জাহানে নও : ঢাকা

ইসলামের এক শহীদ

মরহুম আবদুল মালেক শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তার ওপর সমাজতন্ত্রীরা কাপুরুষের মত শুধু এই জন্যে হামলা চালায় যে, তিনি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা এবং সরকারের পেশকৃত শিক্ষানীতির সমর্থক ছিলেন। আমরা মরহুম আবদুল মালেকের

www.icsbook.info

আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। কিন্তু সাথে সাথে আমরা এই বিয়োগান্তক দুর্ঘটনাকে মরহুমের পরিবার এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে একটি অত্যন্ত গৌরবজনক কীর্তি ও সম্মানের ব্যাপার বলে মনে করছি। সমাজতন্ত্রীরা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচার করে থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের সমর্থক কেউ নেই। আজ আবদুল মালেকের শাহাদাত এ কথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট করে দিল যে, পূর্ব পাকিস্তান আজও ইসলামের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অগ্রবর্তী।

মাসিক উসওয়া : করাচী

•••••

আমাদের কথা

এ সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে

গত বারই আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে শিক্ষানীতির প্রশ্নে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার দাবীদার ছাত্রদের হাতে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি জনাব আবদুল মালেকের মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গত পনরই আগষ্ট মর্মান্তিক শাহাদত বরণ পাকিস্তানের গত বাইশ বছরের ইতিহাসে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রসংস্থার (ডাকসু) আহ্বানে ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে নূরখানের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ওপর সর্বদলীয় ছাত্রদের একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ধর্ম-নিরপেক্ষতার দাবীদার ছাত্ররা মঞ্চ অধিকার করে রাখে এবং সেখান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থার দাবীতে বক্তৃতা করতে থাকে। বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষানীতির সমর্থক বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে মঞ্চ থেকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। উপরন্তু এক পর্যায়ে জনৈক বক্তা ইসলামীয়াত শিক্ষার ওপর কটাক্ষ করলে সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দ... ছাত্ররা প্রথমেইতো গণতান্ত্রিক নীতিকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ ... শক্তি প্রয়োগে প্রতিবাদকে ... ছাত্রদের ... তারা ... চেষ্টা

এ সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে

(মাসিক পৃথিবী সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ এর সম্পাদকীয়)

গত ১২ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে শিক্ষানীতির প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার দাবীদার ছাত্রদের হাতে ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি জনাব আবদুল মালেকের মারাত্মকভাবে আহত হওয়া এবং ১৫ই আগষ্টের মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ পাকিস্তানের গত বাইশ বছরের ইতিহাসে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংস্থার (ডাকসু) আহ্বানে ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে নূর খানের প্রস্তাবিত

www.icsbook.info

শিক্ষানীতির ওপর 'সর্বদলীয়' ছাত্রদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ছাত্ররা মঞ্চ অধিকার করে রাখে এবং সেখানে থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার দাবীতে বক্তৃতা করতে থাকে। বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষানীতির সমর্থক বৃহত্তর ছাত্র সমাজকে মঞ্চ থেকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। উপরন্ত এক পর্যায়ে জনৈক বক্তা ইসলামিয়াত শিক্ষার ওপর কটাক্ষ করলে সাধারণ ছাত্রের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ছাত্ররা প্রথমেই গণতান্ত্রিক নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান। এবার তারা ইনসাফ ও ন্যায়নীতির মাথায় কুঠারাঘাত করে শক্তি প্রয়োগে প্রতিবাদকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ফলে সভায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইসলামপন্থী ছাত্রদের দৃঢ়তার কারণে গোলযোগকারীরা শেষ রক্ষা করতে না পেরে অবশেষে রণে ভঙ্গ দেয়। গোলযোগ থেমে যাবার পর জনাব আবদুল মালেক যখন নিশ্চিন্তে বের হয়ে আসছিলেন, তখন লাঠি, ছুরি ও লোহার রডের সাহায্যে অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-গোলযোগ কোন নতুন ঘটনা নয়। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার এ কৃতিত্ব এদেশে এবং দুনিয়ার আরো বহু দেশে আজ যথারীতি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ছাত্র সংঘর্ষে একজন মেধাবী, সৎ ও নিরপরাধ ছাত্রকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম। ধর্মশ্রিয়তা নয়, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাই মানুষকে এমন পাশবিক স্তরে নামিয়ে দিতে পারে। নয়তো মাত্র কয়েকদিন আগে 'নিপায়' যে তিনদিনব্যাপী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ইসলামী শিক্ষার স্বপক্ষে ২৫ জন বক্তা তাদের বক্তব্য পেশ করার পর বিপুল ভোটাধিক্যে ইসলামী শিক্ষানীতির প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেলেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের একটি আঁচড়ও লাগতে দেয়া হয়নি। অথচ সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এমন সব উক্তি করেছিলেন, যা পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা পাকিস্তান সৃষ্টিকে একটি ভাঁওতা এবং পাকিস্তানকে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র বলাকেও ভাঁওতা আখ্যা দিয়েছিলেন (যা অবশ্য সম্প্রতি প্রচারিত সামরিক বিধির ৫১ নম্বর ধারার আওতায় পড়ে, অথচ এখনো তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বলে আমরা জানি না)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামপন্থীদের দ্বারা কোন প্রকার আক্রান্ত হয়নি। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এভাবে জনমতের নিকট পরাজয় বরণের পর চক্রান্তের পথ অবলম্বন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্রগণের নামে আয়োজিত সাধারণ সভায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মঞ্চ অধিকার করে সেখান থেকে জবরদস্তিমূলক ভাবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার সপক্ষে প্রস্তাব পাশ করার মতলব আঁটে। কিন্তু আবদুল মালেকের শাহাদাতের মাধ্যমে তাদের সে চক্রান্ত বানচাল হয়ে যায়।

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এই সংঘর্ষকে নিছক একটি দলীয় সংঘর্ষ এবং দু:খজনক ঘটনা বলে চিত্রিত করে নিজেদের চারিত্রিক কলুষতা, চিন্তার দুর্বলতা ও কর্মের বিভীষিকাময় রূপটিকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিষয়টি যথার্থভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আবদুল মালেকের সাথে আরো যে তিনজন ইসলামপন্থী ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন, তাদের একজনও ব্যক্তিগত জীবনে অসৎ, ভবঘুরে ও গুণ্ডা প্রকৃতির নন, বরং তারা সবাই মেধাবী ছাত্র। আর শহীদ আবদুল মালেকের মেধা ও সততা সম্পর্কে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও তাঁর নিজের হলের প্রভোস্টই সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কয়েক বছরের গুণ্ডামীর ইতিহাসে এদের চিত্র কোথাও দেখা যায়নি, বরং বিপরীতপক্ষে দেখা যায়, শহীদ আবদুল মালেকের হত্যাকারীরা (ধরাশায়ী আবদুল মালেকের চতুষ্পার্শ্বে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় যাদের চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে-আশ্চর্যের বিষয়, একটা সাধারণ হত্যা সংঘটিত হলেও হত্যাকারীকে গ্রেফতার করার জন্য জোর অভিযান চলে কিন্তু এক্ষেত্রে হত্যাকারীদের সুস্পষ্ট ছবি খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হবার পরও এখনো তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি) গুণ্ডাবৃত্তিতে

www.icsbook.info

অভ্যস্ত মুখচেনা দলের অন্তর্ভূক্ত। এহেন পরিস্থিতিতে একে নিছক একটি দলীয় সংঘর্ষ রূপে চিত্রিত করা আসল সমস্যাকে উপেক্ষা করা তথা ধামাচাপা দেয়ার নামান্তর। বরং একে বলা যায়, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এদেশে যে অসহিষ্ণুতা ও গুণ্ডাবৃত্তি লালিত হয়ে এসেছে, তার সাথে ইসলামের ঐতিহাসিক সহিষ্ণুতা, সততা ও যুক্তিবাদীতার সংঘর্ষ। একে বলা যায়, পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতন্ত্রের মৌলিক বুলির আড়ালে চেঙ্গিসী ও সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের সাথে ইসলামের যথার্থ গণতান্ত্রিক মনোভাব, ইনসাফ ও পরমত সহিষ্ণুতার সংঘর্ষ। পাশ্চাত্যের ধার করা চিন্তা, মতবাদ ও দাস মনোবৃত্তির সাথে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে দাস মনোবৃত্তির যুক্তিবাদের পথ ছেড়ে গুণ্ডামীর পথ অবলম্বন করেছে আর স্বাধীন মনোবৃত্তি গুণ্ডামীর জবাবে গুণ্ডামী করে জাতিকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে না দিয়ে সততা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করে নিজের বুকের রক্ত দান করে জাতির হৃদয় ও বিবেককে জাগরণের বাণী শুনিয়ে গেছে। তাই এ সংঘর্ষকে আমরা দুটি আদর্শের বিপরীতমুখী মত ও পথের সংঘর্ষ রূপে গ্রহণ করছি। দাস মনোবৃত্তির ধার করা মুখরোচক চিন্তার আফিম খাইয়ে যারা জাতিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চান, আমরা তাদের দলে নই। আমরা চাই জাতির স্বাধীন মনোবৃত্তি ও বিবেককে জাগ্রত ও সতর্ক করতে। আর শহীদ আবদুল মালেক জাতীয় আদর্শের জন্যে শাহাদাত বরণ করে জাতির সেই স্বাধীন মনোবৃত্তিকে সজাগ করে গেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথা এসে পড়ে যে, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে মেনে নিতে রাজী নন। অর্থাৎ তাদের মতে দুনিয়ায় ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা এ তিনটির অস্তিত্ব আছে। বাস্তবে একথা কতদূর সত্য, তা আলোচনার পূর্বে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের সাথে এর তুলনা করলে বলা যায়- ইসলাম, ইসলাম নিরপেক্ষতা ও ইসলামহীনতা। নীতিগতভাবে বলা যায় যে, ইসলাম মানে যদি হয় আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য, তাহলে ইসলামহীনতা মানে হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যহীনতা। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নিরপেক্ষতার অর্থ কি দাঁড়াবে? আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকা। অথচ সরাসরি ইতিবাচক ভাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য না থাকলে তা ইসলামহীনতা বা কুফরী ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। কাজেই ইসলামের মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে বাস্তবক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার যে অর্থ আমরা দেখি তা অত্যন্ত ভয়াবহ। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে, বাইশ বছরে কয়েক হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠান, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের রক্তপাত, মুসলমানের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট, শিক্ষা ব্যবস্থায় আর্য ধর্ম, আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতি-চিন্তা ছাড়া অন্য সবকিছুর বহিষ্কার। রাশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বীর জীবন ধারণের অধিকার রুশভূমিতে নেই। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-চিন্তাকে সমূলে উৎপাটন করে সেক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা একমাত্র লক্ষ্য। চীনের ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থাও রাশিয়া থেকে মোটেই বিভিন্ন নয়। অন্যদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ তো আমরা বিগত এক দেড়শো বছর থেকে দেখে আসছি। মুসলিম বিশ্বের উপর এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ যে ধ্বংস ডেকে এনেছে তার তুলনা নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী পাঞ্জাকে অধিকতর মজবুত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে আমাদের দেশ থেকে আমাদের নিজেদের জাতীয় চিন্তা-ভাবধারা-শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিতাড়িত করেছে এবং আমাদের মধ্যে এমন একদল লোকের সৃষ্টি করেছে যারা তাদের নিজস্ব জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরোধী। বাইশ বছর পর এই দল প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতায় নেমে এসেছে এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নে একটি প্রতিশ্রুতিশীল জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। বাইশ বছর আগে ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে জাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ এভাবে সেজাতি একটি

www.icsbook.info

বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

এ চ্যালেঞ্জ শুধু পাকিস্তানেই নয়, ভিতরে-বাইরে মুসলিম বিশ্বের দিকে দিকে আজ মুসলমানদের এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কোথাও এ চ্যালেঞ্জ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে, কোথাও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আবার কোথাও সরাসরি তাদের দ্বীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে এ চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাই ছিল এ ধরণের একটি চ্যালেঞ্জ। যে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিগত এক দেড়শো বছর থেকে মুসলমানদের মধ্যে দাস মনোবৃত্তির জন্ম দিয়েছে এবং তাদের দ্বীন ও ঈমানকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে আর যে সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার বুক থেকে সরাসরি মুসলমানদের চিহ্ন মুছে ফেলে দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে দিকে দিকে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেছে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই ফিলিস্তিনের বিশ লক্ষ মুসলমানকে উচ্ছেদ করে অন্যায়ভাবে এ ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এ ইহুদীরা শুধু ফিলিস্তিনের একটি অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি বরং তারা বিংশ শতাব্দীর এ সভ্যতা ও গণ অধিকারের যুগে সম্প্রসারণবাদের উপর বিশ্বাস রাখে এবং গত বিশ বছরে তারা নিজেদের সাম্রাজ্যকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। গত ছেষট্টি সালের যুদ্ধে তারা মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের বিরাট এলাকাসহ মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসও অধিকার করে নেয়। বায়তুল মুকাদ্দাস ভেঙ্গে এর উপর হাইকেলে সুলায়মানী প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তাদের বহুদিনের। হাজার হাজার বছর থেকে তারা এটাকে তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে আসছে এবং এটাকেই তাদের ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য রূপে গণ্য করেছে। সম্প্রতি এজন্যে তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে জঘন্যতা ও বর্বরতার দিক দিয়ে দুনিয়ার তার কোনো তুলনা নেই।

তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সে আগুন নিভাবার জন্যে যখন মুসলমানরা দৌড়িয়ে গেছে তখন তাদের উপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করেছে। এভাবে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় তারা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতিহিংসা নিবৃত্ত করেছে। চৌত্রিশটি মুসলিম রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য। তাদের সদস্যপদ একটি ক্ষুদ্র ইসরাইলকে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানী মর্যাদার উপর এভাবে হামলা করার পথে একটুও বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু কেন? এর কারণ হচ্ছে, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এই ক্ষুদ্র ইসরাইলের পেছনে শক্তি যোগাচ্ছে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানকে বিপর্যস্ত করে তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে সাম্রাজ্যবাদের যুপকাঠে বেঁধে ফেলতে। কাজেই মুসলিম বিশ্বের স্বার্থহানি করার দায়িত্ব গ্রহণকারী জাতিসংঘে এ সম্পর্কে দু-চারটে প্রস্তাব পাশ করিয়ে কোনো ফল হবেনা।

এ পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে হলে মুসলমানদের সর্বপ্রথম নিজেদের আসল শত্রুকে চিনতে হবে। ফিলিস্তিনে মসজিদুল আকসায় ইহুদীদের অগ্নিসংযোগ আর ঢাকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের হাতে আবদুল মালেকের শাহাদাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ঘটনাস্থল ও ঘটনার রূপের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে কিন্তু উভয় ঘটনার চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ঘটনার পেছনেই পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাই সক্রিয়। ইহুদীবাদ দুনিয়ার দেশে দেশে এ দুই মানসিকতাকে উজ্জীবিত করে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তাই এ দুই সাম্রাজ্যবাদ ও এদের মানসপুত্রদের বিরুদ্ধে আমাদের একযোগে অগ্রসর হতে হবে। এজন্যে মুসলমানদের মধ্যে দেশে-বিদেশে, ঘরে-বাইরে অভিন্ন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলিম দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি স্বাধীন শক্তিশালী ঐক্যজোট গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের আজ আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হতে হবে। দুনিয়ার লোভ ও মৃত্যুর ভয় তাদের দ্বীন ও ঈমানকে দুর্বল করে দিয়েছে। মুসলমানকে সকল স্বার্থের উর্ধে উঠে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দেশে বিদেশে সত্য ন্যায়ের ঝান্ডা বুলন্দ করতে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে এ জাতি হবে দুনিয়ায় অজেয় ও আখেরাতে সফলকাম।

মাসিক পৃথিবী : ঢাকা

www.icsbook.info

বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে

দৈনিক জং : ১৯শে আগস্ট

"একজন কৃতিছাত্র এবং দেশের তরুণ দিশারী চরমপন্থীর শিকারে পরিণত হলেন। বিগত আন্দোলনের পর চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে এটি হল প্রথম মর্মান্তিক ঘটনা, যা দেশের প্রতিটি মহলকে করেছে শোকাভিভূত। সরকারের প্রতি এ ব্যাপারে আমাদের আবেদন, জোর তদন্ত করে যদি প্রথমই এই চরমপন্থী দুষ্কৃতিকারীদের সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেন, তাহলে তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুঃসাহস করা সম্ভব হবে না।"

দৈনিক পাকিস্তান : ১৮ই আগস্ট

"এমন একজন উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রের এই করুণ মৃত্যু সত্যই অত্যন্ত শোকাবহ ও দুঃখজনক।"

দৈনিক ইত্তেফাক : ১৭ই আগস্ট

"দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একটি কৃতি ছাত্র এই ভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করবে, ইহার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। মালেকের মৃত্যু আমাদেরই সন্তানের মৃত্যু। কায়মনোবাক্যে আমরা কামনা করি, এক মালেকের রক্ত তরুণ ছাত্রসমাজ তথা এ দেশের বার কোটি মানুষের মনে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করুক। প্রেরণা যোগাক পরমতম সহিষ্ণুতার এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠার।"

দৈনিক আজাদ : ১৭ই আগস্ট

"এমনকি করাচী হইতে প্রখ্যাত মস্তিষ্ক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জুম্মাকেও আনাইয়া ছিলেন কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই কৃতি ও বিশেষ নেতৃত্বগুণের অধিকারী তরুণটিকে বাঁচানো গেলনা। উন্মত্ত হানাহানির শিকারে পরিণত হইয়া একটি অমূল্য ও সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল অবসান ঘটিল। আবদুল মালেক বাহিরের কোন গুণ্ডার আক্রমণে প্রাণ হারান নাই। হারাইয়াছেন তাহারই মত ছাত্রের হয়ত বা সহপাঠীর নিষ্ঠুর হস্তের নির্মম আক্রমণে। ছাত্র তরুণের শুভ বৃত্তির এই কি বিকাশ? যে উন্মত্ত হানাহানিতে এরূপ একটি বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা যেমন আমাদের নাই, তেমনি একটি বিধবা মাতার আশা-ভরসার স্থল আবদুল মালেকের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশেরও ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না।"

www.icsbook.info

এক নজরে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অবস্থান	:	রমনা, ঢাকা-১০০০
প্রতিষ্ঠাকাল	:	১ জুলাই ১৯২১
প্রথম ভিসি	:	স্যার পি.জে. হার্টস
প্রথম মুসলিম ভিসি	:	স্যার এ.এফ. রহমান
বর্তমান চ্যান্সেলর	:	অধ্যাপক ডঃ ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভাইস চ্যান্সেলর	:	অধ্যাপক এস.এম.এ ফায়েজ
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর	:	অধ্যাপক আ.ফ.ম ইউসুফ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক রাশিদুল হাসান
রেজিস্টার	:	মুহম্মদ সেলিম
মোট শিক্ষক-শিক্ষিকা	:	প্রায় ১,৪০০
ছাত্র-ছাত্রী	:	প্রায় ৩১,০০০
হল	:	১৭টি (ছাত্রদের ১৩টি, ছাত্রীদের ৪টি)
হোস্টেল	:	২টি
অনুষদ	:	৭টি
ইনস্টিটিউট	:	৯টি
বিভাগ	:	৪৯টি
উপাদানকল্প ও অধিভুক্ত কলেজ	:	৩১টি
প্রদত্ত পিএইচডি ডিগ্রী	:	৫৫২
প্রকাশিত গ্রন্থ	:	১৪৪
গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা	:	৬ লক্ষাধিক
ক্যাম্পাসের মোট আয়তন	:	২৫৬ একর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নাম	:	ডাকসু

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা

শহীদ আবদুল মালেক

(শহীদ আবদুল মালেক অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালে এ প্রবন্ধটি লেখেন। কিন্তু কোনো পত্রিকায় এটি ছাপাতে দেয়ার সুযোগ পাননি। তাঁর পুরাতন কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে এটি পাওয়া গেলো। —সম্পাদক)

"ধর্ম"—কথাটা নিয়ে একদল চিন্তিত আর একদল ব্যস্ত। চিন্তিতের দল ধর্ম-ভাবকে ব্যস্তের আর ব্যস্তের দল ধর্ম নিয়ে হেসেই আকুল। ধর্মের নাম শুনে আমরা ভদ্রলোকের মত চলে যাই। ধর্ম ধ্বজীরা (?) চিন্তা না করেই

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে
www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

আদর্শ জীবন

[জৈব-রসায়ন বিভাগের মাসিকপত্র 'কারেন্ট' থেকে গৃহীত। এটা মালেক ভাইয়ের জীবনের শেষ লেখা]

আমাদের এই পৃথিবীতে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব চলে আসছে বরাবর। এই বিরাট জীবন সমুদ্রের একটি জীবন বুদ্‌বুদের ন্যায় মিলে যায় আর একটি জীবন তখন পূর্ণ করে তার স্থান। জীবন-মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ বহু জীবনের সংস্পর্শে আসছি। কিন্তু জীবনের এই অখণ্ড স্রোতের মধ্যে কদাচিত দুই একটি জীবনের সন্ধান মেলে যা সর্ব বিষয় সাধারণ হতে স্বতন্ত্র। মহত্বে, জ্ঞানে, কর্মে সে জীবন হয়ে ওঠে আমাদের আদর্শ। তাকেই লক্ষ্য করে আমরা ছুটে চলি এ সীমাহীন মহাসাগরের বুক চিরে চিরে।

মানুষের জীবন তখনই আদর্শতার পর্যায়ে পৌঁছে যখন সে হয় বলিষ্ঠ নৈতিকতার অধিকারী, কঠিন সত্যের উপাসক। একটা জীবনকে আদর্শরূপে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে চাই তার সুন্দর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কেননা যে জীবন হবে বিশ্বমানবের আদর্শ, যাকে লক্ষ্য করে চলবে অগণিত মানুষ, সে জীবন যদি হয় চরিত্রহীন, উচ্ছৃংখল, অসংযমি, স্বেচ্ছাচারী তবে বিশ্বমানব ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে তখনই, আর এরূপ জীবন কখনই বিশ্বমানবের আদর্শ হতে পারে না।

জীবন এক অখণ্ড সাধনার মত। এই সাধনা যে কি, তাতে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সকল মতের গোড়ার কথা এই যে, মনুষ্য জীবনের বিরাট সম্ভবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া। অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক বিকাশ সাধন করাও মানুষের মহান আদর্শকে সার্থক করে তোলাই আদর্শ জীবনের সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন চরিত্র গঠন।

সত্যের দুর্জয় সাধনা আদর্শ মানব জীবনের অন্যতম সহায়ক। এই সাধনায় মানব জীবন সুন্দর ও ভাস্বর হয়ে মহিমার মহালোকে আরোহণ করে।

জীবন আদর্শ হয় শিক্ষা-দীক্ষায়, করুণা, প্রেম ও কঠোর আত্মশাসনে, কিন্তু অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের পান্ডিত্য জ্ঞান অসাধারণ, কিন্তু অন্যান্য উপাদানগুলোতে তাঁরা সমানুপাতে উন্নত নহেন, তাঁদের আমরা কৃতিবিদ্য বা প্রতিভাবান পুরুষ বলতে পারি, কিন্তু আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ জীবনের অধিকারী বলতে পারি না।

জীবনের সকল কর্ম সুন্দর হয় করুণা ও প্রেমে। বস্তুত প্রতিটি জীবনের প্রতি করুণা ও প্রেম প্রদর্শনই আদর্শ মানবের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

কঠোর আত্মশাসনে মানুষ সত্যিকার জীবন পথের দূরন্ত বাধা রিপুগুলোকে বশ করতে পারে। জগতে তার দ্বারা কোন অত্যাচার বা অনাচার সাধিত হতে পারে না। আত্মশাসনে বিজয়ী বীর মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জেহাদে কখনও পিছপা হতে পারেন না। সত্যের অনির্বাণ দীপশিখা নিয়ে পাড়ি জমান দিক হতে দিগন্তরে। দুনিয়ার কোন বাতিল শক্তি তার বিরুদ্ধে টিকতে পারে না। সকল মিথ্যা আবরণ ভেদ করে ছুটে চলে সত্যের চিরন্তন শিখা।

প্রাসাদে বাস করলে বা সমাজের নেতা হলে বা অতুল বৈভবের অধিকারী হলে তাকে আদর্শ জীবনের অধিকারী বলা যায় না, যে পর্যন্ত না তার দ্বারা জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হয়।

সর্বশেষ কথা হলো এই যে, আদর্শ জীবন বলতে আমরা এমন এক স্তরের জীবন যাত্রা প্রণালীকে বুঝি যা দ্বারা মানুষের ঐতিহ্য ও পারত্রিক সকল কর্ম সুন্দর হয়। যে জীবন মানুষের সকল কুসংস্কারকে জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষের চিরদিনের বদ্ধ জ্ঞানের বাঁধ ভেংগে দিয়ে এক নতুন এবং শাশ্বত, সত্য এবং সুন্দর পথের সন্ধান দেয়- তাই আদর্শ জীবন।

সৎগুণ ও সৎবৃত্তির বিকাশে মানুষের জীবন মনুষ্যত্বে ও মহত্বে পূর্ণ করে জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধনই আদর্শ জীবনের চরম লক্ষ্য, পরম উদ্দেশ্য।

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

প্রত্যয়ের আলোকে আমাদের জীবন

'ঈশ্বর যদি নাও থেকে থাকে তবে নিজের প্রয়োজনের খাতিরেই একজন ঈশ্বর তৈরি করে নাও'- কথাগুলো বলেছিলেন পাশ্চাত্যের এক আধা নাস্তিক দার্শনিক। আল্লাহকে আমরা অনেকেই স্বীকার করি কিন্তু নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাধীনতার বড়াই আমরা কেউই করতে পারিনা- কোন না কোন সত্তার কাছে জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে হোক আমরা নিজেদের গর্বিত মাথাটা নত করে দিই- দিতে বাধ্য হই। সে সত্তা এ পৃথিবীতেও হতে পারে অথবা কোন অতি প্রাকৃতিক জগতেরও হতে পারে। তাই তো দেখি কট্টর কম্যুনিষ্ট নাস্তিকও তাদের সংগ্রামী দেবতা লেলিনের সমাধির সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনি ভাবে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখব কেউ হয়ত ব্যক্তির পূঁজো করছে আবার কেউবা হয়ত সমষ্টির পূঁজো করছে, অর্থাৎ পূঁজো অর্চ্চনা, ইবাদত-বন্দেগী আমরা সবাই করছি, পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, আমি হয়ত আমার আপনার চাইতে অনেক বড় কোন মহাজাগতিক সত্তার আনুগত্য করছি, আর আপনি আপনারই মত কোন মানুষের অথবা তারে চাইতে নিকৃষ্ট কোন সত্তার দাসত্ব করছেন। তাহলে একটি সত্যই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, সৃষ্টিপ্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষ নিরঙ্কুশ ভাবে স্বাধীন নয়- কোন না কোন সত্তার আনুগত্য করা তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য। মনীষীরাও এ সত্যকে অস্বীকার করেন না। নিউটন ও আইনস্টাইন বিস্ময়কর সুশৃংখল সৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় এক ঐশী সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। ভলটেয়ারের মত মুক্ত বুদ্ধি ও মানব প্রগতির অন্যতম প্রবক্তাও খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে নি। অবশ্য ভলটেয়ারের খোদা বাইবেল বা কুরআনের খোদা নয়। নীটশের মত গোড়া নাস্তিক সরাসরি খোদার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও অতি মানবের (Superman) অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তারই হাতে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ কম বেশী সবাই খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু সমস্যাটা হলো সেই খোদা আমাদের কোন খোঁজ-খবর রাখেন কিনা- আমরা কি তাঁর আইন ও ক্ষমতার আওতায় না একবারেই স্বাধীন- আমরা কি তাঁরই আইন মেনে চলবো না নিজেরাই নিজেদের পরিকল্পনা ভার গ্রহণ করবো এমন কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে। যদি বলা হয় আল্লাহ তো আমাদের স্রষ্টা, আইন-কানুন কেবল তাঁরই মেনে চলা দরকার- তখন বলা হবে, এটাতো একটা Abstract Idea আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমরা তো কেবল তাই বিশ্বাস করি, যা আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি, হাত দিয়ে স্পর্শ করি অর্থাৎ সোজা কথায় ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তার আনুগত্য আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। বস্তুত আধুনিক জীবন দর্শনই হচ্ছে আমরা যা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি তা-ই সত্য এবং তারই মূল্যমান আছে।

বস্তুবাদী জীবন দর্শনে Truth এবং Reality কেও আমরা বস্তুর সীমিত পরিসরের বাইরে যেতে দিই না। আমাদের সকল লক্ষ্য ও সাধনা কেবল মাত্র বস্তু ও বস্তু জগতের উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দৈহিক সুখ ও দুঃখকেই আমরা জীবনের সফলতা ও বিফলতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি। মানুষের উন্নত মূল্যমান অস্বীকার করে গোটা মানব সত্বাকে আর দু'দশটি বস্তুর ন্যায় কতকগুলো অজৈব পদার্থের সমন্বয় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ মানব প্রকৃতির উত্তম দিকগুলোর স্থান দখল করেছে। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা ধারার আবার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নতা, আর এ থেকেই আস্তে আস্তে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে ভোগবাদ, উপযোগবাদ, সংশয়বাদ, পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ইত্যাদির এবং এভাবেই সমাজ সভ্যতা তথা গোটা মানবজীবন প্রহসন মাত্রে পরিণত হয়েছে। প্রবন্ধের এই অংশে আমরা পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে বিচার করে দেখব জীবনে আমরা পেয়েছি কি? হারিয়েছি কতটুকুইবা? প্রকৃতি বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ মানুষের জীবনকে করেছে সম্পদশালী, স্থান-কাল পাত্রের ব্যবধান করেছে দূরীভূত। প্রকৃতির কোণায় কোণায় মানুষ বিজয়ীর বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে উৎপাদন বেড়েছে অনেক, আর মানুষের ভোগের সামগ্রীও হয়েছে প্রচুর। মানুষের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার হয়েছে চরম বিকাশ, সমাজ ও সভ্যতার পরিসরও গেছে তাই বেড়ে। আমরা তাই হতবাক হয়ে যাই আমাদেরই সৃষ্টির

www.icsbook.info

দিকে তাকিয়ে।

এতো গেল জীবনের একদিক- উজ্জ্বল দিক, অন্যদিকে বস্তুতান্ত্রিক এই সভ্যতার উৎকর্ষের ফলে আমাদের জীবনের চরম অধঃপতন সূচিত হয়েছে। পশ্চিমের এই সভ্যতায় আমরা পেয়েছি অনেক কিন্তু হারিয়েছি তারও বেশী। মানব জীবনের গোটা কাঠামোকে ধ্বংস করেই এই সভ্যতা গড়ে তুলেছে এর সৌধ। বস্তুর উন্নতি জীবনের স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তা আনতে পারেনি। প্রকৃতি জয়ের সংকল্প নিয়ে যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলাম তা এখন আমাদেরই জীবনকে সংশয়ের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে, বিঘ্নিত করেছে আমাদের গোটা অস্তিত্বকে, আমরা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আমাদের জন্যই ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে সত্য কিন্তু তার বিবেকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। আর এজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের ধ্বংস কাজে ব্যাপৃত। Russel তাইতো বলেছেন, Knowledge is power but it is power for evil just as much as for good. If follows that unless man increases in wisdom as much as in knowledge will be increase of sorrow.

বস্তুতান্ত্রিক দর্শন জীবনের ভিত্তি মূলে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মানবসত্তার অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষকে জড় বস্তুর একটি রূপান্তর ছাড়া অধিক কিছু কল্পনা করতে পারেনি। মহাকাশের অসীম বুকে ভাসমান একটি গ্রহের বুকে নৃত্যশীল ক্রীড়নক সত্তার অধিক দাম দেয়নি। জড় বিজ্ঞান তাই মানুষকে বলেছে,

The level of a mere reflex mechanism a mere organ motivated by sex, a mere semi mechanical semi psychological organism devoid of any divine spark of any absolute value of anything noble and sacred আর তাই বোধ হয় Alixis crrel দুঃখ করে বলেছিলেন, Today the most neglected of study is poor man.

আধুনিক জীবন দর্শনে চূড়ান্ত সত্য (Absolute truth) বলতে কিছু নেই। পুরাতন সত্যের সাথে নবাগত সত্যের সংঘর্ষের ফলে দু'টোই বিলুপ্ত হচ্ছে আর সেখানে synthesis হচ্ছে নতুন আর একটি সত্যের। তাও আবার আপেক্ষিক- ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক যুগ সভ্যতা জীবনের নৈতিক ও আর্থিক দিক অস্বীকার করে কেবল দৈহিক সত্তারই পুষ্টি সাধন করে যাচ্ছে। অখণ্ড জীবনকে খণ্ড খণ্ড ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন Water tight compartment গড়ে তুলেছে। দেহ ও আত্মার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছে এক কঠিন দ্বন্দ্ব। বস্তুবাদী দর্শনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে আত্মা হয়েছে একটি মৃতদেহ।

আধুনিক যুগ সভ্যতায় প্রবণতা হচ্ছে জীবনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে (dialelical materialism) দ্বারা ব্যাখ্যা করা। ফলে অতীতের সকল সত্যই আজ সন্দেহের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান সর্বস্ব হওয়ার এক উৎকট মানসিকতা, আধুনিক মানুষের মজ্জাগত ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

জীবনের পরম সত্যগুলোর ক্ষেত্রেও আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগের ফলে সৃজনশীল মানুষের কর্মপ্রেরণা অনেকখানি কমে এসেছে। কারণ আমি আজ সে সত্যের সৃষ্টি করব তা আগামী প্রভাতের সূর্যোদয়ের আগেই বিলীন হয়ে যাবে- ক্ষণিকের স্থায়িত্বের জন্য নিশ্চয়ই আমার মনে কোন বৃহৎ সৃষ্টির প্রেরণা জাগতে পারে না। সরোকীন আধুনিক সভ্যতার এ বীভৎস চিত্রই অংকন করেছেন-

Yesterday's, values are absolute tomorrow, and who can create anything perennial in this inconstant Niagara of change. By because of this feverish change, our culture devours its own creations, as soon as they emerge, today it builds enormous buildings from steel and concrete, tomorrow it tears them down. Today it erects to aim new fangled god in science and philosophy, in religion and fine arts, and in any of its compartments tomorrow it will demolish it into smoke. In this sense our culture is new cronous incessantly devowing his own children. Hardly anything perennial can be created, and nothing can survive this perennial destruction.

বস্তুর মূল্যমান এখানে কখনও তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না- নির্ধারিত হয় তার পরিব্যাপ্তিতে। আমাদের দৃষ্টিতে তাই যা কিছু বৃহৎ, তাই মহৎ।

অন্যদিকে আণবিক শক্তির অপব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে- সংশয়ের আবর্তে আমরা প্রতিনিয়তই ঘুরপাক খাচ্ছি। জড়বাদী দর্শন শিখিয়েছে- জোর যার মুল্লুক তার, বেঁচে থাকার

www.icsbook.info

অধিকার তারই আছে, যে জড়জগতের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে বিজয়ী হতে পারে। দূর্বলকে গ্রাস করা সবল তার নিজস্ব অধিকার বলে মনে করে। পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলো তাইতো প্রাচ্যদেশীয় ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে শোষণ করা কোন নৈতিক অন্যায় বলে মনে করে না। কারণ নিরন্তর সংগ্রামমুখর এই পৃথিবীতে দূর্বলের বাঁচারই কোন অধিকার নেই।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাই সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনের কোন সমৃদ্ধি আনতে পারেনি। সংঘাতের মুখে পড়ে পড়ে কেবল মানুষ মার খাচ্ছে জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এক গভীর শূণ্যতা। আধুনিক শিল্পসভ্যতা ও বিশৃংখল জীবন দর্শনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাই এক মনীষী বলেছিলেন-

People are fleeing from ghosts pursuing them fleeing from their inner natures the material prosperity, sensual enjoyment and sexual satiation lead to a sinking into the morass of nervous & psychological disease, sexual perversion, constant anxiety, illness and misery, frequent crime and lack of human dignity in life.

সংশয়ের আবর্তে আমাদের জীবন। আর সংশয়ের আবর্তে নিমজ্জিত হওয়ার প্রধান কারণই হলো আমরা বস্তুর দাসত্ব করছি- নিজেদের মাথাকে বস্তু দেবতার সামনে নত করে দিয়েছি। বস্তু বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আমরা নিজেরাই মানব জাতিকে পরিচালনার জন্য আইন প্রনয়ণ করছি, বিধান দিচ্ছি। এ ভাবে এক গোষ্ঠী সেজে বসেছে বিধানদাতা প্রভু আর অবশিষ্ট মানুষ তাদেরই দাসত্ব করছে। অথচ মানব জাতির জন্য সুষ্ঠ বিধান দিতে হলে চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেই বিধানদাতা সত্তার। প্রথমত: তাকে হতে হবে গোটা মানব জাতির উপর ন্যায় পরায়ণ, যাতে করে কোন মানুষ বা মানব সমষ্টির উপর পক্ষপাতিত্ব না হয়। দ্বিতীয়ত: তাকে মানুষের দৃশ্য-অদৃশ্য, অনুভূত-অননুভূত সকল প্রকৃতির সাথেই হতে হবে পরিচিত, তৃতীয়ত: তাকে একই সাথে সকল মানুষের জন্যই হতে হবে কল্যাণকামী ও মঙ্গলময়, চতুর্থত: মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দ্রষ্টা হতে হবে।

উল্লিখিত চারটি মৌলিক প্রয়োজনীয় গুণ মানুষের মধ্যে বর্তমান নেই। আর নেই বলেই মানুষের দেয়া আইন কানুন সমাজের সঠিক কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। একটি সমস্যার সমাধান দিতে যেয়ে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মোট কথা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে রোগীর যেমন কোন নিরাপত্তা নেই, তেমনি মানুষের মনগড়া আইন ও বিধানের কাছেও সমাজ ও জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।

উপরোক্ত চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করলে সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রনয়ণের ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে অর্পণ করতে হয়। কারণ তিনি গোটা মানব জাতির জন্যই নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারক। তিনিই কেবলমাত্র মানুষের দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রকৃতি নির্ণয়ের জ্ঞান রাখেন এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্যক দ্রষ্টাও তিনিই। তাই সত্যিকার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র কেবলমাত্র তাঁরই সার্বভৌমত্ব ও বিধান মেনে নিয়েই গড়ে উঠতে পারে। সংশয়ের আবর্তে নিক্ষিপ্ত জীবন এভাবেই পেতে পারে মুক্তির সন্ধান। আর তাইতো কুরআন বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে : 'আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আর অস্বীকার করেছে তাদেরকে, যারা আল্লাহর দেয়া বিধানের পরিবর্তে মেনে নিয়েছে আর কোন বিধানকে কুরআন বলে : তারা কি আল্লাহর মনোনীত পথ ছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান করে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কেবল তাঁরই আনুগত্য করছে। আর তারাও তো অবশেষে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।'

আল্লাহর মনোনীত এই পথই হচ্ছে 'ইসলাম' অনেকে ইসলাম বলতে বুঝেন মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার ব্যাপার। তাদের মতে ইসলাম একটা আধ্যাত্মবাদ বা পরলোকতত্ত্ব, কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। কুরআনের অধিকাংশ অধ্যায়ই মানুষের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছে এবং এই পৃথিবীর জীবন একটা সুষ্ঠ ইঙ্গিত দিয়েছে, অতএব ইসলাম একটি ধর্মমাত্র নয়, নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

ইসলাম কখনই মানুষের প্রকৃতি ও তার বস্তু সত্তাকে অস্বীকার করেনি। বস্তুসত্তার বিকাশের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে, তবে মানুষকে বস্তুর দাস করে তুলতে চায়নি কখনও। আর সেই জন্যই ভারসাম্যপূর্ণ একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ইসলাম মানুষকে সত্যিকার মানবিক মর্যাদা দিয়েছে -তাকে সকল সৃষ্টির উপরে প্রতিপত্তিশীল এক সৃষ্টিরূপে ঘোষণা করে। ইসলামই মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দিয়েছে- মানবতার সীমার মধ্যে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। আল্লাহর দেয়া এ জীবন

www.icsbook.info

ব্যবস্থাই মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, মানুষের দেওয়া ভ্রান্ত আইন ও বিধানের মূলোৎপাটন করে মানুষের প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্বকে খতম করেছে। এভাবে মানব মন ও মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বাস্তব জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে।

কারো কারো ধারণা ইসলাম তো একটা খোদায়ী বিধান, কাজেই কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। অতীতে আমরা দেখেছি একদল মানুষের চেষ্টা সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলেই এই জীবন বিধান দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজো যদি সেই প্রচেষ্টা ও সাধনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে ইতিহাস আর একবার তার অধ্যায় পরিবর্তন করতে বাধ্য।

অনেকে বলে থাকেন- ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মেনে নিলে জীবন নিরস শুষ্ক হয়ে যায়। বিধি নিষেধের শৃংখলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ভোগের সকল স্বাধীনতা থেকেই বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু আসলে এগুলো মোটেও ঠিক নয়। এই বিভ্রান্ত চিন্তাধারা কতটা উদ্দেশ্যপ্রসূত এবং অনেকটা অজুহাতবশতঃ। পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত ব্যক্তিই ইসলামকে কেবলমাত্র একটি আদর্শবাদ হিসেবে দেখতে প্রয়াস পান। তাদের লেখনিতে প্রায়ই ইসলামের অবাস্তব ও অনুপযোগী কাল্পনিক রূপ ফুটে উঠে। উদ্দেশ্যটা হলো, ইসলাম সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারায় একটা হতাশার সৃষ্টি করা। আসলে সত্য ব্যাপারটা হলো এই যে, ইসলাম যেহেতু মানুষের জন্যই একটি জীবন ব্যবস্থা এবং মানব প্রকৃতির সাথে পুরো সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব এটি কোন মতেই মানুষের উপর তার প্রকৃতি বিরোধী কোন কিছুই চাপিয়ে দিতে পারে না। ইসলাম তো কেবল মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে নিয়ে যেতে চায়। ইসলামের নৈতিকতা কেবলমাত্র কতকগুলো বিধিনিষেধের সমষ্টি নয় বরং এ হচ্ছে এক গঠনমূলক শক্তি যা গোটা জীবনকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে। ইসলামের নৈতিক বিধান অন্যায়ের প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়ের বিকাশ ঘটায় এবং এভাবেই ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন করে। ভোগের বিরোধিতা ইসলাম কোনদিন করেনি তবে তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে বহুবার। কারণ ভোগের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গোটা সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে, সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তাই সত্যিকার সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সকল প্রকার অন্যায় ও অসত্য মানুষের আত্মাকে শৃংখলিত করে এবং মানব মনকে করে দেয় বিকারগ্রস্ত। এজন্য ইসলাম প্রথমেই অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন চায়। অবশ্য একথা সত্য যে, অনৈসলামী পরিবেশে একজন মুসলমানের জীবন যাপন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং দুরূহ ব্যাপার। আর সে জন্যই বর্তমান মুসলিম জীবন ধারার দিকে তাকিয়ে ইসলামকে শুষ্ক ও নিরস এক জীবন ব্যবস্থা বলে মনে হয়। ইসলামের সামাজিক পরিবেশে একজন মুসলমানের জীবন অত্যন্ত সরস ও জীবন্ত।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি আবার বলে থাকেন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তো আলী (রা) এর শাহাদাতের সাথে সাথেই শেষ। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার ক্ষমতা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নেই। কাজেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে তারা একটা Utopia বলে মনে করেন। আসলে তাদের এ ধারণাটাও ভুল এবং ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মাত্র অর্ধ শতাব্দীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে একক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করেছিল তা বিগত হাজার বছরেরও অধিক কাল দুনিয়ার সকল অজ্ঞতা, মূর্খতার সম্মিলিত বাধার সামনে নির্বিকার শাশ্বতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য বিশ্বব্যাপী মূর্খতার সম্মিলিত আক্রমণে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা ক্ষয়িত হয়েছে এবং মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুতও হয়েছে। কিন্তু এর আদর্শিক ভিত্তিমূলে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হতে পারেনি।

একথা সত্য যে, পূর্ণরূপে বিকশিত প্রতিপত্তিশীল একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিল স্বল্পকালের জন্য। ইতিহাসের চরম উৎকর্ষের যুগটি আমাদের জন্য একটা ইঙ্গিতমাত্র ছিল। অল্প সংখ্যক লোকের প্রচেষ্টা ও সাধনায় যে সত্যের প্রকাশ হয়েছিল, দুনিয়ার মানুষকে সভ্যতার আলো দান করেছিল- তার পূনঃপ্রতিষ্ঠা কেবল কল্পনা বিলাস নয়, আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতই সত্য।

(শহীদ আবদুল মালেক ইসলামের পক্ষ সমর্থনের অপরাধে ১২ আগস্ট ইসলাম বিরোধী একদল ছাত্রের প্রহারে গুরুতর আহত হয়ে গত ১৫ই আগস্ট বাদ মাগরিব ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শাহাদাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর স্মৃতিস্বরূপ তাঁর স্বরচিত এই প্রবন্ধটি ২২ শে আগস্ট দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়েছিল।)

www.icsbook.info

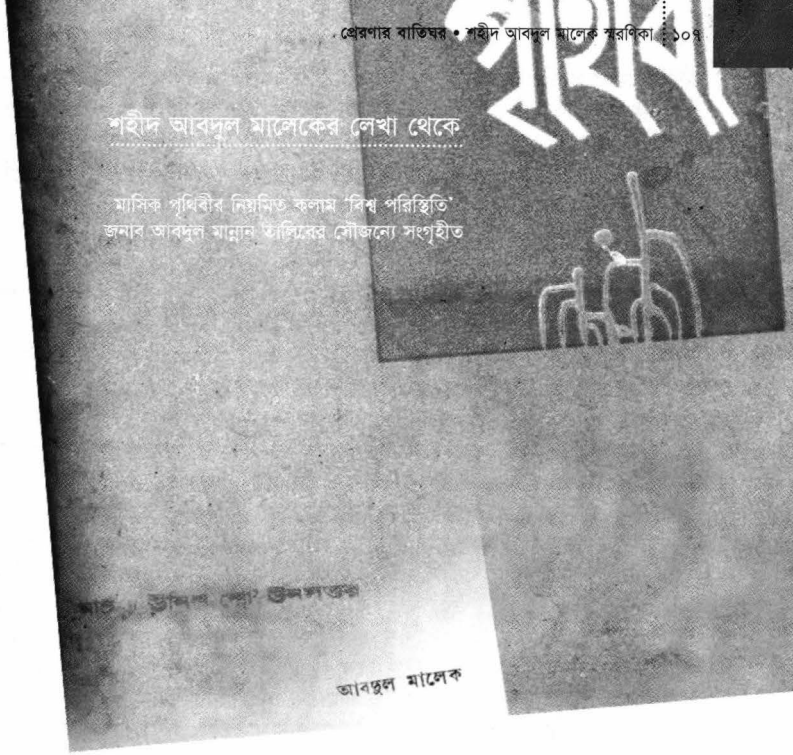

ঘটনা প্রবাহ

মধ্যপ্রাচ্যঃ বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ক্রীড়ামঞ্চ

সম্প্রতি ''লন্ডন অবজার্ভারের'' প্রতিনিধি মিঃ কেনেথ হ্যারিসের সাথে এক সাক্ষাতকারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বলেছেন: মধ্যপ্রাচ্যে ভবিষ্যত কোন যুদ্ধবিগ্রহ কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসমূহকেই সংঘর্ষশীল করে তুলবেনা বরং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৃহৎ শক্তিগুলোকেও যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে। আমরা সভ্যতার এই জন্মভূমিকে কোনক্রমেই তার গোরস্থানে পরিণত হতে দিতে পারি না।'' কথাগুলো অবশ্য যথার্থ। কিন্তু বিশ্বের মুসলিম জনতার প্রশ্ন, আরব মুসলমানদের পাইকারী হত্যা, নির্যাতন ও মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করার জন্যই কি ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি? দুনিয়ার মুসলমানদের বিরোধীতা সত্তেও আমেরিকা, রাশিয়া বৃটেন, ফ্রান্স মিলে এই বিষফোঁড়ার প্রতিষ্ঠা করেছিলো। গত বিশ বছর যাবত এই বৃহৎ চতুঃশক্তিই মধ্যপ্রাচ্যের এই কালসাপকে লালন পালন করে আসছে। চতুঃশক্তির

মার্চ '৬৯

মধ্যপ্রাচ্য ঃ বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ক্রীড়ামঞ্চ

সম্প্রতি 'লন্ডন অবজারভারের' প্রতিনিধি মিঃ কেনেথ হ্যারিসের সাথে এক সাক্ষাতকারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বলেছেন, "মধ্যপ্রাচ্যে ভবিষ্যত কোন যুদ্ধবিগ্রহ কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসমূহকেই সংঘর্ষশীল করে তুলবেনা বরং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৃহৎ শক্তিগুলোকেও যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে। আমরা সভ্যতার এই জন্মভূমিকে কোনক্রমেই তার গোরস্থানে পরিণত হতে দিতে পারি না।" কথাগুলো অবশ্য যথার্থ। কিন্তু বিশ্বের মুসলিম জনতার প্রশ্ন, আরব মুসলমানদের পাইকারী হত্যা, নির্যাতন ও মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করার জন্যই কি ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি? দুনিয়ার মুসলমানদের বিরোধীতা সত্তেও আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স মিলে এই বিষফোঁড়ার প্রতিষ্ঠা করেছিলো। গত বিশ বছর যাবত এই বৃহৎ চতুঃশক্তিই মধ্যপ্রাচ্যের এই কালসাপকে লালন পালন করে আসছে। চতুঃশক্তির মুনাফেকি

www.icsbook.info

নীতির কথা আজ আর কারো অজানা নেই। একদিকে তারা নিরাপত্তা পরিষদে বসে শান্তি প্রস্তাব পাশ করেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি মিশন প্রেরণ করেন আর অন্যদিকে ফ্যান্টম ও মিরেজ বিমান এবং আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রে ইসরাইলকে সুসজ্জিত করে তোলেন। এই বৃহৎ শক্তিবর্গের সহযোগিতায়ই ইসরাইল ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে সিনাই, গাজা, সিরিয়ার গোলান মালভূমি এবং পবিত্র জেরুজালেম সহ জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে আরবদেরকে বিতাড়িত করে সেখানে ইহুদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইসরাইলী বিশেষজ্ঞরা সিনাই উপদ্বীপের তৈলসমৃদ্ধ এলাকার পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের জন্য কূপ নির্মাণ করছে এবং তেলের পাইপে মিসরের জীবনী শক্তি নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে।

যুদ্ধশেষে ইহুদীরা মুসলিম সম্পত্তির অনেক ক্ষতিসাধন করে। ডিনামাইট ও বুলডোজার দিয়ে অনেক বাড়ী-ঘর ও মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ ব্যালনান তার রিপোর্টে এরূপ ১৩৫টি বাড়ীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের সাথে আরো নতুন নতুন ধ্বংসক্রিয়া যোগ করা হচ্ছে।'

'জেরুজালেম পোস্টের' খবরে প্রকাশ, ব্যাপক খননকার্যের মাধ্যমে ইহুদীরা মসজিদুল আকসা ও মসজিদুল সাখরার রূপ পরিবর্তন করতে চলেছে। অধিকৃত এলাকাসমূহ গ্রাস করার জন্য ইসরাইল ইবান প্ল্যান, এশকল প্ল্যান প্রভৃতি নানা পরিকল্পনা উদ্ভাবন করছে। সম্প্রতি লন্ডনের ইকনমিস্ট-এ প্রকাশিত 'অ্যালোন প্ল্যান' (Allon plan) ইহুদীদের সম্প্রসারণবাদের আর একটি কারসাজি। ডিসেম্বরের শেষদিকে ইসরাইলে একখানি মানচিত্র প্রকাশিত হয় এবং তা 'World zionest Congress' এর নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উক্ত মানচিত্রে অধিকৃত আবু আখিলা, আল আরিশ এবং গাজা থেকে শারমুল শেখ পর্যন্ত আকাবা উপসাগরের তীরভূমিকে ইসরাইলের অন্তর্ভূক্ত দেখানো হয়েছে। ইসরাইলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোশে দায়ান ঘোষণা করেছেন : 'ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রধানত সামরিক নিরাপত্তার জন্যই সিনাই উপদ্বীপ এবং গোলান মালভূমি প্রয়োজন। আমাদেরকে অবশ্যি গোলান মালভূমিতে বসবাস আরম্ভ করতে হবে, সিনাই উপদ্বীপকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরকে অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিক দিয়ে ইসরাইলের সাথে যুক্ত করে ফেলতে হবে।'

মধ্যপ্রাচ্যের এই অশান্তকর পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ও বৃহৎ চতুঃশক্তি কেবল টালবাহানার নীতিই গ্রহণ করেছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের এক সিদ্ধান্তক্রমে ডঃ গানার জারিংকে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে আলোচনা করার জন্য নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু জারিং মিশন মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। অন্যদিকে ইসরাইলের যুদ্ধংদেহী মনোভাব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ইসরাইলী কমান্ডোবাহিনী বৈরুত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ১৩ খানা বেসামরিক বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষ থেকে নিন্দা করা হলেও এতে ইসরাইলের কিছু যায় আসেনা। আমেরিকার ফ্যান্টন বিমানের এক বিরাট চালান ইতিমধ্যেই ইসরাইলে পৌঁছার অপেক্ষা করছে।

রাশিয়ার মুনাফেকী নীতি আজ আর কারো অজানা নেই। গত জুন যুদ্ধে আরবদের প্রকাশ্য সমর্থন দেওয়ার পেছনে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ছিল বিরাট। ভূমধ্যসাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের মোকাবিলা করার জন্য রাশিয়ান যুদ্ধ জাহাজ সমূহকে ভূমধ্যসাগরে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু বাধা ছিলো বৈরী তুরস্ক। কেবলমাত্র আরবদের সাহায্য করবে এই আশ্বাসেই তুরস্ক সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজকে বসফরাসে প্রবেশের অনুমতি দেয়। ইহুদীবাদের মোকাবিলায় দুনিয়ার মুসলমান যখন ঐক্যজোট গঠন করতে প্রয়াসী ছিল রাশিয়া নানা কৌশলে তা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এমনকি পারস্য উপসাগরীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো যখন প্রতিরক্ষা জোট গঠন করতে চেষ্টা করছিল রাশিয়া তাকেও সাম্রাজ্যবাদের কারসাজি বলে অভিহিত করেছে।

সম্প্রতি জাতিসংঘের কূটনৈতিক মহলসূত্রে প্রকাশ, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া একটি নতুন প্রস্তাবের কথা চিন্তা করছে। যার ফলে ইসরাইলকে সিনাই এলাকামুক্ত করে দিতে হবে। জেরুজালেম ও অন্যান্য আরব ভূখন্ডের কথা এ প্রস্তাবে উল্লেখ নেই বলেই ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে প্রকাশ। এক্ষেত্রে রাশিয়ার চাল অত্যন্ত পরিষ্কার। সিনাই এলাকামুক্ত হলে সুয়েজ খাল নৌ-চলাচলের উপযোগী হবে এবং ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত রুশ নৌবহর পাক-ভারত উপমহাদেশের

www.icsbook.info

উপকূল পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরতে পারবে।

বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষ করে আমেরিকা ও রাশিয়ার এই চালবাজি ও টালবাহানার সুযোগে ইসরাইল ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পশ্চিম দুনিয়ার ওয়াকিফহাল মহলসূত্রে প্রকাশ, ইসরাইল জেটজঙ্গী বিমান ও আনবিক অস্ত্র উৎপাদনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অনেকের ধারণা ইসরাইলের হাতে এখন একটি আনবিক বোমা রয়েছে। London Institute for Stontegic Studies এর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৬৪ সালে ফরাসী সাহায্যে ইসরাইলের ডিমোনাতে ২৪ থারমাল মেগাওয়াটের যে আনবিক চুল্লী স্থাপিত হয়েছে তা থেকে বছরে একটি আনবিক বোমা তৈরি হতে পারে। জনৈক বৃটিশ বিমান বিশেষজ্ঞের মতে ১৯৭০ সালের মধ্যেই ইসরাইল এমন ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে যার ধ্বংসক্রিয়া ২৮০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

ইসরাইলের এই সামরিক প্রস্তুতি এবং বৃহৎশক্তিবর্গের এই নিষ্ক্রিয়তা ও পরোক্ষ সাহায্যের মোকাবিলায় আরবরা আজো সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। খার্তুম কনফারেন্সের প্রস্তাব সমূহকে এখনও কার্যকরী করা হয়নি। আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে তো কোন্দল লেগেই আছে।

ইরিত্রিয়া : বিবেকের একটি জিজ্ঞাসা

'মাত্র কয়েকটি পুরনো বৃটিশ রাইফেল আর তেরজন গেরিলা নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের মুক্তি সংগ্রাম উনিশ শো বাষট্টি সালের দিকে। আজ আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে হাজারেরও উপরে আর ঐ মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিয়েছে ইরিত্রিয়ার মজলুম মুসলিম জনতা।' কথাগুলো বলছিলেন পাকিস্তান সফররত ইরিত্রিয়ান মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধি জনাব আলী বারহাতু।

সত্যিকথা বলতে কি সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী চক্রের কারসাজিতে ইরিত্রিয়া সমস্যাটি ধামাচাপা পড়ে রয়েছে। তাদেরই চক্রান্তে ইরিত্রিয়ার মজলুম মুসলমানের আওয়াজ মুসলিম দুনিয়ার কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পাচ্ছে না। মুসলিম আফ্রিকার এই দেশটি লোহিত সাগরের উপকূল বরাবর ৬৭০ মাইল বিস্তৃত। এর পশ্চিম সীমান্ত বরাবর সুদান, দক্ষিণে ইথিওপিয়া এবং দক্ষিণ পূর্বে সোমালী প্রজাতন্ত্র অবস্থিত। আয়তনে ৪৮ হাজার ৩৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইরিত্রিয়া উসমানীয় খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৮৫ সালে ইরিত্রিয়া ইতালির উপনিবেশে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পরাজয়ের ফলে বৃটেন ইরিত্রিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইরিত্রিয়া বৃটিশ সামরিক শাসনের শিকারে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ইথিওপিয়ার খৃস্টান সম্রাট হাইলে সেলাসী বৃটেনের সাথে ষড়যন্ত্র করে ইরিত্রিয়াকে নিজস্ব সাম্রাজ্যভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ লোহিত সাগরে প্রবেশ করার জন্য ইথিওপিয়ার উপনিবেশবাদী সম্রাট সেলাসীর জন্য ইরিত্রিয়া ছিল একান্তভাবেই অপরিহার্য। ইথিওপীয় সম্রাটের ষড়যন্ত্র সফল হলো। ইরিত্রিয়ার ২৫ লক্ষ মানুষের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ১৯৫০ সালের ২রা ডিসেম্বর জাতিসংঘ চক্রের এক প্রস্তাবনার ফলে ইরিত্রিয়াকে ইথিওপীয় দস্যুদের হাতে তুলে দেওয়া হোল। পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রবল বিরোধিতা সত্তেও ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া মিলিয়ে এক ফেডারেশন গঠন করা হোল। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া সম্পর্কের জন্য চারটি নীতি নির্ধারণ করা হোল :

(১) ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্ব শাসিত ইউনিট হবে।

(২) ঘরোয়া ব্যাপারে ইরিত্রিয়া সরকারের গণতন্ত্রের মূলনীতি ভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা থাকবে।

(৩) ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া হতে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি ফেডারেশন কাউন্সিল গঠিত হবে। ফেডারেশনের সাধারণ ব্যাপারসমূহ পরামর্শ দেয়ার জন্য কাউন্সিল বছরে একবার মিলিত হবে। ইরিত্রিয়ার জনগণ শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করবে এবং ফেডারেল সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব করবে।

(৪) ফেডারেল সরকার এবং ইরিত্রিয়া প্রত্যেকেই তার অধিবাসীদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাব, ভাষা

www.icsbook.info

নির্বিশেষে সামরিক ও মৌলিক অধিকার ভোগ করার আজাদী দান করবে। কিন্তু এ ঘোষণাগুলো ছিলো একটা বিরাট রকমের ধাপ্পাবাজী। ঘোষণাগুলোর কোন মর্যাদাই সম্রাট রাখেননি। বরং ফেডারেশন গঠন করার অব্যবহিত পরেই শুরু হোল ব্যাপক নির্যাতন ও গণহত্যা। ইথিওপিয়ার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ ও নর-নারী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হোল। কেবলমাত্র সুদানের কামালা প্রদেশেই ৪০ হাজার ইরিত্রিয়ান নর-নারী আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইরিত্রিয়ান মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করে একটি স্মারকলিপি প্রদানের অপরাধে ইরিত্রিয়ান সুপ্রীম ফেডারেল কাউন্সিলের মোহাম্মদ উমর কাজীকে দশ বৎসর এবং হাজী ইমাম মুসা এবং হাজী সুলায়মান আহমদকে চার বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ইথিওপিয়ার নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ইরিত্রিয়ার মুক্তিপাগল জনতা মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে ১৯৬২ সালে। সোমালিয়া, সিরিয়া, সুদান আলজিরিয়া, ইরাক ও দক্ষিণ ইয়ামেনে এর দপ্তর গড়ে উঠেছে। নির্বাসিত ইরিত্রিয়ানরা এর সহযোগিতা করে যাচ্ছে। মজলুম ইরিত্রিয়া আজ মুক্তির দিন গুনছে। তার জনগণের চোখের অশ্রু মানবতার সামনে আজ এক বেদনাদায়ক জিজ্ঞাসা।

চেকোশ্লাভাকিয়ায় সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত হওয়ার একটি সংগ্রাম

'আমার ভয় হয়, সোভিয়েত শাসকরা এমন একটি পোলিশ সমাজতন্ত্রী সরকারই চান যা পোল্যান্ডকে তাদের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করবে' -কথাগুলো বলেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পোলিশ প্রধান জেনারেল সিকোরসকী। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। সিকোরসকীর সেদিনের সে আশঙ্কা অমুলক ছিলো না। শুধু পোল্যান্ডে নয় গোটা পূর্ব ইউরোপই আজ রাশিয়ার তল্পীবাহক সাজতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরী রাশিয়ার তাবেদারী পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলো, প্রতিফল হিসেবে বুদাপেস্টের রাজপথ হাঙ্গেরীর মুক্তিকামী জনতার উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। আর আজ সেই একই কারণে চেকোশ্লাভাকিয়ার ১ কোটি ৪৩ লক্ষ মানুষ নিজেদের আজাদী নতুন করে রাশিয়ার কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হচ্ছে, সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর সশস্ত্রবাহিনী প্রাগ ও ব্রাতিশ্লাভার রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে। অপরাধ শুধু এটুকু যে, চেকোশ্লাভাকিয়ার জাগ্রত জনতা আর রাশিয়ার তল্পী বহন করতে রাজী ছিলনা। তারা বলেছিলো 'আমাদের দেশের ভালমন্দ আমরাই বুঝি'।

বিশে আগস্টের রাত। চেক জনসাধারণ যখন নিদ্রায় বিভোর তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও পূর্ব জার্মানী ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পাঁচটি দেশের দু'লক্ষ সশস্ত্র বাহিনী সীমান্ত পেরিয়ে চেকোশ্লাভাকিয়ার ভূখন্ডে প্রবেশ করে। প্রায় ২৫০ টি রুশ T-54 ট্যাঙ্ক শ্লোভাক রাজধানী ব্রাতিশ্লাভার রাস্তায় টহল দিতে থাকে, রাশিয়ান মিগ জঙ্গীবিমানে প্রাগের আকাশ ছেয়ে যায়। সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ সংস্থা KGB এর প্যারামিলিটারী ইউনিটসমূহ রুজাইন বিমানবন্দরে অবতরণ করতে থাকে। বিমানবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, টেলিফোন ও বেতারকেন্দ্রসমূহ দখল করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। চেকোশ্লাভাক কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী আলেকজান্ডার ডুবচেক, প্রেসিডেন্ট লুডভিক সভোবোদা, জাতীয় পরিষদ প্রেসিডেন্ট জোসেফ সমরকোভস্কীকে বন্দী করে রাখা হয়। সুসজ্জিত রুশ বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার মত সামর্থ ছোট চেকোশ্লাভাকিয়ার ছিলো না- কিন্তু তার আজাদী পাগল জনতা রাশিয়ানদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে এবং ডুবচেকের সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ঐক্যবদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে।

ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দের সাথে বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে সভোবোদা ও ডুবচেককে অবশেষে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদপত্রের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও দেশকে গণতন্ত্রীকরণের পদক্ষেপ রহিত করার অঙ্গীকারে চেক নেতৃবৃন্দ ক্রেমলিন কর্তাদের সাথে সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন।

চেকোশ্লাভাকিয়ায় রাশিয়ার এই সশস্ত্র অভিযানের ফলে প্রায় ৫০ জন নাগরিক নিহত এবং ৩৩০ জনেরও অধিক আহত হয়েছে। সরকারী হিসাব মতে আগস্টের এই জবরদখলের ফলে কমপক্ষে ৫ হাজার চেক নাগরিক পশ্চিম দেশসমূহে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে। International

www.icsbook.info

Rescue Committee (IRC) এর রিপোর্টে এদের সংখ্যা ৩০ হাজার। এদের অধিকাংশই অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছে।

দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি বিবেকবান জাতিই রাশিয়ার এই বর্বরোচিত হামলার নিন্দা করেছে। এমনকি বিশ্বের ৮৮টি কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মাত্র ১০টি রাশিয়ার এই হামলাকে সমর্থন করেছে। ইতালি ও ফ্রান্সের গোঁড়া মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ও কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছে।

রাশিয়ার সাম্প্রতিক চেকোশ্লাভাকিয়া দখলের কারণ অনুসন্ধান করলে চেক ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হয়। পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহে নিয়ে রাশিয়া ওয়ারশ ঐক্যজোট গঠন করেছিল। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাশিয়া অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শুরু করে। চেকোশ্লাভাকিয়ায় ডুবচেকের নেতৃত্বে গত বছরের জানুয়ারী থেকে এক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। দেশের বুদ্ধিজীবি ও যুবসমাজের ব্যাপক সমর্থনের মাধ্যমে এ আন্দোলন চলতে থাকে। এতেই সোভিয়েত শক্তি প্রমাদ গণে।

১৯১৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়া প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। চেক ও শ্লাভাক ছাড়াও এখানে ত্রিশলক্ষ জার্মান বসবাস করতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে হিটলার চেকোশ্লাভাকিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের উসকানী দিতে থাকে এবং সুদেতেনল্যান্ডের উপর কর্তৃত্ব দাবী করে বসে। তদানীন্তণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নারভিল চেম্বারলেনের প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মিউনকে হিটলারের সাথে এক আপোষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পরবর্তী অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই হিটলার মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করে এবং সুদেতেনল্যান্ড দখল করে। চেকোশ্লাভাকিয়ায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বেন্সি দেশত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বেযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর বেন্সি আবার দেশে ফিরেন। এ সময় থেকেই চেকোশ্লাভাকিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে।

ক্রেমলিনের ইচ্ছামাফিক ক্লিমেন্ট গটওয়াল্ড প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট এক সামরিক অভ্যুথানে কম্যুনিস্টরা পূর্ণক্ষমতা দখল করলো। চেকোশ্লাভাক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা গ্যারিগ মাসারিকের পুত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন মাসারিক নিহত হলেন। স্ট্যালিনপন্থী গটওয়াল্ডের অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ট হয়ে ওঠে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া জুড়ে যখন স্ট্যালিন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তখন অ্যান্টনি নভোতনী গটওয়াল্ডের স্থান দখল করেন। কিন্তু সমগ্র পূর্ব ইউরোপে অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালের দিকে ক্রেমলিনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীর মুক্তিসংগ্রাম সমাজতন্ত্রী একনায়কত্ববাদের নাগপাশে আবদ্ধ জনগণের চোখ খুলে দিতে থাকে। পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। গত বছরের জানুয়ারীতে প্রবল গণবিক্ষোভ ও ছাত্র অসন্তোষের মোকাবিলায় নভোতনী ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ডুবচেক তার স্থান দখল করেন। আটমাস পর্যন্ত ডুবচেকের সংস্কার আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। ডুবচেকের উদার নীতি বিশেষ করে সংবাদপত্রের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, সভাসমিতির অনুমতি দান এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা রাশিয়াকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এর পরিণতি হিসেবেই রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী চেকভূমিতে প্রবেশ করে।

রাশিয়ার এই জবরদখল চেকোশ্লাভাকিয়ার জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। হামলাকারী রাশিয়ার সাথে কোন সমঝোতাকেই চেকরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এ জন্যই সমঝোতার চারমাস পরে রুশ হামলার প্রতিবাদে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশ বছর বয়স্ক ছাত্র জন প্যালাক নিজদেহে অগ্নি সংযোগ করে আত্মহত্যা করেন। জানুয়ারীর এই ঘটনা শেষ বারের মত আর একবার চেক জনগণকে সজাগ করে দেয়। নীরব অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তারা প্যালাকের শব-শোভাযাত্রার অনুগমন করে। চেকোশ্লাভাকদের অশ্রুসিক্ত চোখে আজ নীরব প্রতীক্ষা করে তারা রাশিয়ার তাবেদারী থেকে মুক্তি পাবে।

www.icsbook.info

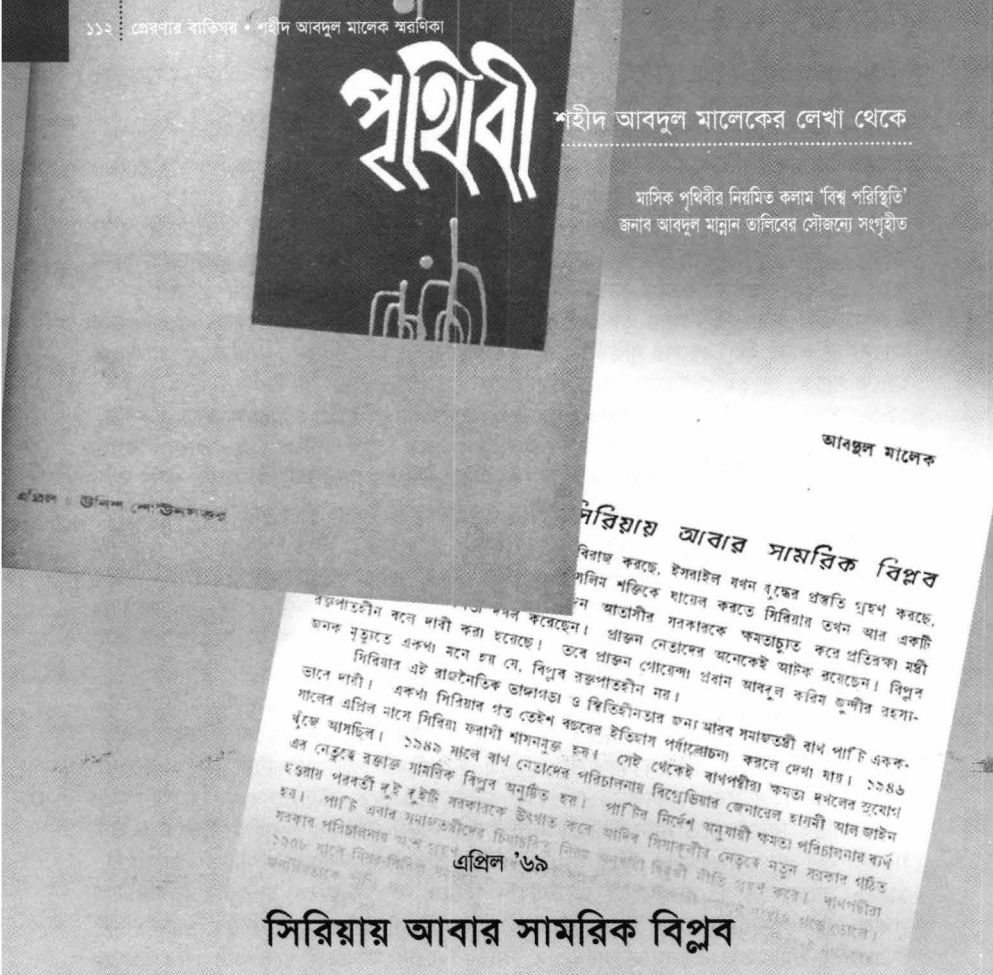

সিরিয়ায় আবার সামরিক বিপ্লব

মধ্যপ্রাচ্যে যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, ইসরাইল যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে , বৃহৎ শক্তিগুলো যখন চাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম শক্তিকে ঘায়েল করতে, সিরিয়ায় তখন আর একটি সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হলো। নুরুদ্দিন আতাসীর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হাফিজ আল আসাদ ক্ষমতা দখল করেছেন। প্রাক্তন নেতাদের অনেকেই আটক রয়েছেন। বিপ্লব রক্তপাতহীন বলে দাবী করা হয়েছে। তবে প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান আবদুল করিম জুন্দীর রহস্যজনক মৃত্যুতে একথা মনে হয় যে, বিপ্লব রক্তপাতহীন নয়।

সিরিয়ার এই রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া ও স্থিতিহীনতার জন্য আরব সমাজতন্ত্রী বাথ পার্টি একক-ভাবে দায়ী। একথা সিনিয়ার গত তেইশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সিরিয়া ফরাসী শাসনমুক্ত হয়। সেই থেকেই বামপন্থীরা ক্ষমতা দখলের সুযোগ খুঁজে আসছিল। ১৯৪৯ সালে বাথ নেতাদের পরিচালনায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসমী আল জাইন এর নেতৃত্বে রক্তাক্ত সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী দুই দুইটি সরকারকে উৎখাত করে আদিব সিসাক্লীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। পার্টি এবার সমাজতন্ত্রীদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে। বামপন্থীরা সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহন করে এবং একই সাথে সরকার বিরোধী

www.icsbook.info

গোপন সংস্থাও গড়ে তোলে। ১৯৫৮ সালে মিসর-সিরিয়া সমন্বয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠনের পর বাথপন্থীরা প্রেসিডেন্ট নাসেরের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে বাথপন্থীরা সিরিয়ায় পূর্ণ ক্ষমতা দখল করে। লে: জেনারেল আমিন আল হাফিজের নেতৃত্বে গঠিত সরকার সমস্ত বিরোধীদলের অবসান ঘটিয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করে। আমিন আল হাফিজ সরকারের নির্যাতনের প্রথম শিকার হয় ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মীরা। তিন বছর পর বাথ পার্টির চরমপন্থী গ্রুপ মেজর জেনারেল সালাহ্ আদিবের নেতৃত্বে আবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়। ড: নুরুদ্দিন আতাসী ও ইউসুফ জাইয়েনের নেতৃত্বে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। গত ১লা মার্চ নরম পন্থীরা জেনারেল হাফিজ আল আসাদের নেতৃত্বে আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। আসাদ বিদেশে অবস্থানরত বাথনেতাদের সাথে যোগাযোগ করে সরকার গঠনের চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ইরাকের বাথপন্থী জেনারেল বাকেরের সরকারের সাথে সৌহার্দ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সিরিয়ার নয়টি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রটিতি বিপ্লবের জন্য দায়ী সমাজবাদী বাথ পার্টির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের কোন্দল। পার্টির আন্তর্জাতিক কমান্ডের সাথে রুশপন্থী সিরীয় কম্যুনিস্টদের একটা ভাল রকমের যোগসাজশ রয়েছে। ১৯৫৯ সালে সিরিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এদের নেতৃবর্গ পূর্ব ইউরোপে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর সোভিয়েত নির্দেশে এরা বাথপার্টি এবং কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। গোঁড়া মস্কো সমর্থক আতাসী সরকারের শাসনামলে রুশপন্থী ঝানু কম্যুনিস্ট খালিদ বাগদাশ প্রাগ থেকে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং নেপথ্যে থেকে সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। বর্তমান বিপ্লবের ক'মাস আগে বাগদাশ চিকিৎসার জন্য মস্কো গমন করেন। এই সময়ে অনুষ্ঠিত সিরীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনগুলোতে দামেস্কে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নুরুদ্দিন মহিউদ্দিনও যোগদান করতেন বলে বৈরুতের 'আন-নাহার' পত্রিকা তথ্য প্রকাশ করেছে। সিরিয়া, ইরাক ও মিসরে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা সামনে রেখে সোভিয়েত রাশিয়া আরব বিশ্বের এই ভাঙ্গাগড়ায় ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইসরাইল আবার যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ আজ গোপনে হাত মিলিয়েছে তাদের সাধারণ শত্রু মসলিম শক্তির বিনাশ সাধনে।

চীন-রাশিয়া সীমান্ত সংঘর্ষ

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শক নিকোলাই বুখারিনের ধারণা ছিল কেন্দ্রাভিগ প্রবণতা (Centripetal tendencies) একদিন বিশ্বসমাজতন্ত্রকে ক্রেমলিনের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করবে। আজ সে ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার নেতৃত্ব বহুকেন্দ্রিকতা (Polycentrism) আজ সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের (Communist internationalism) স্বপ্নকে মিসমার করে দিয়েছে। কম্যুনিস্ট দুনিয়ার আদর্শিক দ্বন্দ্ব আজ প্রায় ক্ষেত্রেই সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। চীন-রাশিয়ার বর্তমান সীমান্ত সংঘর্ষকেও এই পটভূমিতেই বিশ্লেষণ করা যায়। তথাকথিত 'জনগণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লোভ এবং আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদী মনোভাব বিশ্ববাসীকে আর এক নয়া উপনিবেশবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। গত ২রা মার্চ 'উসুরী' নদীর সীমান্ত বরাবর চীন-রাশিয়ার মধ্যে সাম্প্রতিককালের প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষেই বহুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। এরপরও কয়েক দফা আক্রমণ পরিচালিত হয়। সোভিয়েত বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য সীমান্তরক্ষী ও সেনাবাহিনীকে তৎপর করা ছাড়াও চীন নারী ও শিশুদের এক বিরাট বাহিনীকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বরাবর সমাবেশ করছে বলে নয়াচীন বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ। রাশিয়াও তরুণ স্বেচ্ছাসৈনিক ও সীমান্তের রক্ষা বাহিনীকে আমুর ও উসুরী নদীর তীর বরাবর সন্নিবেশিত

www.icsbook.info

করেছে। এই সংঘর্ষকে চীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সোভিয়েত সংশোধনবাদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছে আর অন্যদিকে রাশিয়া একে পিকিং-বন-ওয়াশিংটন গোপন আঁতাত বলে চিত্রিত করেছে।

চীন-রাশিয়ার বিরোধ নতুন নয়। দশ বছর পূর্বে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে যে আদর্শিক বিরোধের সূচনা হয় আজ তাই সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই দশ বছর একে অন্যকে 'সংশোধনবাদী', 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের এজেন্ট' বলে আখ্যায়িত করেছে। এই কিছুদিন আগেও রুশ পত্রিকা 'কম্যুনিস্ট' এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে মাও-এর সমালোচনা করে বলা হয়েছে, 'অন্ধ আনুগত্য ও সেনানিবাসের শৃঙ্খলা দিয়ে মানবসত্তাকে মেশিনের ক্ষুদ্র স্ক্রু'তে পরিণত করা হয়েছে।' বাহ্যত এই বিরোধ মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের ব্যাখ্যার বিতর্ক মনে হলেও, আসলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বের লোভ ও আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদী মনোভাবই বর্তমান সংঘর্ষের মূলীভূত কারণ। ক্রেমলিন নেতারা মনে করেন যে, যেহেতু সমজাবাদের প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র রাশিয়া এবং শক্তি ও প্রতিপত্তিতে রাশিয়া কম্যুনিস্ট দুনিয়ার সেরা তাই গোটা সমাজতন্ত্রী বিশ্বের নেতৃত্ব কেবল তারাই দিতে পারেন। নতুন প্রণীত ব্রেজনেভ নীতির (Brezhnev Principle) মধ্যে তারা একথাই ঘোষনা করেছেন। অন্যদিকে পিকিং নেতারা মনে করেন যে, যেহেতু চীন কম্যুনিস্ট বিশ্বের বৃহৎ ও জনবহুল দেশ এবং মার্কসবাদ লেলিনবাদের সর্বশেষ সংস্ককরণ মাওসেতুং দিতে পেরেছেন তাই নেতৃত্ব তাদেরই।

বর্তমান সংঘর্ষের মূল কারণ হিসেবে সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের প্রশ্নটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫-৪৯ সালের গৃহযুদ্ধের অবসানের পর থেকেই চীনে প্রচন্ড খাদ্য সংকট দেখা দেয়। মাও-এর সমস্ত কৃষি পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। স্ট্যালিনের অনুকরণে গৃহীত যৌথ কৃষি (Agricultural Collectivization) নীতিও খাদ্য সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হয়। আজ তাই৭৫ কোটি মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য চীনকে নতুন কৃষিযোগ্য ভূমি দখল করতে হবে। এ ব্যাপারে চীনের নজর উত্তর সীমান্তের গম প্রধান সাইবেরিয়া এবং দক্ষিণের চাউল উৎপাদনকারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে। এজন্যই উত্তর দিকে চীন আমুর ও উসুরী নদী বরাবর চীন-সোভিয়েত সীমান্ত রেখা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। বস্তুত ১৯৬৩ সাল থেকে চীন-সোভিয়েত সীমান্তবিরোধ প্রবলাকার ধারণ করে এবং সীমান্ত এলাকায় কয়েক দফা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। রাশিয়ার ক্রুশ্চভের শাসনামলে চীনের এই উত্তরমুখী সম্প্রসারণবাদ বড় বেশী একটা সুবিধে করতে পারেনি। কিউবা সংকটের পর ক্রুশ্চড চীনের সম্প্রসারণবাদ দমনের দিকে মনোযোগ দেন এবং চীনকে বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেন।

অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান, প্রচুর খাদ্যশস্য এবং বাণিজ্য-সম্পদের জন্য চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন যাবত বৃটিশ, ডাচ, পর্তুগীজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এই এলাকা শোষণ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘাঁটি স্থাপন করেছে। আর আজ সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ থাবা উঁচু করেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের পক্ষে চীন একটি বিরাট বাঁধা। আজ সোভিয়েত রাশিয়া সুয়েজখালকে আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের উপযোগী করার জন্য ইসরাইলের সাথে কতিপয় অপমানজনক শর্তে আপোশ করার জন্য মিসরকে চাপ দিচ্ছে। কারণ ভূমধ্যসাগরে অবস্থানরত সোভিয়েত নৌবহর সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে নৌপথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছাতে চায়। অন্যদিকে এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকে কাবু করাও রাশিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ক্ষমতার লিপ্সা এবং আঞ্চলিক সম্প্রসারণের স্পৃহাই বর্তমান চীন-রাশিয়া সীমান্ত সংঘর্ষের মূল কারণ। রাশিয়ার চেকোশ্লাভাকিয়া দখলের পরিপ্রেক্ষিতে পিকিংপন্থী একটি হংকং দৈনিকে মন্তব্য করেছিল Dog bites dog, -আজ সেকথার পুনরুল্লেখ করা যায় মাত্র।

www.icsbook.info

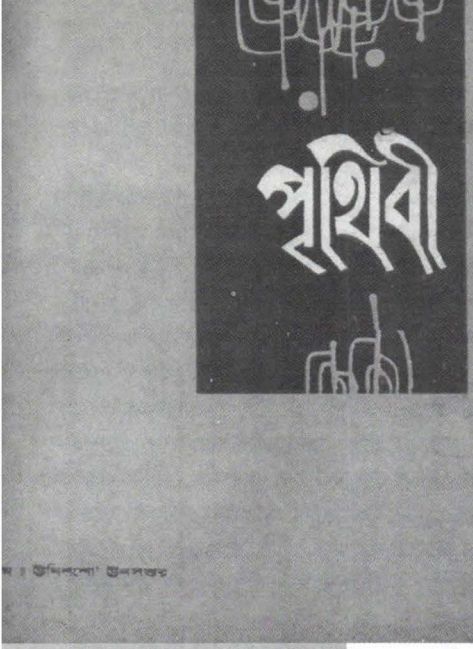

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

মাসিক পৃথিবীর নিয়মিত কলাম 'বিশ্ব পরিস্থিতি'
জনাব আবদুল মান্নান তালিবের সৌজন্যে সংগৃহীত

স্থিতি

আবদুল মালেক

নাইজিরিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিণাম

দী 'বায়াফ্রার' শেষ প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার পথে। প্রধান শহরের সবগুলোই
ডারেল বাহিনীর হাতে। ছোট্টশহর উমুয়াহিয়াকে কেন্দ্র করে 'বায়াফ্রার'
চ্ছে। ফেডারেল বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী 'বায়াফ্রাকে' বাইরের দুনিয়া থেকে
। উমুয়াহিয়ার পার্শ্ববর্তী উলি বিমান বন্দরই এখন 'বায়াফ্রার একমাত্র
বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত সাহায্য দ্রব্যাদি বহনকারী বিমান
ণ করে থাকে।

রিয়ার সামরিক অধিনায়ক লে: কর্ণেল ওডুমেগু ওজুকু পূর্ব নাইজিরিয়ার
রেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী ইবোদের পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডের নাম দেয়া
কর্ণেল ওজুকু স্বাধীন বায়াফ্রার একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিলেন।
নীর প্রচণ্ড আক্রমনে ওজুকুর সে স্বপ্নপ্রাসাদ ধূলায় ধ্বসে পড়ছে।

সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত নাইজিরিয়াকে আফ্রিকার বুকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম নজীর বলা হতো। কিন্তু কর্ণেল ওজুকুর হঠকারিতা এবং উচ্চশিক্ষিত সংখ্যালঘু ইবো খৃষ্টানদের আত্মম্ভরিতা ও অধিক সুবিধা লাভের স্পৃহাই আজ নাইজিরিয়ার বুকে গৃহযুদ্ধের অভিশাপ বহন করে এনেছে। তেইশ মাসের এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে আফ্রিকার সবচাইতে সম্ভাবনাময় এই দেশটি আজ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। ফেডারেল নাইজিরিয়া প্রধান জেনারেল গভনের পক্ষ থেকে শান্তি স্থাপনের জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু হঠকারী ওজুকু সরকার কিছু শুনতেই রাজী হয়নি। ওজুকুর এই হঠকারিতার দরুণ যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। 'বায়াফ্রানরা' আজ চতুর্দিক থেকে ফেডারেল বাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে পড়েছে। খাদ্যাভাবে 'বায়াফ্রার' ইবোরা হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করছে। ওজুকুর সরকার খাদ্যসংকট দূর করতে মোটেই সক্ষম হচ্ছেনা। ফেডারেল নাইজিরিয়ায়ও খাদ্যাভাব ও পুষ্টি-হীনতা প্রচণ্ড আকারে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পিছু হটবার সময় 'বায়াফ্রান ইবোরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, যোগাযোগ মাধ্যম ধ্বংস করে ফেলছে, পানির ট্যাংকে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিকদের পাইকারী হত্যা করছে।

আফ্রিকার সবচাইতে জনবহুল দেশ নাইজিরিয়া। সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসীর শতকরা বাহাত্তর জনই মুসলমান। ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে নাইজিরিয়া উত্তর, পশ্চিম, মধ্য পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্ত। উত্তর নাইজিরিয়ার শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। ... সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে নাইজিরিয়ায় দু'শ পঞ্চাশটি উপজাতির ... হাউসা, ফুলানী, ইরুবা ও ইবো উপজাতিই প্রধান। ... উত্তরাঞ্চলে ... এরা ... ই মুসলমান। ইরুবাদের বাস পশ্চিম ...

মে,'৬৯

নাইজেরিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিণাম

বিচ্ছিন্নতাবাদী 'বায়াফ্রার' শেষ প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার পথে। প্রধান শহরের সবগুলোই এখন নাইজিরীয় ফেডারেল বাহিনীর হাতে। ছোট্টশহর উমুয়াহিয়াকে কেন্দ্র করে 'বায়াফ্রার' ইবোরা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ফেডারেল বাহিনী বিচ্ছন্নতাবাদী 'বায়াফ্রার'কে বাইরের দুনিয়া থেকে পৃথক করে ফেলেছে। উমুয়াহিয়ার পার্শ্ববর্তী উলি বিমান বন্দরই এখন 'বায়াফ্রার' একমাত্র যোগাযোগ কেন্দ্র। বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত সাহায্য দ্রব্যাদি বহনকারী বিমান সমূহ এখানেই অবতরণ করে থাকে।

পূর্ব নাইজিরিয়ার সামরিক অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল ওডুমেগু ওজুকু পূর্ব নাইজিরিয়ার স্বাধীনতা

www.icsbook.info

ঘোষণা করেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী ইবোদের পক্ষ থেকে এ ভূখন্ডের নাম দেয়া হয়েছিল বায়াফ্রা। কর্ণেল ওজুকু স্বাধীন বায়াফ্রার একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিলেন। আজ নাইজিরিয় বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে ওজুকুর সে স্বপ্নপ্রাসাদ ধূলায় ধ্বসে পড়েছে।

সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত নাইজিরিয়াকে আফ্রিকার বুকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম নজীর বলা হতো। কিন্তু কর্ণেল ওজুকুর হঠকারিতা এবং উচ্চশিক্ষিত সংখ্যালঘু ইবো খৃষ্টানদের আত্মম্ভরিতা ও অধিক সুবিধা লাভের স্পৃহাই আজ নাইজিরিয়ার বুকে গৃহযুদ্ধের অভিশাপ বহন করে এনেছে। তেইশ মাসের এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে আফ্রিকার সবচাইতে সম্ভাবনাময় এই দেশটি আজ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। ফেডারেল নাইজিরিয়া প্রধান জেনারেল গত্তনের পক্ষ থেকে শান্তি স্থাপনের জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু হঠকারী ওজুকু সরকার কিছু শুনতেই রাজী হয়নি। ওজুকুর এই হঠকারীতার দরুণ যুদ্ধ প্রচন্ড রূপ ধারণ করেছে। 'বায়াফ্রানরা' আজ চর্তুদিক থেকে ফেডারেল বাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে পড়েছে। খাদ্যাভাবে 'বায়াফ্রার' ইবোরা হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করছে। ওজুকুর সরকার খাদ্যসংকট দূর করতে মোটেই সক্ষম হচ্ছেনা। ফেডারেল নাইজিরিয়ায়ও খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা প্রচন্ড আকারে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পিছু হটবার সময় 'বায়াফ্রান' ইবোরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, যোগাযোগ মাধ্যম ধ্বংস করে ফেলছে, পানির ট্যাংকে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিকদের পাইকারী হত্যা করছে।

আফ্রিকার সবচাইতে জনবহুল দেশ নাইজিরিয়া। সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসীর শতকরা বাহাত্তর জনই মুসলমান। ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে নাইজিরিয়া উত্তর, পশ্চিম, মধ্য পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্ত। উত্তর নাইজিরিয়ার শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে নাইজিরিয়ায় দু'শ পঞ্চাশটি উপজাতির বাস। এর মধ্যে হাউসা, ফুলানী, ইরুবা ও ইবো উপজাতিই প্রধান। হাউসা ও ফুলানী গোত্রের বাস উত্তরাঞ্চলে- এরা সবাই মুসলমান। ইরুবাদের বাস পশ্চিম এলাকায়। ইবোরা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। এদের অধিকাংশই পূর্ব নাইজিরিয়ায় বসবাস করে। উত্তর অঞ্চলেও কিছু খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী রয়েছে। ফেডারেল প্রধান কর্ণেল গত্তন এদেরই একজন।

পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদ অনুপ্রবেশের পূর্বে দু'টি স্বাধীন নাইজিরিয়ার অস্তিত্ব ছিল। উত্তরের মুসলিম নাইজিরিয়া আর দক্ষিণের পৌত্তলিক নাইজিরিয়া। ১৮০৭ সালে বৃটিশ দাসব্যবসায়ীরা নাইজিরিয়ার দক্ষিণ উপকূলে আগমণ করে। ক্রমে ক্রমে তারা নাইজিরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ সন্ধান করতে থাকে। ১৮৬১ সালের দিকে লাগোসে তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এ সময়ে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা দক্ষিণের ইবো এবং ইরুবাদের প্রভাবান্বিত করে দক্ষিণ নাইজিরিয়া আশ্রিত রাজ্যের পত্তন করে। অনুরূপভাবে তারা উত্তরের হাউসা ও ফুলানী মুসলিম গোত্রদ্বয়কে জোর করে উত্তর নাইজিরিয়া আশ্রিত রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শাসকরা উভয় আশ্রিত রাজ্যের সমন্বয়ে 'নাইজিরিয়া প্রটেক্টরেটের' গোড়া পত্তন করে।

বৃটিশ শাসনের গোড়াতেই ইবোরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে খৃষ্টান মিশনারীরা ইবোদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে তোলে। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রীয় সকলপদ ইবোরাই দখল করতে শুরু করে দিলো। বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্র থেকেই মুসলমানরা বিতাড়িত হলো। সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও ইবো অফিসাররাই দখল করে বসলো। ইবো খৃষ্টানদের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলমানরা সেদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সমান প্রতিনিধিত্ব দাবী করে বসলো। ১৯৫১ সালের শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন স্বীকার করে নেয়া হলো। এর পর থেকেই উত্তরাঞ্চলের

www.icsbook.info

মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যেতে শুরু করলো। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেও তারা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলো। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রখ্যাত মুসলিম নেতা আলহাজ্ব আহমাদু বেল্লোর নদার্ণ পিপলস্ কংগ্রেস (NPC) উত্তরাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে ডঃ নামদী আজিকার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো। উভয় দলের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলো। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলো না। ফলে আবার কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো। স্যার আবু বকর তাফাওয়া বালেওয়া ফেডারেল প্রধানমন্ত্রী এবং ডঃ আজিকা প্রেসিডেন্ট মনোনীত হলেন।

১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা লাভের পর নাইজিরিয়ায় ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েম হলো। স্যার আবু বকর ফেডারেল প্রধানমন্ত্রী এবং ডাঃ নামদী আজিকা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফেডারেল পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইবোদের একচেটিয়া আধিপত্য হ্রাস পেতে শুরু করলো। নাইজিরিয়া উত্তরের মুসলমানদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে বলে ইবোরা তখন গুজব ছড়াতে শুরু করলো। দুনিয়ার খৃস্টান চার্চ ও প্রেস তাদের এই মিথ্যা প্রচারণায় সাহায্য করলো। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী মেজর জেনারেল ইরনসীর নেতৃত্বে ইবো অফিসাররা সামরিক অভ্যুত্থান করে স্যার আবু বকর তাফাওয়ার সরকারকে উৎখাত করে ফেললো। ইবো সামরিক জান্তার হাতে স্যার আবু বকর, উত্তরাঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী স্যার আহমাদু বেল্লো এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান স্যামুয়েল আকিনতোলা নির্মমভাবে নিহত হলেন। নাইজিরিয়ার জনসাধারণ জেনারেল ইরনসীর শাসন করতে রাজী হলো না। উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হয়ে উঠলো। অতঃপর ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল ইয়াকুবু গওন সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে ইরনসীর সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করলেন।

কর্ণেল গওন ক্ষমতা দখল করেই সকল রাজবন্দীর মুক্তি দিলেন। শাসনতন্ত্র সংশোধন করার জন্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্য বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ কর্ণেল ওজুকু জেনারেল গওনের কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজী হলো না। ওজুকুর মিথ্যা প্রচারণা ও উসকানীতে নাইজিরিয়ায় দাঙ্গা শুরু হলো। এতে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের কমপক্ষে এক হাজার অধিবাসী নিহত হলো। ইবোদের কেন্দ্র ভূমি পূর্বাঞ্চল থেকে সকল মুসলমানকে তাড়িয়ে দেয়া হলো। এতেই শেষ নয়, নাইজিরিয়ায় সকল অঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো, উত্তরাঞ্চলে কয়লা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হলো। কর্ণেল ওজুকু সর্বশেষে নব্বুই লক্ষ ইবো অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। বিচ্ছিন্নতাবাদী এই এলাকার নাম দেয়া হলো- বায়াফ্রা। বৃহৎ শক্তিবর্গ নাইজিরিয়ার এই ঘটনাবলীর নীরব দর্শক হয়ে তামাসা দেখছিল। ফ্রান্স তো বায়াফ্রাকে স্বীকারই করে নিল এবং ওজুকুকে অস্ত্র সাহায্য দেয়া শুরু করলো। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ফেডারেল সরকারকে সমর্থন করলেও পার্লামেন্ট হ্যারল্ড উইলসনকে যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বৃটিশ পত্র-পত্রিকা 'বায়াফ্রা' এর পক্ষে বৃটিশ জনমত সৃষ্টির জন্য মিথ্যা প্রচারণায় মেতে উঠেছে। নাইজিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসান করে শান্তি আলোচনার জন্য উইলসন গত কিছু দিন আগে লাগোস গমন করেছিলেন। কর্ণেল গওন শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী ও আগ্রহী হলেও কর্ণেল ওজুকু এতে রাজী হয়নি। অন্যদিকে সংযুক্ত চার্চ এইডের (Joint Church Aid) মাধ্যমে কর্ণেল ওজুকু অস্ত্র কেনবার জন্য নানা উপায়ে পয়সা পাচ্ছে। আমেরিকার 'নিউজ উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এর পরিমাণ মাসিক তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার ডলার। এই

www.icsbook.info

অর্থের অধিকাংশই ইউরোপের খোলা বাজারে অস্ত্র কেনায় ব্যয়িত হচ্ছে বলে উক্ত পত্রিকা স্বীকার করেছে।

আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ নিয়ন্ত্রিত আমেরিকা ও ইউরোপের পত্র-পত্রিকা বিচ্ছিন্নতাবাদী ইবোদের করুণ চিত্র প্রকাশ করে 'বায়াফ্রার' সমর্থনে জনমত সৃষ্টির পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু বেল্লো, তাফাওয়া আর আকিনতোলা যখন সম্পূর্ণ অন্যায় ও নৃশংসভাবে নিহত হলেন তখন এই পত্রিকা সমূহ এই জঘন্য হত্যাকান্ডের নিন্দা করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যান্ডর উইলসন যিনি এই হত্যাকান্ডের কয়েক দিন পূর্বে তাফাওয়ার মেহমান ছিলেন তিনিও এই ঘটনার নিন্দা করার সৌজন্যতাবোধ করেননি।

নাইজিরিয়ায় মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষিত হলে, বেল্লো ও তাফাওয়ার সরকার দীর্ঘজীবি হলে কেবল নাইজিরিয়া নয় গোটা আফ্রিকার বুক থেকেই ইহুদী ও খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের হাত গুটাতে হতো। এজন্যই ঘানার প্রাক্তন নক্রুমা চক্র, ইথিওপিয়ার সেলাসী চক্র, বিশ্ব ইহুদীবাদ এবং সংযুক্ত চার্চ এতখানি তৎপর হয়ে উঠেছিল।

আলহাজ স্যার আবু বকর তাফাওয়া, বেল্লো আর নাই, নাইজিরিয়ায় আজ আগুন জ্বলছে আর রক্ত ঝরছে। আফ্রিকার হৃদয়ে কবে আবার তাফাওয়া আর বেল্লোর উত্তরসূরীরা জন্ম নেবে নির্যাতিত মুসলমানরা সে প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

ভিয়েতনাম : পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী চক্রের নির্মম শোষণ ক্ষেত্র

গত কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন বলেছিলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এমন কতকগুলো নীতির ভিত্তিতে হতে হবে যা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ তরান্বিত করবে। নিকসনের উপরোক্ত বক্তব্য সত্যি আন্তরিক, না এশিয়ায় নতুন মার্কিন ঘাটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তা বলা শক্ত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে খুব তাড়াতাড়িই ভিয়েতনাম থেকে পাততাড়ি গুটাতে হচ্ছে এতে কারো দ্বিমত নেই। ভিয়েতনামে আমেরিকানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মার্কিন জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। যার ফলে সাবেক প্রেসিডেন্ট জনসন পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন, উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করেন এবং প্যারিসে শান্তি সম্মেলণ আহ্বান করেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এ পর্যন্ত চৌত্রিশ হাজারেরও অধিক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে নিহতের সংখ্যা তিন শতের কাছাকাছি। যুদ্ধের ব্যয়ভার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতি বছর তিন হাজার কোটি ডলার খরচ করতে হচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ গোটা দুনিয়ায় আমেরিকার মর্যাদা অনেকখানি হ্রাস করেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের ক্ষয়ক্ষতি এর চাইতেও বেশী। কম্যুনিস্ট গেরিলা বাহিনীর আক্রমণে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনজীবন অতিষ্ট। অন্য দিকে গত চার বছরের ক্রমাগত মার্কিন বোমা বর্ষণের ফলে উত্তর ভিয়েতনামের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল।

অজন্মা আর আমলাতন্ত্রের ফলে পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি উত্তর ভিয়েতনামের নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে হ্যানয়ের পত্র পত্রিকা প্রায়ই খবর প্রকাশ করে থাকে। উত্তর ভিয়েতনামী জনগণের যে বিপ্লবী প্রেরণা সম্বল করে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিলো তাও অনেক কমে আসছে। যুদ্ধে বিজয় লাভের অনিশ্চয়তা হ্যানয়ের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যেও যথেষ্ট মতদ্বৈত্যতার সৃষ্টি করেছে। নব্যপন্থী কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবিরা যুদ্ধ সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে তারা উত্তর ভিয়েতনাম গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন বলে তাদের ধারণা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া আমেরিকার সাথে সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনামের এ ব্যয়বহুল অনিশ্চিত যুদ্ধকে আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখা রাশিয়ার পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। আলোচ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হ্যানয়, মুক্তিফ্রন্ট, সায়গন ও

www.icsbook.info

আমেরিকার মধ্যে প্যারিসে চতুঃশক্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ শক্তিগুলো কর্তৃক প্রভাবান্বিত ও তাবেদার এলাকা গঠনের পরিণতি হিসেবেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের সূচনা হয়। ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৪৫ সালে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি চুয়ান্ন সালের জেনেভা চুক্তির পরবর্তী কয়েকদিন মাত্র ভিয়েতনামীরা স্বাধীনতা সুখ ভোগ করতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোলুপ জিহ্বা তাদের সে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। ভিয়েতনামী জনগণের এ দুর্ভাগ্যের কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সই প্রথম ভিয়েতনামে উপনিবেশ স্থাপন করে। যুদ্ধে জার্মানীর কাছে উপর্যুপরি মার খেয়ে বিশ্বশক্তি হিসেবে ফ্রান্সের মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়েছিল। হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আশায় প্রেসিডেন্ট দ্যাগল ভিয়েতনামের মাটিতে নিজের ভাগ্য খুঁজতে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইন্দোচীনে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ছিল পুনরায় তার বিশ্বশক্তির মর্যাদা লাভের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধে ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদীদের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে ফরাসীরা ইন্দোচীন ছাড়তে বাধ্য হয়। ইন্দোচীনে এর অনেক আগে থেকেই কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কারা ক্ষমতা দখল করবে এ নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলে আসছিল। এদের পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছিল যথাক্রমে রাশিয়া, চীন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাপক সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা এড়ানোর জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভাগ্যান্বেষণকারী এই শক্তিত্রয়ের ইচ্ছা মাফিক ইন্দোচীনকে স্বাধীন কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামে বিভক্ত করা হলো। কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধরোধ করার জন্য ভিয়েতনামকে আবার ১৭শ অক্ষাংশ বরাবর দু'ভাগে ভাগ করা হলো। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠিত দিয়েম সরকার আমেরিকাও তল্পীবাহক সাজলো আর হ্যানয়ের কম্যুনিস্ট সরকার রাশিয়া ও চীনের তাবেদারে পরিণত হলো। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের পরোক্ষ সহযোগীতায় ভিয়েতকং গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠলো। উত্তর ভিয়েতনাম সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভিয়েতকং গেরিলাদের গোপন অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করতে শুরু করলো। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গেরিলা তৎপরতা এবং উত্তর ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালে সায়গনে সৈন্য পাঠাতে শুরু করলো এবং ঐ বছরের জুলাই থেকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে দিলো। মূলতঃ স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভিয়েতনামে গৃহযুদ্ধ চলে আসছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে এ যুদ্ধ আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য গত বছর মে মাস থেকে প্যারিসে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বোমাবর্ষণ বন্ধ হয়েছে সত্য কিন্তু এখনও ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। এজন্য দায়ী আমেরিকানদের গড়িমসি ও আন্তরিকতার অভাব, আর অন্যদিকে কম্যুনিস্টদের একইসাথে যুদ্ধ ও আলোচনা নীতি। গত কয়েক মাস যাবৎ শান্তি আলোচনায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য নিকসন সরকার আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। নিকসন ইতিমধ্যেই হ্যানয়ের সাথে গোপন বৈঠকের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের হঠকারী প্রেসিডেন্ট নগুয়েন ভ্যান থিউও মুক্তিফ্রন্টের সাথে গোপন আলোচনায় রাজী আছেন বলে ঘোষনা করেছেণ। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ত সম্ভব হতে পারে কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার মুখে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা সুদূর পরাহত।

www.icsbook.info

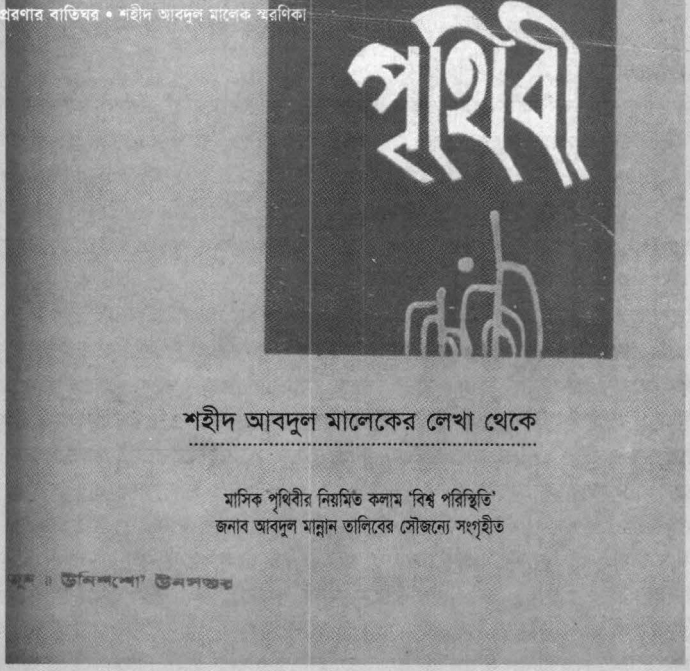

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

মাসিক পৃথিবীর নিয়মিত কলাম 'বিশ্ব পরিস্থিতি'
জনাব আবদুল মান্নান তালিবের সৌজন্যে সংগৃহীত

জুন'৬৯

মধ্যপ্রাচ্য : বৃহৎ চতুঃশক্তি বৈঠক

চতুঃশক্তি বৈঠক বসেছে নিউইয়র্কে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্যই আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচনার ধারাক্রম ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা যায় আজ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার সবটুকুই আরব স্বার্থের পরিপন্থী। ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে প্রকাশ, আলোচনার অন্যতম সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইসরাইলকে একটি 'সংশোধিত সীমারেখা' (Modified frontier) পর্যন্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কর্তৃক প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছিল। ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রস্তাব ছিল ১৯৬৭ সালের ২২ শে নভেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসরাইলকে সকল অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিতে হবে এবং যুদ্ধপূর্ব

বিশ্ব পরিস্থিতি

আবদুল মালেক

মধ্যপ্রাচ্যঃ বৃহৎ চতুঃশক্তি বৈঠক

চতুঃশক্তি বৈঠক বসেছে নিউইয়র্কে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্যই আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচনার ধারাক্রম ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা যায় আজ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার সবটুকুই আরব স্বার্থের পরিপন্থী। ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে প্রকাশ, আলোচনার অন্যতম সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইসরাইলকে একটি "সংশোধিত সীমারেখা" (Modified

www.icsbook.info

সীমারেখায় ফিরে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স এবং সোভিয়েত রাশিয়া উভয়ই ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবের মুকাবিলায় নিজেদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছে বলে পাশ্চাত্যের পত্রিকাসমূহে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। খবরে আরো জানা গেছে, এ নতুন সীমারেখা নির্ধারিত হবে ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে। অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য সুত্রের বরাত দিয়ে প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ডট্রিবিউন' তথ্য প্রকাশ করেছে, ইসরাইল যে পরিমাণ অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেবে তাকে অসামরিক অঞ্চলে পরিণত করার ইসরাইলী প্রস্তাবকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছে। আসল কথা, শান্তি আলোচনার নামে ইসরাইলের মুরুব্বী বৃহৎশক্তিবর্গ যে আর একটি ষড়যন্ত্রমূলক ফর্মুলা উদ্ভাবন করার প্রয়াস পাচ্ছে তা এদের কার্যকলাপে ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

গত ২৫শে এপ্রিল স্বাধীন জাতি হিসেবে ইসলাইলের ২১তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে মার্কিন কংগ্রেসের ২০৬ জন সদস্য মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষনাপত্র প্রকাশ করেছে। এতে ইসরাইলের সাথে সরাসরি শান্তি আলোচনার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রতি একতরফা আহ্বান জানানো হয়েছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের এক খবরে প্রকাশ, বাদশাহ হোসেনের সাম্প্রতিক বৃটেন সফরকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ও পররাষ্ট্র সেক্রেটারী মাইকেল স্টুয়ার্ট জর্দানী এলাকায় সকল ইসরাইল বিরোধী গেরিলা তৎপরতা বন্ধ করে দেয়ার জন্য বাদশাহর উপর চাপ দিয়েছেন। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা মনে না করে উপায় নাই যে, ১৯১৯ সালে এই বৃহৎশক্তিবর্গ মিত্র শক্তিরূপে পরাজিত জার্মানীর উপর যেভাবে ভার্সাই চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিল আজ সেই একই পদ্ধতিতে তারা আরব রাষ্ট্রগুলোর উপরও অপমানজনক সমঝোতা চুক্তি চাপিয়ে দেয়ারই ফন্দি ফিকির খুঁজছে।

ইসরাইলের মুরুব্বীরা যখন শান্তি আলোচনায় বসেছে তখন থেকেই ইসরাইলের আক্রমণাত্মক ও উসকানীমূলক কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। ইসরাইল মিসর ও জর্দানের গভীর অভ্যন্তরে বিমান হামলাও পরিচালনা করেছে। মিসরের নাগাহামাদী এলাকায় ইসরাইলের সাম্প্রতিক বোমাবর্ষণ, সুয়েজ খাল ও জর্দান নদী বরাবর প্রাত্যহিক গোলা বিনিময়, মুহূর্তের মধ্যে কায়রো, আম্মানও দামেশক দখল করে নেয়ার ইসরাইলী হুমকি মধ্যপ্রাচ্যে আবার যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করেছে। ইসরাইলের মুরুব্বীরা ইসরাইলের এ ব্যাপক যুদ্ধতৎপরতার নিন্দা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কতিপয় আরব নেতার ইসরাইলের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব গোটা অবস্থাকেই আরব স্বার্থ বিরোধী করে তুলতে যাচ্ছে। বাদশাহ হোসেন ও প্রেসিডেন্ট নাসেরের সাম্প্রতিক বক্তৃতা-বিবৃতি ও কার্যকলাপ ইসরাইলকে অনেকখানি সাহসী করে তুলেছে। নিজেদের দোষেই আরব নেতারা আজ কূটনৈতিক পরাজয়ের সম্মুখীন। প্রেসিডেন্ট নাসের ১৯৫৬ সালে গাজা ও শার্মাল শেখ এলাকায় জাতিসংঘ বাহিনীর অবস্থান স্বীকার করে নিয়ে ফিলিস্তিন মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আকাবা উপসাগরের নৌ-চালনার সুযোগ পেয়ে ইসরাইল ইলাত বন্দর গড়ে তোলার মওকা পেয়েছিল। আজ প্রেসিডেন্ট নাসের আবার তার অতীত বোকামীর পুনরাভিনয় করতে যাচ্ছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিউজ উইক পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট নাসের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনার মূলনীতি হিসেবে ৫ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এতে তিনি ইসরাইলের সাথে সরাসরি আলোচনায় রাজী আছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আরো মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইসরাঁইল যদি সিনাই এলাকা চেড়ে দেয় তা'হলে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনেও তিনি রাজী আছেন। ফিলিস্তিনী মজলুম মুসলমানের জন্য তার কেবল একটি দাবীই ছিল আর তা'হলো ফিলিস্তিনী মুহাজির সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান। গত এপ্রিলের ১০ তারিখে বাদশাহ হোসেন ওয়াশিংটনের জাতীয় প্রেস ক্লাবে মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান, আকাব ও সুয়েজে ইসরাইলী নৌ-চলাচলের অধিকারের স্বীকৃতি সহ যে ৬ দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছেন তাও মূলতঃ প্রেসিডেন্ট নাসেরের ৫ দফারই ব্লু প্রিন্ট। প্রেসিডেন্ট নাসের হোসেনের ৬ দফা প্রস্তাবকে খোলাখুলি সমর্থনও করেছেন।

www.icsbook.info

আরব জনগণ হোসেন-নাসেরের এ প্রস্তাব সমর্থন করেনি। ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থার ৫টি দল সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। মন্তব্য প্রসঙ্গে আল-ফাতাহ ঘোষণা করেছে, 'মিসর ও জর্দান ফিলিস্তিনের মুহাজিরদেরকেই সমঝোতার মূল্য দিতে বাধ্য করতে চাচ্ছে।' একমাত্র লেবানন ছাড়া কোন আরব রাষ্ট্রই এ প্রস্তাব সমর্থন করেনি। ইরাক ও আলজিরিয়া এ প্রস্তাবকে সাম্রাজ্যবাদীদের আর একটি ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছে। সৌদি আরব ও কুয়েত এই পরাজিত মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জুন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ মিসর ও জর্দানের প্রধান সাহায্যকারী হচ্ছে সৌদি আরব ও কুয়েত।

গত জুন যুদ্ধের পর খার্তুমে অনুষ্ঠিত আরব রাষ্ট্র সম্মেলনে স্থির হয়েছিল : ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না, আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ-খালে ইসরাইলকে নৌ-চালনার অধিকার দেয়া হবে না, ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তির মাধ্যমে আরবভূমি থেকে ইসরাইলকে উৎখাত করে ফেলা হবে। কিন্তু গত দু'বছরে এ সিদ্ধান্তের কোনটিই কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়নি। এমনকি একটি আরব শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হয়নি। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী টালবাহানা ছিল প্রেসিডেন্ট নাসেরের। কারণ তার মুরুব্বী সোভিয়েত রাশিয়ার এজাজত মিলেনি। আর একথাতো সবাই জানে যে, সোভিয়েত রাশিয়া ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ইসরাইল বিরোধী কোন পদক্ষেপ রাশিয়া নীতিগতভাবে সহ্য করতে পারে না। ফিলিস্তিনী গেরিলারা মরণপণ লড়ছে। আল-ফাতাহ্ গেরিলাদের এই মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ করার ফর্মুলা আবিষ্কার করার জন্যই মূলতঃ চতুঃশক্তি বৈঠক। অন্ততঃ এ পর্যন্ত তাদের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা তো তাই সাক্ষ্য দেয়। কারণ এরাই সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইসরাইলী কমান্ডো বাহিনী যখন আরব মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা ও বিতাড়িত করছিল তখন শান্তির এই অগ্রদূতদের কণ্ঠ নীরব ছিল। এদেরই সহায়তায় ১৯৫৬ সালে ইসরাইল আরব রাষ্ট্রসমূহকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেছিল। এদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর জাতিসংঘ প্রস্তাবের মাধ্যমে ইসরাইলকে ফিলিস্তিন বিভক্তি করণ পরিকল্পনার চাইতে আরো এক-তৃতীয়াংশ ভূখন্ড বেশী প্রদানের কথা মেনে নেয়া হয়। কিন্তু এতেও ইসরাইলের মন ওঠেনি। ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের মে সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। ইসরাইলকে আমেরিকা দিয়েছে ফ্যান্টম, ফ্রান্স দিয়েছে মিরেজ বিমান। আমেরিকা ও ফ্রান্সের সহায়তায়ই ইসরাইল পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে যাচ্ছে। কতিপয় আরব রাষ্ট্রের বন্ধু বলে পরিচয় দিলেও রাশিয়া যে আরবদের সঙ্গীন মুহূর্তে পিঠটান দেবে একথা গত জুন যুদ্ধেই পরিস্কার হয়ে গেছে।

বৃহৎ শক্তিবর্গের পরোক্ষ সহযোগিতা এবং আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের দুর্বলতা ইসরাইলের সাহস অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বাদশাহ্ হোসেনের ৬ দফা প্রস্তাবের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ইসরাইলী উজীরে আজম মিসেস গোল্ডা মায়ার পার্লামেন্টে বলেছেন, কেউই ইসরাইলকে ১৯৬৭ সালের ১লা জুনের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবেনা। বৃহৎ শক্তিবর্গের কোন সিদ্ধান্ত ইসরাইল মানতে বাধ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন প্রভাবিত চতুঃশক্তি সম্মেলনে মার্কিনী প্রস্তাবই গৃহীত হচ্ছে, একথা ইতিমধ্যেই খোলাসা হয়ে গেছে। গত ২৬ শে মার্চের 'টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টের রক্ষনশীল দলীয় সদস্য স্যার টার্ফটন বিট্রিশ আমেরিকার ইসরাইল নীতি সম্পর্ক বলতে গিয়ে বলেছেন, আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে 'Israel right or wrong'.চতু:শক্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত তাই আরব স্বার্থের অনুকূল হবে একথা আশা করা আজ অনেকটা দুরাশার সামিল হয়েছে।

দ্যগলের পতন ঃ ফরাসী ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি

গত ২৮শে এপ্রিল ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্যগন পদত্যাগ করেছেন। দ্যগলের পদত্যাগের সাথে সাথে ইউরোপের ইতিহাসেরও একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে। ফ্রান্সের শাসনপদ্ধতি এবং সিনেট সংস্কারের উপর অনুষ্ঠিত ২৭শে এপ্রিলের গণভোটে পরাজিত হয়েই দ্যগল পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন । ২৮শেএপ্রিল মধ্যরাতে মাত্র তিন লাইনের একটি বিবৃতিতে ৭৯ বৎসর

www.icsbook.info

বয়স্ক জেনারেল তার পদত্যাগের কথা ঘোষনা করেছেন। দ্যগলের পরাজয়ে দ্যগল বিরোধী যুবকেরা প্যারিসের রাজপথে আনন্দোৎসব করতে থাকে।জেনারেল দ্যগলের আকস্মিক পদত্যাগে দেশবিদেশের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দ্যগল বিরোধীরাও তার পদত্যাগে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যে বৃটেনকে জেনারেল দ্যগল ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ করতে দেননি সেই বৃটেনের পত্রপত্রিকাও তাঁর পদত্যাগে দুঃখ প্রকাশ করেছে। ১৯৫৮ সালে দ্যগল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি করেন। সেই থেকে গত ১১ বছর ধরে দ্যগল বিশ্ব রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। এই ১১ বছরের শাসনকালে ফ্রান্সে মোট পাঁচটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে এপ্রিলের গণভোট ছিল দ্যগল শাসনের ৫ম গণভোট। দ্যগল এটাকে শেষ পর্যন্ত আস্থাভোট মনে করেন। দ্যগলের এই ১১ বছর শাসনকালে গত বছরের প্রচন্ড ছাত্র ও শ্রমিক অসন্তোষই ছিল সবচাইতে গুরুতর আভ্যন্তরীণ সংকট। দ্যগল এ সংকট কাটিয়ে উঠেছিলেন সত্য, কিন্তু এটাই তার জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি। ক্ষয়িষ্ণু এই জনপ্রিয়তার মুখে জেনারেল দ্যগল যখন জনগণের অবস্থা জানতে চেয়েছিলেন তখন ২ কোটি ৯০ লক্ষ ভোটারের শতকরা ৫৩ জনই তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

জেনারেল দ্যগল স্বদেশের শাসন ব্যাপারে যেরূপ স্বৈরাচারী ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও সেরূপ স্বাধীন মতাবলম্বী ও একরোখা ছিলেন। গত বছর নভেম্বরে ফ্রান্সের চরম মুদ্রা সংকটের সময় ফ্রান্সের মুদ্রামান হ্রাস করার জন্য তাঁকে চাপ দেয়া হলে তিনি তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। দ্যগলের এই স্বৈরাচারী ও স্বাধীন রাজনীতির পেছনে তাঁর ব্যক্তি প্রভাব প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাঁর ধারণা ছিল প্রতিটি ফরাসীই গলবাদের অনুসারী হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে সুপিরিয়র প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে অনেকবারই বিরাট রকমের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে চার্লস দ্যগলের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের অন্তর্ভূক্তির বিরোধিতা এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষা জোট ন্যাটোর সামরিক কাঠামো থেকে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার। দ্যগল ভিয়েতনামে আমেরিকার অন্যায় নীতি সমর্থন করেননি। চরমপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্তেও তিনি আলজিরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নিয়েছিলেন। শাসনকালের প্রথম দিকে অবশ্য দ্যগল সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে সাহায্য করতেন। পরে ইহুদীদের সম্প্রসারণবাদী একগুঁয়ে মনোভাব তাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তিনি ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব ও আক্রমনাত্মক নীতির তীব্র নিন্দা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইসরাইলের কাছে ফরাসী অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গণভোটে দ্যগলের পরাজয়ের এ ছিল একটি অন্যতম কারন। এ জন্যই বিরাট সংখ্যক ইহুদী ভোটার দ্যগলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। জেনারেল দ্যগল বিচ্ছিন্নতাবাদী 'বায়াফ্রাকে' স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আফ্রিকার বুকে ফরাসী প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তার উদ্দেশ্য। পশ্চিম জার্মানীর সাথে ফ্রান্সের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে চার্লস দ্যগলের দান ছিল সবচাইতে বেশী। এর ফলে শতাব্দীকালের ফ্রাঙ্কো-জার্মান বিরোধের অবসান হয়েছিল।

রাজনীতিবিদ হিসেবে দ্যগল ছিলেন নির্ভীক। তিনি একই সাথে সমাজতন্ত্র ও আমেরিকান পুঁজিবাদকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি যেমন আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতিকে সমর্থন করেননি তেমনি রাশিয়ার চেকোশ্লাভাকিয়া দখলেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। গত বছর মে মাসে সমাজতন্ত্রী দেশ রুমানিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি পূর্ব ইউরোপের বুক থেকে সমাজতন্ত্রের লৌহকপাট অপসারণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কানাডা সফরকালে তিনি কুইবেকের স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন, যা কানাডা সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। চার্লস দ্যগলের এই সাঁড়াশী অভিযান সমাজবাদী ও পুঁজিবাদী দলপতিদেরকে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

দ্যগলের পতনের অনেক কারণই থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, ফ্রান্সের

www.icsbook.info

গণতন্ত্রকামী মানুষ দ্যগলের ব্যক্তি শাসন আর বরদাশত করতে রাজী ছিল না, তা তিনি যতবড় ব্যক্তিত্ব আর অনন্য প্রতিভাই হোন না কেন। দুনিয়ার বহু বড় ডিকটেটরের কপালে যা জুটেছে আজ দ্যগলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একথা সত্য যে, চার্লস দ্যগল ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা ছিলেন। একথাও সত্য যে, ফরাসী ইতিহাসের দীর্ঘ ৩০ বছরে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি এ্যাডভেঞ্চারিজম নীতির অনুসারী ছিলেন। তাঁর পতনের এটাও একটা কারণ ছিল।

জেনারেল দ্যগল ক্ষমতা ত্যাগ করেছেন! ফরাসী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দ্যগল মন্ত্রীসভা এখনও কাজ করে যাচ্ছে। সিনেট প্রেসিডেন্ট মিঃ এলান পোহার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে এলিসি প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। ফরাসী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের এক মাসের মধ্যেই নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হবে।

চার্লস দ্যগলের আকস্মিক পদত্যাগ ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসে গভীর শূণ্যতা ও কঠিন সংকটের সূচনা করেছে। ফ্রান্সের রক্ষণশীল পত্রিকা 'লা ফি গারো' মন্তব্য করেছে, 'আমাদের ভুললে চলবেনা যে, যুদ্ধ আমাদের প্রতীক্ষা করছে।' 'লা ফি গারোর' কথিত এ যুদ্ধ হচ্ছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর এ দ্বন্দ্ব হচ্ছে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী রাজনীতির। চার্লস দ্যগল ফ্রান্সে গলবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিলো ইউরোপের বুকে এক নতুন ধনবাদী জাতীয়তার সৃষ্টি। তাঁর শ্লোগান ছিল 'Unite Europe, unite.' এজন্যই তিনি ইউরোপের বুক থেকে আমেরিকা ও রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটিসমূহের অপসারণ দাবী করেছিলেন, সমাজবাদী ও ধনবাদী দুই ইউরোপীয় ঐক্যসংস্থাকে জোড়া দিতে চেয়েছিলেন। এজন্যই সমাজবাদী দেশ রুমানিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের লৌহ যবনিকা সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ধনবাদী জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের স্বপ্নই রূপলাভ করেছিল গলবাদের মধ্যে। জেনারেল দ্যগলের পর গলপন্থী ও গল বিরোধীদে মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা ফ্রান্সকে দ্যগলপূর্ব যুগের স্থিতিহীনতা ও বিশৃংখলার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে।

নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের সব ক'টি রাজনৈতিক দলই তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে দ্যগল পন্থীরা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপাবলিকান পার্টি, নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী, কনভেনশন অব রিপাবালকান ইনস্টিটিউশন, মধ্যপন্থী গণতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট পার্টি। এছাড়া এ নির্বাচনে রক্ষণশীলদল, স্বতন্ত্রদল ও উদারনৈতিক র‍্যাডিক্যাল সোশালিস্ট পার্টিরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকবে। দ্যগল পন্থীদের বিরুদ্ধে বহুধা বিভক্ত সমাজতন্ত্রী শিবিরে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে এ পর্যন্ত দ্যগল পন্থী সাবেক প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাম্পডু, মার্সেলিজের সমাজতন্ত্রী মেয়র গ্যাস্টন ডেফারী ও মধ্যপন্থী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এল্যান পোহারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ফ্রান্সের নির্বাচন ১লা জুন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অথবা নির্বাচনোত্তর ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে একটা চূড়ান্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। এ সংঘর্ষে কারা জয়ী হবে বলা মুশকিল। তবে আধুনিক গণতন্ত্রের জন্মভূমি ফ্রান্সের জনগণ যে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদকে সমর্থন করবে এটা নিশ্চয় করে বলা যায়না। জেনারেল দ্যগল ফ্রান্সে নতুন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিলেন, এর উপনিবেশতার সংস্কার করেছেন এবং ফ্রান্সকে বৃহৎ শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ একথা বলতেই হয় যে, তিনি ফ্রান্সকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে পরিত্যাগ করেছেন। গত ১১ বছরে দ্যগলের ব্যক্তি শাসন সমালোচনার প্রশ্রয় দেয়নি- গঠনমূলক নেতৃত্ব সৃষ্টি করেনি। স্থিতিহীনতা ও রাজনৈতিক গোলযোগের মুখে দ্যগল ফ্রান্সের ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১১ বছর পর ফ্রান্সকে আবার সেই অবস্থায়ই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রীক ও আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিণতি এভাবেই হয়ে থাকে। ইতিহাসের শিক্ষা এই-ই।

www.icsbook.info

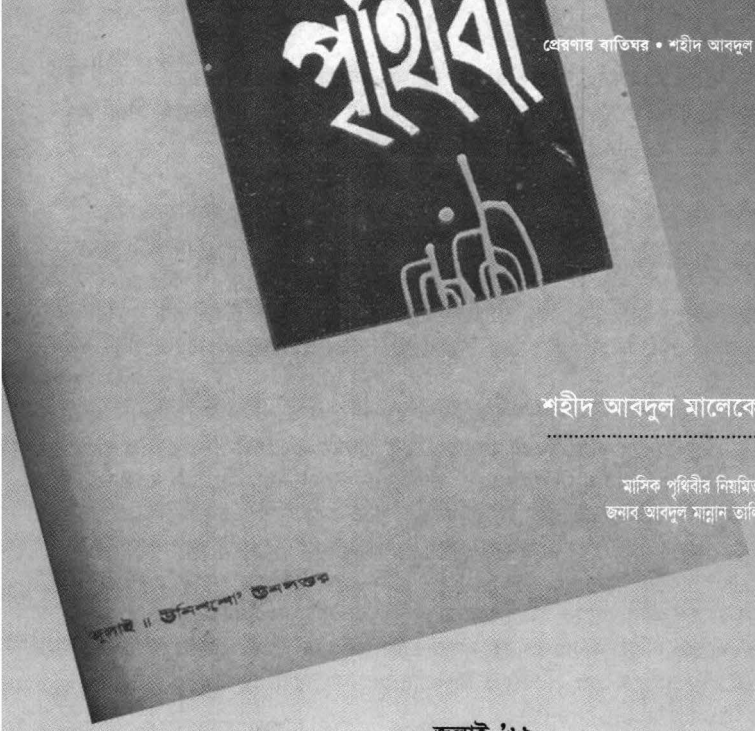

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

মাসিক পৃথিবীর নিয়মিত কলাম 'বিশ্ব পরিস্থিতি'
জনাব আবদুল মান্নান তালিবের সৌজন্যে সংগৃহীত

জুলাই '৬৯

সামরিক জান্তার কবলে সুদান

গত ২৫শে মে সুদানে সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৫ বছর বয়স্ক মেজর জেনারেল জাফর আল নিমারীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসাররাই এ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়েছে। জেনারেল নিমারী নিজেকে বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান ও সুদানের প্রেসিডেন্ট ঘোষনা করেছেন। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব তার হাতেই রয়েছে। হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি আবু বকর আওয়াদাল্লাহর নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভাও গঠিত হয়েছে।

সুদানের সামরিক জান্তা শাসনতন্ত্র বাতিল করে দিয়েছে। সুদান প্রজাতন্ত্রের নাম পরিবর্তন করে 'সুদান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' রাখা হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইসমাঈল আজহারী ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ মাহ্গুব তাদের নিজস্ব বাসভবনে আটক রয়েছেন বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক দলসমূহ

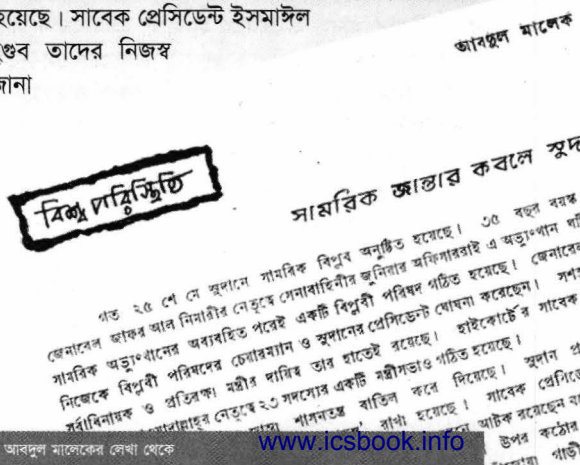

www.icsbook.info

বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। অনেকগুলোর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। সাঁজোয়া গাড়ী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারা দিচ্ছে, নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও ছত্রী সৈন্যরা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সুদানের সামরিক জান্তা বিরোধী দলীয় রাজনীতিক বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মীদেরকে পাইকারী হারে গ্রেফতার করেছে। জেনারেল নিমারীর ঘোষণা অনুযায়ী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই মোট ৬৪জন বেসামরিক এবং ১৩ জন সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সামরিক জান্তার প্রথম শিকারে পরিণত হয়েছেন ইখওয়ানের তরুণ কর্মী উমর শেখ মোহাম্মদ সালেহ্। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এক সামরিক ট্রাইবুনালে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কঠোর নিরাপত্তা ও কড়া প্রহরায় এই বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ।

সুদানের নয়া সরকার বামপন্থী আরব সমাজবাদের সমর্থক। ক্ষমতা দখল করে প্রধানমন্ত্রী আওয়াদাল্লাহ তাঁর প্রথম বেতার ভাষণেই ঘোষণা করেছেন, 'সুদান এক্ষণে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।' সুদানী সমাজতন্ত্রকেই নয়া সরকারের নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মন্ত্রীসভাও গঠন করা হয়েছে কম্যুনিস্ট ও আরব সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে। মন্ত্রীসভার সদস্য জোসেফ কিরনেক ও মাকাবী মোস্তফা ঝানু কম্যুনিস্ট। সুদান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফারুক বুইমা প্রেসিডেন্সিয়াল এফেয়ার্সের টেস্ট মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে এবং আমীন তাহের, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, তাহা গফুর যথাক্রমে বিচার, কৃষি ও শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে। এরা সবাই আরব সমাজতন্ত্রের সমর্থক। স্বয়ং জেনারেল নিমারী একজন প্রোগ্রেসিভ ন্যাশনালিস্ট এবং প্রধানমন্ত্রী আওয়াদাল্লাহ্ নাসেরবাদের সমর্থক। সুদানের নয়া পররাষ্ট্রনীতি মস্কো ঘেঁষা ও নাসেরপন্থী।

সুদানের বামপন্থী সামরিক অভ্যুত্থান অনেকের কাছেই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে; কারণ ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে মাহ্দী সুদানীর নেতৃত্বে যে সুদানী জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুদানকে আজাদ করেছিল তারা আজ কিভাবে ইসলাম বিরোধী সমাজবাদকে কবুল করবে? যে জনগণ ইব্রাহীম আবুদের সামরিক ব্যক্তিতন্ত্রকে সহ্য করেনি তারা কি আর একটি সামরিক জান্তাকে প্রশ্রয় দেবে? সুদীর্ঘ দশ বছর যারা ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে তারা কি ইসলামী জীবন বিধান ছাড়া অন্যকিছু গ্রহণ করবে? সুদানের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে বর্তমান সামরিক বিপ্লব একটা বিস্ময় সত্য, কিন্তু গত ১০ বছরের সুদানী রাজনীতির ভাঙ্গাগড়া পর্যালোচনা করলে এটাকে অনেকটা স্বাভাবিক পরিণতিই বলা চলে।

সুদান স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৫৬ সালে। সেই থেকে সুদানে শুরু হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক টানাপোড়ন। মাহদী সুদানী সুদানকে স্বাধীন করেছিলেন সত্য; কিন্তু তার অনুগামীদের মানস ও চরিত্রে ইসলামী জীবনবোধ সৃষ্টি করে যেতে পুরোপুরি সক্ষম হননি। সুদানী মুসলমানের অন্তরে ইসলামের জন্য অকৃত্রিম দরদ ও জজবা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাদের সামনে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন কাঠামো রেখে যাওয়ার সময় পাননি। যার ফলে সুদানের বৃহত্তম সংগঠন উম্মা পার্টি একটি ধর্মীয় গোত্রে পরিণত হয়েছিল; কোন ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি! সুদানে কমপক্ষে ২৮টি রাজনৈতিক দল রয়েছে। এদের মধ্যে উম্মা পার্টি, ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন অন্যতম। কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা সেখানে সংখ্যায় খুবই নগণ্য। তাও জনতার চাপে পার্লামেন্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংখ্যা নগণ্য হলেও কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা সুদানের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পদ দখল করে বসেছিল। বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রায় সবাই কম্যুনিস্ট, সাবেক সরকারের আমলে এরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাকাবী

www.icsbook.info

মুস্তফা শিক্ষক সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন, সুদান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফারুক বুইসা সুদানী শিক্ষক ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলেন। অন্যদিকে বর্তমান বিচারমন্ত্রী আমিন তাহের সুদানী আইনজীবি সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টির ডীন এবং শ্রমমন্ত্রী তাহা গফুর একজন মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন। এরা সবাই বহু পূর্ব থেকেই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট। স্বয়ং আবু বকর আওয়াদাল্লাহ সুদান পার্লামেন্টের স্পীকার ও হাইকোর্টের সহকারী প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আরব সমাজতন্ত্রের কলেমা পড়েছিলেন। এভাবে সমাজতন্ত্রী ও আধা সমাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে ব্যাপক অনুপ্রবেশ করেছিল।

অন্যদিকে সুদানের ভৌগোলিক ও নৃতাত্বিক দিকও বর্তমান বিপ্লবের জন্য অনেকখানি দায়ী। ভৌগোলিক দিক দিয়ে সুদান উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত। উত্তরাঞ্চলের প্রায় সবাই মুসলমান। অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চলে খৃষ্টান ও আফ্রিকান আদিম অধিবাসীদের বাস। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের অমুসলিম ও অনারবরা ক্রমাগতভাবে বিদ্রোহ করে এসেছে। সুদানের সেনাবাহিনী গত ১২ বছর যাবৎ উক্ত বিদ্রোহের মোকাবিলা করে এসেছে। কিন্ত বিদ্রোহের অবসান হয়নি। তাদের এই বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছে মিসর, কংগো, কেনিয়া ও উগান্ডা। চীন ও ইসরাইলের সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত গেরিলারা ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ সুদানে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে কিন্ত ১৯৬৬ সালের দিকে সুদানী সেনাবাহিনী এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। নৃতাত্বিক দিক দিয়ে সুদানে ৫৭২ টি উপজাতির বাস। এদের অনেক গুলোর ভিতর কলহ লেগেই আছে। অন্যদিকে মাত্র দেড়-কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত সুদানে ২৮ টি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে। ক্ষমতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সুদানের রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক কোন্দল ও দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতেই সুদান সরকারকে বেশী মাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। যার জন্য অতীতের সরকারগুলো সুদানের অর্থনীতিকে মজবুত করে গড়ার কাজে বড় বেশী একটা নজর দিতে পারেনি। একে তো দরিদ্র দেশ তাতে আবার বেকার সমস্যা সুদানের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। অন্যদিকে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটিও একটা বিরাট রকমের সংকট সৃষ্টি করেছিল। জনতার দাবী অনুযায়ী স্বাধীনতার দীর্ঘ ১২ বছর পর সরকার একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা ও কম্যুনিস্টদের ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত সে শাসনতন্ত্র জারী হতে পারেনি। সুদান সরকারের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্টরা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখিত সামরিক বিপ্লবের পেছনে আর একটি কারণ রয়েছে। আর এ কারণটি সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রেই সমভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। সেটা হলো বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ। সুদানও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ মুক্ত ছিলনা। মিসর, কেনিয়া উগান্ডা ও কংগো দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহীদের উসকানী দিয়েছে। চীন ও ইসরাইল তাদেরকে গেরিলা ট্রেনিং দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া একদিকে প্রত্যক্ষভাবে সুদানের নেপথ্যে ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছে, অন্যদিকে মিসরের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের উসকানী দিয়েছে। বস্তুতঃ আফ্রিকার এই বৃহত্তম ও দরিদ্রতম দেশটিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য রাশিয়ার ব্যস্ততার অন্ত ছিলনা। জনৈক রুশ পর্যটক একবার সুদান ভ্রমণে এসে সোভিয়েত পুস্তক-পুস্তিকা ও ম্যাগাজিনের স্বল্পতা দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে সুদানে চীনা সাহিত্যের ব্যাপক ছড়াছড়ি দেখে তার এ দুঃখ আরো কয়েকগুন বেড়ে গিয়েছিল। সুদানে সামরিক বিপ্লবের পরপরই রুশপন্থী আরব সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো সুদানের সামরিক জান্তাকে স্বাগতম জানিয়েছে। অন্যদিকে সপ্তাহ খানেক পর সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা মন্তব্য করেছে যে, সুদানের সামরিক অভ্যুত্থান 'ইসরাইলী নির্যাতন ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দৃঢ় করবে। পত্রিকাটি আরো মন্তব্য করেছে, গত পাঁচ বছরে সুদানে

www.icsbook.info

গণতন্ত্রের অগ্রগতিকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাহত করে রাখা হয়েছিল এবং কম্যুনিস্ট বিরোধিতা সুদান সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এথেকে অনুমিত হয়, এই অভ্যুত্থানে রাশিয়ার কোন হাত আছে।

সামরিক জান্তা সুদানের ক্ষমতা দখল করেছে। জেনারেল নিমারী খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন যে, ১০ বছর পূর্ব থেকেই এর গোপন প্রস্তুতি চলছিল। তাদের সাহায্য করেছে বেসামরিক কম্যুনিস্টরা আর উৎসাহ যুগিয়েছে বিদেশী চরেরা। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসাররাই এ অভ্যুত্থানের পুরোভাগে। তবে তারা শেষ রক্ষা করতে পারবে কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইতিমধ্যেই সুদানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সুদানের মত দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি হবে এ নিয়ে বামপন্থী শিবিরে তীব্র মতভেদ শুরু হয়েছে। লন্ডন অবজারভারের খবরে প্রকাশ, সুদানের প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা আবদুল খালেক মাহবুবকে এ জন্যই আটক করা হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মাহবুব মিসরের ন্যায় সুদানে আরব সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির বিলোপ সাধনের বিরোধী। অন্যদিকে সুদানের ইসলামী জনতাও এই সমাজতন্ত্রী জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। লন্ডন টাইমসের খবরে প্রকাশ, ওমদুরমানে বিক্ষোভের আয়োজন চলছে। ওমদুরমানে অবস্থিত সুদানী জনগণের প্রিয় নেতা মাহদী সুদানীর সমাধিকে এখনও সাঁজোয়া গাড়ী ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে জনসাধারণের নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে। অন্য এক খবরে প্রকাশ, সুদানে বিক্ষোভ ও সশস্ত্র লড়াই চলছে। প্রধানমন্ত্রী আওয়াদাল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'আমরা যে কোন প্রতিবিপ্লবকে নস্যাৎ করে দেব, নইলে নিজেরাই নিহত হব।' এ থেকেও মনে হয়, সেখানে প্রতিবিপ্লবের আয়োজন চলছে। বর্তমান অবস্থা যাই হোকনা কেন ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রসেনা মাহদী সুদানীর সুদান যে এই সমাজতন্ত্রী সামরিক জান্তাকে সহ্য করবেনা, তা মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

দাঙ্গা বিক্ষত মালয়েশিয়া

গত মে মাসে মালয়েশিয়া পক্ষকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের শিকারে পরিণত হয়। মালয়েশিয়ার সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মালয়ী ও চীনাদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। এই আত্মঘাতি দাঙ্গায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিরাট। এতে কমপক্ষে ১৭৭ জন লোক নিহত, বহু আহত এবং ৬ সহস্রাধিক লোক গ্রেফতার হয়। দাঙ্গা চলাকালে সান্ধ্য আইন জারী, সেনাবাহিনী তলব ও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। দাঙ্গার ফলে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দেয়া হয় এবং জরুরী ক্ষমতাবলে মালয়েশিয়ার 'জাতীয় অপারেশনাল কাউন্সিল' এখন দেশ শাসন করছে। এখানে সেখানে দু'একটি খন্ড ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটলেও মালয়েশিয়ার অবস্থা আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

মালয়েশিয়ার এই দাঙ্গার শুরু ৯ই মের একটি ঘটনাকে পুঁজি করে। ঐদিন পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মালয়েশিয়ার বামপন্থী 'লেবার পার্টি'র একজন সদস্য নিহত হলে শ্রমিকদল একটি শব শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রাকারীরা লাল পতাকা ও মাও সে তুংয়ের প্রতিকৃতি বহন করে এবং উসকানী মূলক শ্লোগান দিতে থাকে। পরদিন মালয়েশিয়ার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে টেংকু আবদুর রহমান পরিচালিত এবং মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত 'এলায়েন্স পার্টি' পূর্বাপেক্ষা কম আসন লাভ করে। চীনা-গোষ্ঠীর দুর্বলতাই এর অন্যতম কারণ। অন্যদিকে সিংগাপুর প্রভাবিত এবং চীনা যুদ্ধবাজ যুবকদের নিয়ে গঠিত 'চায়নীজ ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন পার্টি (DAP) নির্বাচনে পূর্বাপেক্ষা অধিক আসন লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরপরই DAP এর উচ্ছৃংখল চীনা যুবকরা শোভাযাত্রা বের করে এবং মালয়ীদের বিরুদ্ধে উসকানীমূলক শ্লোগান দিতে শুরু করে। এথেকেই হাতাহাতি ও দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। পর্যবেক্ষকদের মতে এই দাঙ্গার পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে চীনা এবং সিংগাপুর সরকার। মালয়েশিয়ার এই দাঙ্গায় কম্যুনিস্টরা খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের কাছ থেকে

www.icsbook.info

বিপুল সংখ্যক বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র আটক করা হয়েছে বলে সরকারী মহল দাবী করেছে। মালয়েশিয়ার বুকে কম্যুনিস্ট গেরিলা ও চীনা বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের রাষ্ট্রবিরোধী ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ এই প্রথম নয়। এর আগে আর একবার কম্যুনিস্ট এজেন্টরা মালয়কে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের কবলে নিক্ষেপ করেছিল।

মালয়েশিয়ায় বহু জাতির বাস। এর মধ্যে মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীই প্রধান। মালয়ীরা মুসলমান। ত্রয়োদশ শতকে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম এখানে প্রচারিত হয়েছিল। মালাককার শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণের পর পরই সেখানে মুসলিম সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৮ সালে বৃটিশ শাসকেরা পেনাং মালাককা ও সিংগাপুর নিয়ে মালয় ফেডারেশন গঠন করে। অতঃপর বৃটেনেরই তত্ত্বাবধানে ১৯৬৩ সালের দিকে মালয়, সিংগাপুর, সারাওয়াক ও সাবাহ্ রাজ্যের সমন্বয়ে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়। অবশ্য পরে লিকুয়ান ইউ এর নেতৃত্বে ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে সিংগাপুর মালয়েশিয়া ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মালয়েশিয়ায় মালয়ী মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫১ জন। চীনাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। বৃটিশ শাসনামলে চীনারা এখানে মজুর ও ব্যবসায়ী হিসেবে আগমন করে। বৃটিশ প্রভুদের সহযোগিতায় চীনা আগন্তুকেরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে চীনারা শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী হয়ে ওঠে। এভাবে গোটা দেশের অর্থনীতিও তাদেরই কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। মালয়ী মুসলমানদের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষকে পরিণত হতে থাকে। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যক্ষ টুঙ্কু আবদুল আযীয নির্ণীত হিসাবমতে মালয়ের মাথাপিছু আয় ৭৫০ মালয়ান ডলার হওয়া সত্তেও একজন সাধারণ মালয়ীর মাসিক আয় ৫০ থেকে ৬০ মালয়ান ডলারের অধিক নয়। অপরদিকে দেখা গেছে রাজনৈতিক মতামতের ব্যাপারে চীনা আগন্তুকদের দৃষ্টি সমুদ্রপারের চীন ভূখন্ডের দিকেই। এই পররাজ্য আনুগত্য (Extra territorial Loyalty) মালয়েশিয়াকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্যা বহুল দেশে পরিণত করেছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র মালয়েশিয়া। সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের সাথে এর মিল আছে। সমুদ্রপাড়ের চীনের সাথে এর সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের খুব কমই সংযোগ রয়েছে। অন্যদিকে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে 'প্যান মালয় ইসলামী পার্টি' মালয়ী মুসলমানদের মধ্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মালয়েশিয়ার এ অবস্থা মালয়ের চীনা অধিবাসী এবং সিংগাপুর ও কম্যুনিস্ট চীন সরকারকে অনেকখানি ভাবিয়ে তুলেছে। পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই ধারণা, মালয়েশিয়ার সাম্প্রতিক দাঙ্গায় চীনের অদৃশ্য হাত ছিল। চীনা যুদ্ধবাজ নাগরিকেরা কেবল মালয়েশিয়ায়ই নয় বরং বার্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি যে কোনো দেশেই তারা বসতি স্থাপন করেছে সেখানেই একটা না একটা হাঙ্গামা বাধাতে চেষ্টা করেছে। সুদূর বৃটেনের পুলিশও এদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। গত ক'বছর আগে মালয়েশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় তাদের বাধানো হাঙ্গামা ইতিহাস কোনদিন ভুলবেনা। চীনের সাথে ইন্দোনেশিয়ার দহরম মহরমের সুযোগ নিয়ে চীনারা বালিদ্বীপ ও অন্যান্য এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এরা সেখানে বার বার দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। শেষে চূড়ান্ত সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্টরা ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেছে। এতে ৬ থেকে ১০ লক্ষ মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী চীনা বংশোদ্ভূতদের সাথে যখনই স্থানীয় লোকদের বিরোধ বেধেছে তখনই কম্যুনিস্ট চীন চীনাদের সংযত করার পরিবর্তে তাদেরকে উসকানী দিয়েছে। আর মালয়েশিয়ায়ও যখন চীনা নাগরিকেরা পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করছে তখন চীনের চিরাচরিত সেই নীতির ব্যতিক্রম হয়নি।

www.icsbook.info

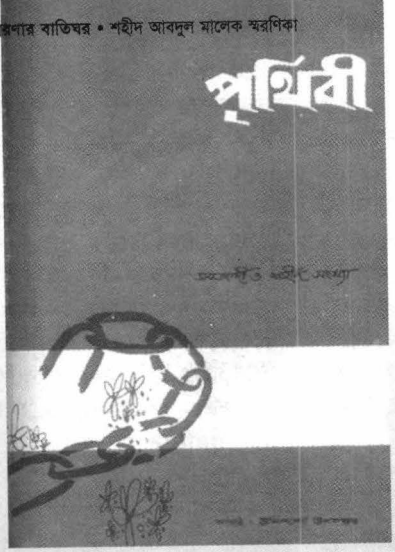

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

মাসিক পৃথিবীর নিয়মিত কলাম 'বিশ্ব পরিস্থিতি'
জনাব আবদুল মান্নান তালিবের সৌজন্যে সংগৃহীত

আগষ্ট '৬৯

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি

গত কিছুদিন থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 'নিরাপত্তা', 'যৌথ রক্ষাব্যবস্থা', 'আঞ্চলিক সহযোগিতা', 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামানোটা সোভিয়েত রাশিয়ারই অধিক। কিছুদিন আগে সোভিয়েত রাশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র ভারতকে সামরিক ছত্রছায়া দিতে চেয়েছিল। গত ৭ই জুন মস্কোতে অনুষ্ঠিত কম্যুনিস্ট সম্মেলনে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল লিওনিদ ব্রেজনেভ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য একটি যৌথ রক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। এর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে আফগানিস্তানের রাজধানী

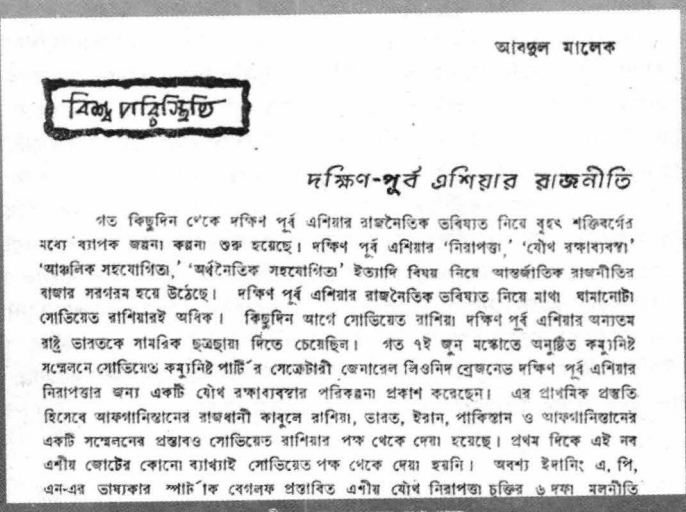

আবদুল মালেক

বিশ্ব পরিস্থিতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি

গত কিছুদিন থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 'নিরাপত্তা,' 'যৌথ রক্ষাব্যবস্থা' 'আঞ্চলিক সহযোগিতা,' 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামানোটা সোভিয়েত রাশিয়ারই অধিক। কিছুদিন আগে সোভিয়েত রাশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র ভারতকে সামরিক ছত্রছায়া দিতে চেয়েছিল। গত ৭ই জুন মস্কোতে অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল লিওনিদ ব্রেজনেভ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য একটি যৌথ রক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। এর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে রাশিয়া, ভারত, ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের একটি সম্মেলনের প্রস্তাবও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। প্রথম দিকে এই নব এশীয় জোটের কোনো ব্যাখ্যাই সোভিয়েত পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। অবশ্য ইদানিং এ. পি, এন-এর ভাষ্যকার স্পার্টাক বেগলফ প্রস্তাবিত এশীয় যৌথ নিরাপত্তা চুক্তির ৬ দফা মূলনীতি

www.icsbook.info

কাবুলে রাশিয়া, ভারত, ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের একটি সম্মেলনের প্রস্তাবও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। প্রথম দিকে এই নব এশীয় জোটের কোনো ব্যাখ্যাই সোভিয়েতপক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। অবশ্য ইদানিং এ.পি.এন-এর ভাষ্যকার স্পার্টাক বেগলফ প্রস্তাবিত এশীয় যৌথ নিরাপত্তা চুক্তির ৬ দফা মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন। এথেকে মনে হয় প্রস্তাবিত দেশসমূহের সাথে গোপন আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। পাকিস্তান এধরনের কোন জোটে যোগ দেবেনা বলে পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত রক্ষাজোটের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। তবে পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই ধারণা, এশীয় প্রতিরক্ষা জোটের প্রস্তাবটি কেবল সোভিয়েত রাশিয়ার নয় বরং এ একটি রুশ-মার্কিন ষড়যন্ত্র। এ ধারণার উপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণও আছে প্রচুর। বর্তমান আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া ভাগাভাগি নীতিতে বিশ্বাসী। এটাকেই এরা বলে থাকেন 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' (Peaceful Co-existence)। এই 'শান্তিপূর্ণ অবস্থানের' নীতিই তারা প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যে। আর এশিয়ায় কম্যুনিস্ট চীনের মোকাবিলা করার জন্য রাশিয়া আমেরিকা নিজেদের মধ্যে সহ-অবস্থান নীতির আড়ালে একটা আঁতাত সৃষ্টি করেছে। যার অভিব্যক্তিই এই ব্রেজনেভ পরিকল্পনা। কিছুদিন পূর্বে টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের কাউন্সিল সভায় জাপান 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়া গঠনের এক প্রস্তাব দিয়েছিল। এ প্রস্তাবের পেছনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত স্পষ্ট। অন্যদিকে আমেরিকার অন্যতম বন্ধুরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারতকে নিয়ে এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য 'এশীয় ত্রিভূজ' (Asian triangle) রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। দক্ষিন পূর্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি'কে 'সামরিক ছত্রছায়া' দানই নাকি এর উদ্দেশ্য। এসব থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেপথ্য ষড়যন্ত্রের কথা স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে এসমস্ত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মার্কিনীরা এখনও সামনে আসেনি। এর কারণ ভিয়েতনাম কেলেঙ্কারীর ফলে বহির্বিশ্বে আমেরিকার মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়েছে। নিজের দেশেও তাদের যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমেরিকা তাই এখন পর্যন্তও সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক আঁতাত ও তাবেদার রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে এশিয়ায় নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে নিজের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটেনও রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে বিদেশ থেকে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টেও তুমুল বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি বৃটিশ পত্রিকা 'ডেলী টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে একথা পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, 'বিদেশে- বৃটিশ অবস্থান আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য করতে সক্ষম হবে এবং তাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আনতে পারবে। এছাড়া যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যব্যবস্থার উপর বৃটেনের অর্থনীতি নির্ভর করে, তার নিরাপত্তা বিধানে এবং উন্নয়নে সাহায্য করবে।' রাশিয়ার তৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করে পত্রিকাটি আরো বলেছে, 'রুশ জাহাজসমূহ ভূমধ্যসাগর, উত্তর আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থান করছে। শীঘ্রই তারা পারস্য উপসাগর এবং ভারতমহাসাগরেও শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুলবে। একটি ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে বৃটেনের সমস্ত শক্তি দিয়ে বৃটিশ বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেয়ার রুশ ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা উচিত। আর একথা সত্য যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের অগ্রপদক্ষেপ ছাড়াও রুশ-নৌবহর এ অঞ্চলে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

১৯৭০ সালের পরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ শুরু হবে। সৈন্য প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হতে আরো ৩০ মাস বাকী। ইতিমধ্যেই দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বৃটেনের নেতৃত্বে ক্যানবেরায় পঞ্চজাতি শীর্ষসম্মেলনও হয়ে গেছে। সৈন্য প্রত্যাহার শেষ হওয়ার পূর্বেই বৃটেনকে এ অঞ্চলে তার স্বার্থ সংরক্ষণের নতুন ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।

'এশিয়ার যৌথ রক্ষাব্যবস্থার' পরিকল্পনা ঘোষিত হবার পর কম্যুনিস্ট চীনে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পিকিং রেডিও এবং পিপল্‌স ডেলী এ পরিকল্পনাকে চীনের চতুর্দিকে 'বেষ্টনী রচনা' বলে মন্তব্য করে। বস্তুতঃ চীন এটা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, যৌথ রক্ষা ব্যবস্থার নামে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় চীনকে কোণঠাসা করতে চাচ্ছে। এজন্যই কম্যুনিস্ট চীন বন্ধুরাষ্ট্র সমূহে বিনামূল্যে অস্ত্র সরবরাহের কথাও ঘোষণা করেছে।

ভূগোলের মাপকাঠিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে ফরমোজা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম,

www.icsbook.info

লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড হয়ে বার্মা পর্যন্ত বুঝায়। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় পাকিস্তান, ভারত ও সিংহলকে এ অঞ্চলেই ধরা হচ্ছে। দুনিয়ার অনুন্নত অঞ্চল সমূহের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অন্যতম। এই এলাকার উন্নতমানের কৃষিজাত কাঁচামাল, মূল্যবান খনিজসম্পদ ও নৌ-বাণিজ্যের ব্যাপক সুবিধা উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহকে বারবার এই অঞ্চলে আকৃষ্ট করেছে। জনগণের নিরক্ষরতা, দারিদ্র এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে স্পেনীয়, পর্তুগীজ, দিনেমার আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদীদের নেতৃত্বে নয়া উপনিবেশবাদ গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য এবং রাজনৈতিক গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুঁজিবাদী এবং সমাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ আমেরিক ও রাশিয়া এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। চীন প্রথমদিকে তামাসা দেখলেও পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ শুরু করে। এই তিন বৃহৎ শক্তির তৎপরতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের উপরই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারিত হচ্ছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিসমূহ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। এ মার্কিন ঘাঁটিসমূহের সংখ্যা ২ হাজারেরও অধিক। এর বৃহত্তম ঘাঁটির অধিকাংশই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ওকিনাওয়াতে অবস্থিত। জাপানের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আমেরিকার কমপক্ষে ২০টি বিমান ঘাঁটি ও ১০০টি বিমান বন্দর রয়েছে। সমস্ত ঘাঁটিতে প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন অফিসার কাজ করছে- এছাড়া প্রায় প্রতিটি জাপানী বন্দরেই মার্কিন নৌ-ঘাঁটি রয়েছে। সমগ্র এশিয়ায় ওকিনাওয়া হচ্ছে- মার্কিনীদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি। এখানে তাদের ৩০টি বিমান ঘাঁটি এবং ৫০ হাজার সামরিক অফিসার কাজ করছে। ওকিনাওয়ার নাহা শহর আমেরিকার বৃহত্তম নৌ-ঘাঁটি। এখানে তাদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের ৮টি ঘাঁটি অবস্থিত। ওকিনাওয়া ঘাঁটি থেকে আমেরিকানরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও দূর প্রাচ্যের যে কোন দেশের উপর নৌ ও বিমান হামলা চালাতে পারে। সম্প্রতি আণবিক অস্ত্রেও তারা এ ঘাঁটিটিকে মজবুত করে তুলছে।

ফিলিপাইনে আমেরিকার ২৩টি সামরিক ঘাঁটি ও ১০ হাজারের এক সামরিক বাহিনী অবস্থান করছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ২১টি বিমান ঘাঁটি, ৫০টি বিমান বন্দর এবং ৬টি মার্কিন নৌ-ঘাঁটি রয়েছে। এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরে ১৭৫টি যুদ্ধজাহাজ, ৭০০ খানা জঙ্গী বিমান ও ৮০ হাজারের এক সামরিক বাহিনী রয়েছে। দূর প্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বমোট আমেরিকান সৈন্য সংখ্যা ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার। এই ব্যাপক সামরিক অবস্থানের মাধ্যমে আমেরিকা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বুকে এমন একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চায় যার বিস্তৃতি হবে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড পর্যন্ত। বাহ্যতঃ স্বাধীন হলেও এসকল রাষ্ট্র মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বের দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক শক্তি সোভিয়েত রাশিয়া নিজস্ব স্বার্থোদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কতিপয় প্রভাবান্বিত এলাকা তৈরীর চেষ্টা করে আসছে। অন্যদিকে রুশ-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের পর চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এজন্যই রাশিয়া ভিয়েতনামে আমেরিকানদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছে, এবং এশীয় প্রতিরক্ষা জোট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌবহরকে শক্তিশালী করে রাশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারেরও চেষ্টা করছে। এজন্যই ব্রেজনেভ পরিকল্পিত রক্ষাজোটে ভারতের যোগদান করা উচিত বলে সোভিয়েত সরকারী পত্রিকা ইজভেস্তিয়া মন্তব্য করেছে।

রাশিয়া ভারত মহাসাগরে ইতিমধ্যেই ১৪টি সুসজ্জিত যুদ্ধজাহাজের একটি নৌবহর গঠন করে ফেলেছে। এই নৌবহরের জন্য রাশিয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত ভারতীয় নৌঘাঁটি সমূহ ব্যবহারেরও অধিকার লাভ করেছে। এর ফলে সোভিয়েত রাশিয়া মালাককা প্রণালী ও বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। লন্ডনের 'ইনিস্টিটিউট ফর ষ্ট্র্যাটেজিক রিসার্চ' কর্তৃক ৫ই জুনে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারত রাশিয়াকে ভিজাগাপট্টম সাবমেরিন ঘাঁটি, বোম্বাই, কোচিন, মরমুগোয়া ও পোর্ট ব্লেয়ার সহ বেশ কয়েকটি বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের খবরে প্রকাশ, রাশিয়া তার ভারত মহাসাগরীয় নৌবহর মজবুত করার জন্য মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরেও নৌঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করছে। একটি মার্কিন পত্রিকার বরাত

www.icsbook.info

দিয়ে নয়াচীন বার্তা সংস্থা তথ্য প্রকাশ করেছে, সোভিয়েত রাশিয়া ভারত মহাসাগরকে রকেট পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য রাশিয়া ভারতকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। এজন্য ১৯৬০-৬৭ সালে রাশিয়া ভারতকে প্রায় ৯০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। রাশিয়া ভারতীয় নৌবহরকে শক্তিশালী করার জন্য ৩টি 'এফ' শ্রেণীর সর্বাধুনিক সাবমেরিন, ৬টি হালকা ফ্রিগেট, ৬টি প্যাট্রোল বোট ও ২৪টি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ভিজাগাপট্টম নৌঘাঁটির অংশ হিসেবে রাশিয়া সেখানে একটি সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ করছে।

রাশিয়া এভাবে কৃষ্ণ সাগর থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এক বিরাট নৌবহর গড়ে তুলতে প্রয়াসী।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনের স্বার্থ সর্বাধিক। এছাড়া চীনের নিজস্ব প্রতিরক্ষার প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রুশ-মার্কিন নৌবহরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার মত নৌশক্তি চীনের নেই। চীনের বিমান বাহিনীও মজবুত নয়। তবু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে চীনের হস্তক্ষেপ কোন অংশই কম নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থানকারী চীনা বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি কোন না কোন বিভ্রাট বাধাচ্ছেই। বিভিন্ন দেশে চীনা জনগোষ্ঠী দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়েছে আর চীন তাদেরকে আরো উত্তেজিত করেছে। বার্মা, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া এই চীনা পঞ্চম বাহিনীরই শিকারে পরিণত হয়েছি। ১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান চীনা জনসমষ্টির পঞ্চমবাহিনীতুল্য কার্যকলাপেরই ফল। গত বছর মাওসেতুংয়ের ছবি ও পুস্তিকা বিলি নিয়ে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে স্থানীয় জন সাধারণের সাথে চীনাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়। আর অতিসম্প্রতি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পেছনে চীনের উস্কানীমূলক তৎপরতা অনেকখানি দায়ী। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বেআইনী গেরিলা তৎপরতাকে চীন সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে এসেছে। তথাকথিত 'গণযুদ্ধের' মাধ্যমে এসকল রাষ্ট্রকে 'মুক্ত' করার জন্য চীন গেরিলাদের প্রতি অন্যায় ও অবৈধ আহ্বান জানিয়ে এসেছে।

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব অবস্থার কথা চিন্তা করা যাক। এ অঞ্চলে জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে ভারত অন্যতম। ১৯৭১ সালে সুয়েজের পূর্বাঞ্চল থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের পর ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় যে শক্তি শূন্যতার সৃষ্টি হবে ভারত তার সুযোগ নেয়ার জন্য ব্যাপকহারে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন অনাহারে মরছে ভারত তখন কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ১৯৬৯-৭০ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ১৪৮ কোটি ডলার। গত বছরের চাইতে আরো ৮ কোটি ডলার বেশী। আমেরিকান বার্তা সংস্থার খবরে প্রকাশ, ভারত ৪ কোটি ডলার ব্যয়ে দু'টি নৌবহর গড়ে তুলেছে। এর একটি অবস্থান করবে বঙ্গোপসাগরে অন্যটি আরব সাগরে। জাপান ও রাশিয়ার সহযোগিতায় ভিজাগাপট্টমের নৌঘাঁটিকে শক্তিশালী করছে এবং একটি সাবমেরিন ঘাঁটিও নির্মাণ করছে। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভারত বিমান বাহিনী সম্প্রসারিত ও আধুনিকীকরণ করেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী এখনই ৭ শত জঙ্গী বিমানের অধিকারী। আণবিক অস্ত্রে শক্তিশালী হওয়ার জন্য ভারত ৬টি আণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৩টি আণবিক গবেষণা চুল্লী থেকে প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হচ্ছে। ভারত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কাছ থেকেই প্রচুর অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছে। বোমাবর্ষণকারী বিমান ও রুশ ক্ষেপণাস্ত্র লাভেরও প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আজ সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের রণক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের সহায়তায় এর অভ্যন্তরে আবার নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্ভব হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাগ্য নিয়ে আজ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যে টানা হেঁচড়ার সৃষ্টি হয়েছে-প্রভাবিত ও তাবেদার এলাকা গঠন এর অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এশিয়ার বুকে কম্যুনিস্ট ও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের রণক্ষেত্রে ছিল কোরিয়া। '৫৪ সালের পর ভিয়েতনাম তাদের নতুন ফ্রন্টে পরিণত হলো। নিউওয়ে দ্বীপে থিউ-কিম্পন শীর্ষসম্মেলন এবং প্যারিস শান্তি বৈঠকের ফলে আজ ভিয়েতনামে 'কোরিয়া টাইপ' শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এশিয়ার বুকে নিজেদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে হলে তাদেরকে আর একটি কোরিয়া অথবা ভিয়েতনামের সৃষ্টি করতে হবে। এই নতুন ফ্রন্টের অবস্থান নিয়েই আজ মস্কো, পিকিং ও ওয়াশিংটনে জল্পনা চলছে।

www.icsbook.info

মাসিক পৃথিবী সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সংখ্যায় শহীদ আবদুল মালেকের লেখা পায়নি তাঁর শাহাদাতের কারনে। নিয়মিত কলাম 'বিশ্ব পরিস্থিতি'র লগোকে সামনে রেখে শহীদকে বিশেষভাবে স্মরণ করে।

বিশ্ব পরিস্থিতি

শহীদ আবদুল মালেক স্মরণে

যে লেখনী বলিষ্ঠতায়, দৃঢ়প্রত্যয়ে, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে, তথ্য পরিবেশনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল এবং এতদিনে 'পৃথিবী'র অগণিত পাঠকবর্গের মনের মনিকোঠায় ঠাঁই নিয়েছিল, 'বিশ্ব পরিস্থিতি'র অংগন যে লেখনীর দ্ব্যর্থহীন প্রকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আজ থেকে তার কণ্ঠ স্তব্ধ।

এ শহিদী খুনের নজরানা কোন অতৃপ্ত আত্মার হতাশ্বাস নয়, নয় কোনো নিঃশেষিতপ্রায় জীবনধারার শেষ প্রবাহ। এ শহিদী খুনের নজরানা পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একটি ঘুমন্ত জাতির অফুরন্ত জীবনীশক্তির প্রমান। শহীদের এ তপ্ত রক্তধারা পাকিস্তানের প্রতিটি মুসলমানকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রাণ উৎসর্গ করার আহবান জানাচ্ছে।

—৮

সেপ্টেম্বর '৬৯

শহীদ আবদুল মালেক স্মরণে

যে লেখনীর বলিষ্ঠতায়, দৃঢ়প্রত্যয়ে, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে, তথ্য পরিবেশনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল এবং এতদিনে 'পৃথিবী'র অগণিত পাঠকবর্গের মনের মণিকোঠায় ঠাঁই নিয়েছিল, 'বিশ্ব পরিস্থিতি'র অংগন যে লেখনীর দ্ব্যর্থহীন প্রকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আজ থেকে তার কণ্ঠ স্তব্ধ।

এ শহিদী খুনের নজরানা কোন অতৃপ্ত আত্মার হতাশ্বাস নয়, নয় কোনো নিঃশেষিতপ্রায় জীবনধারার শেষ প্রবাহ। এ শহিদী খুনের নজরানা পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একটি ঘুমন্ত জাতির অফুরন্ত জীবনীশক্তির প্রমাণ। শহীদের এ তপ্ত রক্তধারা পাকিস্তানের প্রতিটি মুসলমানকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রাণ উৎসর্গ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

www.icsbook.info

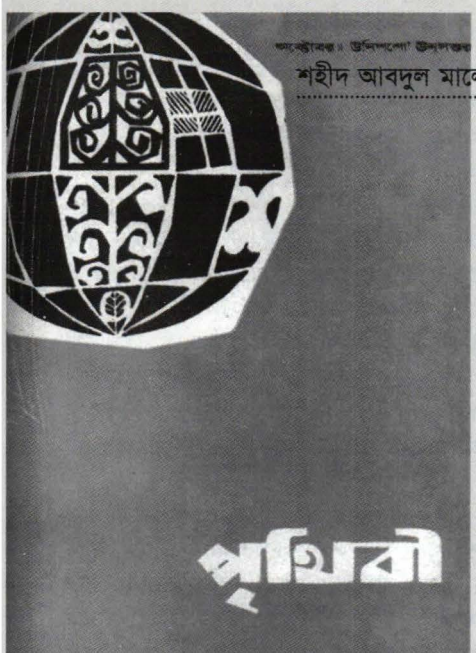

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা

শহীদ আবদুল মালেক

(শহীদ আবদুল মালেক অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালে এ প্রবন্ধটি লেখেন। কিন্তু কোনো পত্রিকায় এটি ছাপাতে দেয়ার সুযোগ পাননি। তাঁর পুরাতন কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে এটি পাওয়া গেলো। —সম্পাদক)

"ধর্ম"—কথাটা নিয়ে একদল চিন্তিত আর একদল ব্যস্ত। চিন্তিতের দল ধর্ম-ভাবকে জিইয়ে রাখার জন্য ব্যাকুল আর ব্যস্তের দল ধর্ম নিয়ে হেসেই আকুল। ধর্মের নাম শুনে আমরা অনেকে আবার ভ্রূকুচকিয়ে নাক সিটকিয়ে সটান ভদ্রলোকের মত চলে যাই। ধর্ম ধ্বজীরা (?) যে কি বলতে চায়, সেটা আমাদের বিবেকের বিচারে কতটুকু টিকে, তা চিন্তা না করেই কটাক্ষ করে রাস্তা দেখি।

ধার্মিক স্বভাবের লোকের কথা শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে লম্বা আধ-ময়লা আব্বা জোব্বা পরনে হাতে তছবিহ ওয়ালা চেহারা। আদিকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীব বলে ঠাট্টা করি। ধর্ম পুস্তকের নাম শুনলে তো আর রক্ষেই নেই, মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, শত বছরের পুরানো ঐ জীর্ণ পুঁথিগুলোকে (?) গাধার পিঠে উঠিয়ে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেই। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমাজের তথাকথিত প্রগতিবাদীদের ধারণা এই। ভাববার বিষয়, এই বিকৃত ধারনা-বিদ্বেষের মূল কোথায়। এটা কি কোন আকস্মিক ব্যাপার, না এর পিছনে কোন ইতিহাস আছে? এই দু'টো প্রশ্নের উত্তর দিতেই চেষ্টা করবো এই ছোট্ট প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে।

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে যত মতবাদ যত বিশ্বাসই থাক না কেন স্বয়ং ডারউইনও এটা অস্বীকার করতে পারেন না যে এই পৃথিবীতে সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য কতকগুলো আইন কানুন ও নিয়ম নীতির অবশ্য প্রয়োজন। কেননা সৃষ্টির আর জিনিসের চেয়ে মানুষ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাইতো সে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল জীবন যাপন করতে চায়।

মানব সৃষ্টির পর অন্যান্য জীবের মত খোদা মানুষকেও ছেড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা'হলে মানুষ সৃষ্টি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই তিনি মানব সৃষ্টির পর এই পৃথিবীতে জীবন পথে চলার জন্য দিলেন কতগুলো আইন কানুন। যাতে করে মানব সমাজ কল্যানের পথে চলতে ও অকল্যানের পথ থেকে ফিরে থাকতে পারে। যুগের পরিবর্তনের সাথে জীবনের জটিলতা বেড়ে গেলো, সমস্যার পর সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। খোদা তখন অনুগ্রহ করে পাঠালেন নবী ও অন্যান্য মহামানবদের, যারা মানুষের সকল জটিলতা ও সমস্যা চিন্তা করে আল্লাহর দেওয়া ঐশী জ্ঞান ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী বিধানগুলোকে যুগোপযোগী করে তুললেন। এই বিধান ও আইন কানুনের সমষ্টিই হলো ধর্ম। ধর্ম কোন গাঁজাখুরী ব্যাপার নয় বরং মানব সমস্যার সুপরিকল্পিত সমাধান।

মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত শহীদ আবদুল মালেকের সর্বশেষ লেখা, জনাব আবদুল মান্নান তালিবের সৌজন্যে সংগৃহীত

অক্টোবর '৬৯

ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা

(শহীদ আবদুল মালেক অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালে এ প্রবন্ধটি লেখেন। কিন্তু কোনো পত্রিকায় এটি ছাপাতে দেয়ার সুযোগ পাননি। তাঁর পুরাতন কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে এটি পাওয়া গেলো। -সম্পাদক)

'ধর্ম'-কথাটা নিয়ে একদল চিন্তিত আর একদল ব্যস্ত। চিন্তিতের দল ধর্ম-ভাবকে জিইয়ে রাখার জন্য ব্যাকুল আর ব্যস্তের দল ধর্ম নিয়ে হেসেই আকুল। ধর্মের নাম শুনে আমরা অনেকে আবার ভ্রুকুচকিয়ে নাক সিটকিয়ে সটান ভদ্রলোকের মত চলে যাই। ধর্ম ধ্বজীরা(?) যে কি বলতে চায়, সেটা আমাদের বিবেকের বিচারে কতটুকু টিকে, তা চিন্তা না করেই কটাক্ষ করে রাস্তা দেখি। ধার্মিক স্বভাবের লোকের কথা শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে লম্বা আধ-ময়লা আব্বা জোব্বা পরনে হাতে তছবিহ ওয়ালা চেহারা। আদিকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীব বলে ঠাট্টা করি। ধর্ম পুস্তকের নাম শুনলে তো আর রক্ষেই নেই, মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, শত বছরের পুরানো ঐ জীর্ণ পুঁথিগুলোকে (?) গাধার পিঠে উঠিয়ে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেই। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীলদের ধারণা এই। ভাববার বিষয়, এই বিকৃত ধারণা-বিদ্বেষের মূল কোথায়। এটা কি কোন আকস্মিক ব্যাপার, না এর পিছনে কোন ইতিহাস

www.icsbook.info

আছে? এই দু'টো প্রশ্নের উত্তর দিতেই চেষ্টা করবো এই ছোট্ট প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে।

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে যত মতবাদ যত বিশ্বাসই থাক না কেন স্বয়ং ডারউইনও এটা অস্বীকার করতে পারেন না যে এই পৃথিবীতে সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য কতকগুলো আইন-কানুন ও নিয়মনীতির অবশ্য প্রয়োজন। কেননা সৃষ্টির আর জিনিষের চেয়ে মানুষ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাইতো সে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল জীবন যাপন করতে চায়।

মানব সৃষ্টির পর অন্যান্য জীবের মত খোদা মানুষকেও ছেড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা'হলে মানুষ সৃষ্টি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই তিনি মানব সৃষ্টির পর এই পৃথিবীতে জীবন পথে চলার জন্য দিলেন কতগুলো আইন-কানুন। যাতে করে মানব সমাজ কল্যাণের পথে চলতে ও অকল্যাণের পথ থেকে ফিরে থাকতে পারে। যুগের পরিবর্তনের সাথে জীবনের জটিলতা বেড়ে গেলো, সমস্যার পর সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। খোদা তখন অনুগ্রহ করে পাঠালেন নবী ও অন্যান্য মহামানবদের, যারা মানুষের সকল জটিলতা ও সমস্যা চিন্তা করে আল্লাহর দেওয়া ঐশী জ্ঞান ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী বিধানগুলোকে যুগোপযোগী করে তুললেন। এই বিধান ও আইন-কানুনের সমষ্টিই হলো ধর্ম। ধর্ম কোন গাঁজাখুরী ব্যাপার নয় বরং মানব সমস্যার সুপরিকল্পিত সমাধান।

মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিতে পারে ধর্ম। তবুও আমরা এটাকে সুনজরে দেখতে পারিনা? এরও একটা ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। যুগে যুগে মানুষ ধর্মের মূল সত্যকে বিকৃত করে নিজেদের মত ও পথকে আল্লাহর দেয়া বিধান বলে চালিয়েছে। ফলে মানুষের গড়া নিয়মনীতি মানুষের মঙ্গলের পরিবর্তে করেছে অমঙ্গল। দোষ হয়েছে ধর্মের। ফল হয়েছে এই যে, মানব সমাজের এক বিরাট অংশ ধর্মকে অস্বীকার করে গড়ে তুলেছে নিজেদের গড়া অসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সঙ্গে ধর্মের যে সংঘর্ষ তার মূল হচ্ছে মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ইউরোপ। একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, খৃষ্ট ধর্ম তার আদি পবিত্র ও মৌলিকতা নিয়ে বিদ্যমান ছিলনা। আল্লাহর দেওয়া বিধান ও হযরত ঈসার (আ) বাণীর সাথে তদানীন্তন ধর্মযাজকদের স্বার্থ ভিত্তিক মতের সমন্বয়ে এক অদ্ভূত ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। বাইবেলের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা হযরত ঈসার (আ) জীবন ব্যবস্থা নয় বরং তাতে হস্তক্ষেপের ও বিকৃত করণের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। বিকৃত খৃষ্ট ধর্মের অনেক মৌলিক বিশ্বাসই ছিল তদানীন্তন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর মানুষের মনগড়া মতবাদ ও বিজ্ঞান চূড়ান্ত সত্য নয় বরং এগুলো মানুষের জ্ঞানের পরিধির তুলনায় পরিবর্তিত হচ্ছে যুগে যুগে। ফল হলো এই যে, গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান খৃষ্টধর্মের অনেক বিশ্বাসের মূলেই করলো আঘাত। ধর্মের উপরও আসলো অবিশ্বাস-সন্দেহ-সংশয়।

মধ্যযুগে সমস্ত ইউরোপই শাসিত হতো রোম ও কনস্টান্টিনোপলের চার্চ দ্বারা। এই চার্চ শাসিত হোত গুটিকতক খৃষ্ট ধর্মযাজকদের দ্বারা। সমগ্র খৃষ্টান জগতে পোপ ছিলেন সর্বেসর্বা। আর নির্ধারিত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করা কঠিন পাপ বলে গণ্য করা হতো। খৃষ্টধর্মের বিকৃত নীতি ও পোপের ক্ষমতা মিলে সমস্ত খৃষ্টজগতে আসলে ধর্মের নামে চলছিল ত্রাসের রাজত্ব। পোপ ছিলেন স্বর্গ মর্ত্যের একচ্ছত্র অধিপতি। কারো স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া পোপের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করতো বলে ধরা হতো।

পোপের নীতির সমালোচনাকে ঈশ্বরের সমালোচনা মনে করা হতো এবং তার জন্য কঠিন দন্ডের ব্যবস্থা ছিল। বাইবেলের উপস্থাপিত বিকৃত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে কেউ টু-শব্দ করলে তাকে নিষ্ঠুরভাবে নিস্পেষণ করা হতো। খৃষ্ট আদালতের এই আইনের নাম ছিলো ইসকুইজিশন। এটা প্রায় দু'শো বছর চলেছিল।

www.icsbook.info

মানুষের চিন্তাধারা স্থবির নয়। ভাল হোক মন্দ হোক মানুষ সব সময়ই নতুন করে চিন্তা করতে চায়। চার্চ শাসিত ইউরোপে মানুষের চিন্তাধারা যখনই স্থবির হয়ে পড়েছিলো তখনই কতকগুলো নতুনপ্রাণ নব্যপন্থীর আবির্ভাব হলো। তাঁরা মানুষকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে বললেন। এতে খৃষ্ট ইউরোপের ক্ষমতাসীন যাজক সম্প্রদায় প্রমাদ গণলেন। চার্চের সকল প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে এই নব্যপন্থীদের হত্যা করা হলো। খৃষ্ট ধর্মের গোড়ায় গলদ থাকায় যুক্তি দিয়ে এ ধর্ম বিরোধী মনোভাবকে বাধা দেয়া গেলোনা। উপরন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে অবস্থা আরোও চরমের দিকে গেলো!

এদিকে খৃষ্ট ধর্মের অনেক সত্যই ভুল প্রমাণিত হতে লাগলো। কোপার্নিকাস যখন টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ (Geocentric Theory) ভুল প্রমাণ করলেন, তখন তো খৃষ্টধর্মের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোপার্নিকাস তার এ মতবাদ প্রকাশ করতে পারেননি। যুবক বিজ্ঞানী ব্রুনোকে হত্যা করা হলো। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা গ্যালিলিওকেও চার্চের সামনে নতজানু হয়ে তাঁর প্রচারিত মতবাদ অস্বীকার করতে হলো। এই ছিল তখন খৃষ্ট ইউরোপের অবস্থা।

বেগবান নদীকে যদি বাধা দেয়া হয় তাহলে তা ফুলে ওঠে। তেমনি চার্চ তার সকল শক্তি দিয়েও এই নব জাগরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকেই মূলতঃ ধর্মের প্রতি প্রগতিবাদীদের এ আক্রমণের উৎপত্তি।

খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আঘাত হেনেই প্রগতিবাদীরা শান্ত হলোনা। তারা গোটা 'ধর্মটার' উপরই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো, সে খৃষ্টধর্মই হোক আর যে কোন ধর্মই হোক। রেনেসাঁ আন্দোলনের কর্ণধারগণ ভাবলেন, গোটা ধর্মই মানুষের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম যুক্তির আঘাত মোটেই সহ্য করতে পারেনা। কাজেই আল্লাহ, রসূল, পরকাল, ওহী প্রভৃতি সব কিছুকেই হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করা হলো। এগুলোকে মানুষের যুগযুগের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের ফলমাত্র বলে ধরে নেয়া হলো। তাইতো আজ ধর্মকে সংশয়পূর্ণ মনে করা হয় আর বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মতকে মনে করা হয় চূড়ান্ত সত্য- অন্ততঃ ধর্মবিশ্বাসের মোকাবিলায়।

বিকৃত খৃষ্ট ধর্মের অত্যাচারে নব্যসমাজ হলো রুষ্ট। ফলে খৃষ্ট ধর্ম তো গুটিকতক লোকের আচারে পরিণত হলো আর ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মও এই নব্যসমাজের শিকারে পরিণত হলো। প্রশ্ন উঠতে পারে, খৃষ্ট ধর্ম ও রেনেসাঁবাদীদের মধ্যে যখন এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব হচ্ছিল তখন ইসলাম কোথায় ছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই নব্যপন্থীরা ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি। কারণ গোটা ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র স্পেনেই মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন ছিল। কিন্তু রেনেসাঁ আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্সে তখনও ইসলামের আলো পৌঁছেনি। দ্বিতীয়তঃ ধর্মের বিরুদ্ধে গোঁড়া মনোবৃত্তি থাকায় ইসলামও হয়ত তত আমল পায়নি।

ধীরে ধীরে জন্ম হোল হেগেল, স্পেন্সার, হিউম ও ডেকার্টের মত দার্শনিকের। কার্লাইল ও ভল্টেয়ারের মত লেখকের, মার্কস ও এঙ্গেলসের মত অর্থনীতিবিদের, ডারউইনের মত জীববিজ্ঞানী ও নিউটনের মত গণিত বিজ্ঞানীর। এই আলোক যুগের (enlightenment) চিন্তাবিদগণ রচনা করলেন জড়বাদী দর্শন ও বিজ্ঞান। যদিও দার্শনিক-বিজ্ঞানীর ধারণাই অভ্রান্ত নয় এবং শত শত বার পরিবর্তিত হচ্ছে তবুও আমরা গোঁড়ামী করে তাই সত্য বলে মেনে নিচ্ছি আর আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের উৎস আল্লাহর দেওয়া সত্যিকার জীবন ব্যবস্থাকে করছি অস্বীকার।

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের একটি ভাষণ

[এই বক্তব্যটি 'নিপা'র উদ্যোগে আয়োজিত নূরখান কর্তৃক প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির উপর আলোচনা সভায় প্রদত্ত শহীদ আবদুল মালেকের রেকর্ডকৃত বক্তৃতার অনুলিপি। শাহাদাতের মাত্র তের দিন আগে ১৯৬৯ সালের ২ আগস্ট তিনি এই ভাষণটি দেন।]

নতুন ঘোষিত শিক্ষানীতির Ideological Basis সম্পর্কে এখানে আলোচনা হতে যাচ্ছে। এখানে এই Basis সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'Pakistan must aim at ideological unity, not at ideological vaccum- it must impart a unique and integrated system of education which can impart a common set of cultural values based on the precepts of Islam.'

আমার মনে হয় আজকে যারা এখানে আলোচনা করেছেন তাদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণাও করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Common set of cultural values বলতে হয়তো কেউ বুঝেছেন One set of cultural values কিন্তু তাদের এটা মনে রাখা দরকার যে, Common set of cultural values মানে One set of cultural values নয়। One set of cultural values সোভিয়েট রাশিয়াতে রয়েছে, যেখানে রয়েছে একটা Authoritarian society আর সেখানে বিভিন্ন অংগরাষ্ট্রগুলো তাদের Culture-কে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে একটা One set of cultural values তৈরি করেছে। আমরা এটার বিরোধী। আমরা এখানে চাই common set of cultural values not one set of cultural values.

এরপরে পরবর্তী পর্যায়ে আমি আলোচনা করতে চাই আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমি এখানে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা না করে শুধুমাত্র মহাকবি Milton-এর একটা কথা আলোচনা করতে চাই। Milton বলেছিলেন, Education is the harmonious development of body, mind and soul. এই body, mind and soul-এর harmonious development কোন Ideology বা কোন আদর্শ ছাড়া কি করে হতে পারে- যারা Ideological শিক্ষা ব্যবস্থা চান না তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা।

এরপরে আমি আপনাদের সামনে যে জিনিসটা আলোচনা করতে চাই তা হলো Milton-এর এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখে আমরা যদি দেখি, তবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি চেতনা এবং সঠিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা ও জাতীয় মতের সৃষ্টি করা। আর যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের mental, physical এবং moral training দিয়ে তাদেরকে এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাতে করে তারা ভবিষ্যতে জনসমষ্টির সাথে একটি Common

www.icsbook.info

cultural এবং Ideological basis-এর bridge তৈরি করতে পারে এবং এরপর এখানকার যে আদর্শ রয়েছে সেটা যাতে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে increase হতে পারে- এরকমই একটা পরিকল্পনা রয়েছে Milton-এর এই সংজ্ঞার ভেতর।

ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার যারা প্রবক্তা তারা আজ পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে, পাশ্চাত্য সমাজে Liberal education-এর নাম দিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে সে ব্যবস্থায় শিক্ষিত আমেরিকার একজন Social Philosopher এবং Educationist নিজেই বলেছেন যে, Social Philosopher এবং Educationist নিজেই বলেছেন যে, "Three kinds of progress are significant : progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in Spirituality. The last one is the most important" আর এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে Albert Schezer. তিনি যে বই লিখেছেন তার নাম হচ্ছে "THE TEACHING OF REVERENCE FOR LIFE." তিনি বর্তমান আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা Secular এবং Liberal শিক্ষা ব্যবস্থা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সেখানে একটা turning point-এ শিক্ষাকে Ideologically orient করার চেষ্টা করতে বলেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন Our age must achieve spicitual renewal. A newren aissance must come- the renaissance in which man kind discovered that ethical action is the supreme truth and the supreme utilitarianism by which mankind will be liberated." এই Spiritual liberation ছাড়া Mankind-এর কোন Liberation হতে পারে না। তিনি এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। আমার মনে হয় আর কোন কথা এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এ জন্য যে পাশ্চাত্য ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা- তথা Liberal education-এ শিক্ষিত একজন ব্যক্তিই বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেছেন।

আমার মনে হচ্ছে যে, পাকিস্তানের বুকে ২২ বছর পর্যন্ত এই Secular এবং ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমাজে এমন কতগুলো ম্যাকলের Brain child এবং Brown English man তৈরি করেছে- যাদের মুখ থেকে আমরা ধর্মহীন শিক্ষার কথা শুনছি। কিন্তু জেনে রাখা দরকার, এ শিক্ষাব্যবস্থা যখন প্রবর্তন করা হয় আজ থেকে দেড়শ বছর আগে এবং যখন এই শিক্ষাব্যবস্থা fail করলো মুসলমানদের মধ্যে তখন Sir William Hunter-কে এর Assessment করতে দেওয়া হয়েছিল। উনি কি কথাগুলো বলেছিলেন দেখুন। তিনি বলেছেন, "The truth is that our system of public instruction is opposed to the tradition, unsuited to the requirements and hateful to the religion of Mussalman."

যারা বলেন যে, ইসলামের Ideology কি তাদেরকে আমি বলবো যে, আপনি ইসলামের ইতিহাসের উপর পর্যালোচনা করুন। ইসলামের ইতিহাস দেখে তারপরে বলুন ইসলামের Ideology কি। ইসলামের Ideology বা ইসলামের Culture-এর ভিত্তিতে যে সমাজ এবং Society গড়ে উঠেছিল, সেখানে স্থানীয় Culture বা স্থানীয় সংস্কৃতিরও দাম ছিল এবং সেসব বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। Soviet Russia এর মত সেখানে One set of culture করা হয়নি, Common set of culture করা হয়েছিল।

(এরপর তাঁর বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তাকে বক্তৃতা শেষ করতে হয়।)

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে

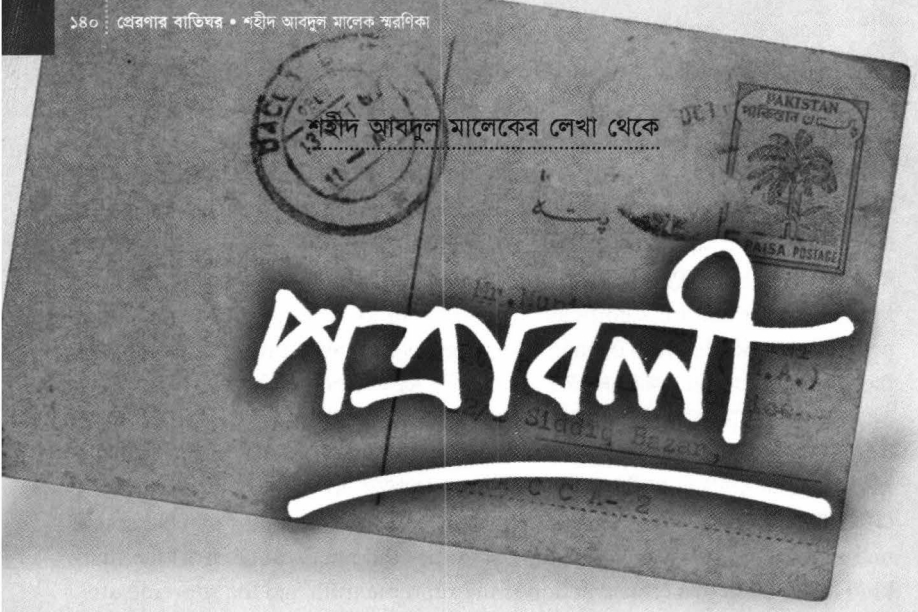

পত্রাবলী

বগুড়া জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন তার পিতার নিকট লেখা পত্রের অংশ বিশেষ-

এক.

Bogra
20.12.61

পাক জনাবেষু,

বাড়ির কথা ভাবিনা, আমার শুধু এক উদ্দেশ্য, খোদা যেন আমার উদ্দেশ্য সফল করেন। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ, দোয়া করবেন খোদা যেন সহায় হন। আমি ধন-সম্পদ কিছুই চাই না, শুধুমাত্র যেন প্রকৃত মানুষরূপে জগতের বুকে বেঁচে থাকতে পারি।

ইতি

এ. মালেক

Class - IX B

(মালেক ভাইয়ের ডায়েরী থেকে সংগৃহীত)

শহীদ মালেক স্কুল জীবনে লজিং থাকতেন বগুড়ার জোড়খালী গ্রামের জনাব মহিউদ্দীনের বাড়িতে। পরবর্তীকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে তিনি মাঝে মাঝে জনাব মহিউদ্দীন ও তাঁর ছেলে বন্ধু-প্রতিম বেলালকে নানাভাবে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্র লিখতেন। এসব পত্রে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়াও ইসলামের জন্যে তাঁর জিহাদী উদ্দীপনা ও খোদার পথে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি পত্র থেকে কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করা হলো।

দুই.

ঢাকা

১২.০৩.৬৫ ইং

কোন এক প্রভাতের শিশিরের মধ্য দিয়ে 'আমি শিশুর' যাত্রা শুরু হয়েছে, কে জানে কখন এ যাত্রা শেষ হবে।

এ. মালেক

www.icsbook.info

তিন.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ৬৬

পাক জনাবেষু,

আস্‌সালামু আলাইকুম। প্রায় মাস দুয়েক হলো আপনার সাথে কোন যোগাযোগ নেই আমার। আপনাদের বাড়ি দু'বার গিয়েছিলাম। তখন আপনি বাইরে ছিলেন। একটি ছোট্ট চিঠিও দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু অনেক আশা করেও তার কোন জবাব পাইনি। জানি না গোটা পৃথিবীটাই কি আমার বিরুদ্ধে! সব দিকই যেন নীরব হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

আসল কথা কি জানেন; বাইরের পৃথিবীতে যেমন দ্বন্দ্ব চলছে, তেমনি আমার মনের মধ্যে চলছে নিরন্তর সংঘাত। কি করলে আমার মঙ্গল, কোনটায় আমার অমঙ্গল, কিছুই আমি স্থির করতে পারছি না। জীবনের বিপদ-সঙ্কুল মহাসমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। কূলহীন নিয়ত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ রাশিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। পাবো কি কোন ঠিকানা? এই মহা জিজ্ঞাসা আমায় ব্যাকুল করে তুলেছে। যে দিকে তাকাই দেখতে পাই, সবাই ছেড়ে চলছে আমায়। আমার জগতে- আমার জীবনে তাই আমি খুঁজে নিতে চাই এক কঠিন পথ, জীবন মরণের পথ।

মায়ের বন্ধন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। বৃহত্তর কল্যাণের পথে সে বন্ধনকে ছিঁড়তে হবে। কঠিন শপথ নিয়ে আমার পথে আমি চলতে চাই। আশীর্বাদ করবেন, সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি শহীদ করে দিতে পারি।

আমার মা এবং ভাইরা আশা করে আছেন, আমি একটা বড় কিছু হতে যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যা সে সব আশা। আমি চাইনে বড় হতে, আমি ছোট থেকেই সার্থকতা পেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে বিলেত থেকে ফিরে যদি বাতিলপন্থীদের পিছনে ছুটতে হয়, তবে তাতে কি লাভ?

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোর চেয়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের অফিস আমার জীবনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জানি, আমার কোন দুঃসংবাদ শুনলে মা কাঁদবেন; কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করুন; জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী যাঁতাকলের নিষ্পেষণ আর ফাঁসির মঞ্চও যেন আমায় ভড়কে দিতে না পারে।

মিসরের কুচক্রী নাসের আবার সেখানকার একমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠান 'ইখওয়ান'কে ধ্বংস করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে এবং তার কর্মীদের ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এই অত্যাচারী জালেমদের উৎখাত করতে হবে। আমাদের সামনে হাসান হোসাইনের রক্ত- আমাদের চোখে শহীদ হাসানুল বান্নার সংগ্রামী জীবন ভাসছে। বলুন, এত অত্যাচার সহ্য করেও কি চুপচাপ বসে থাকতে হবে?

সেদিন মাওলানা মওদূদীকে সম্বর্ধনা জানাতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। এক স্বর্গীয় মহাপুরুষের দর্শন লাভ ঘটল। বিস্ময়ে সেদিন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবার শপথ সেদিন থেকে নিয়েছি। এই লেখাপড়াটা আমার কাছে যেন জ্বর- ছেড়ে গেলেই বাঁচি। যা হোক আপনি আমার শ্রদ্ধেয় আপনজন। মনের কথা আপনার কাছেই খুলে বলার চেষ্টা করি। এসব কথা যেন আর কেউই না জানে। আমার পরিবার-পরিজনরা এর একটি কথা ঘূণাক্ষরেও যেন জানতে না পারে। সব শেষে আপনাদের দোয়া কামনা করি। আপনাদের সবার প্রতি আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। আপনার পত্রের আশায় বসে রইলাম।

খোদা হাফেজ
এম.এ. মালেক

www.icsbook.info

চার.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই আগস্ট, '৬৯

পাক জনাবেষু,
সালাম নেবেন। বহুদিন পর আপনার কাছে চিঠি লিখছি।
আমার পরীক্ষা সামনে, সেপ্টেম্বরে। পড়াশুনা করছি কিছু কিছু। শরীরটা বেশী ভাল যাচ্ছে না। মনটা আরো বেশী খারাপ। পাকিস্তান এক সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। ইসলাম ও ইসলামবিরোধী শক্তির মধ্যে চূড়ান্ত এক সংঘর্ষের প্রচুর সম্ভবনা লক্ষ্য করছি। জানি না কি হবে। খোদা হাফেজ। দোয়া করবেন।
আপনাদের স্নেহের
ম.আ. মালেক
(আবদুল মালেক শাহাদাতের মাত্র দু'দিন পূর্বে জনাব মহিউদ্দীনকে এ পত্রটি লেখেন। এটাই তাঁর শেষ চিঠি।)

পাঁচ.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২১শে সেপ্টেম্বর, '৬৬

প্রিয় বেলাল,
মুসলমানের জিন্দেগী খুবই কঠিন। 'জাহানে নও' হয়ত পড়ে থাকবে। গত ২৯শে আগস্ট মিসরে যারা ইসলামী আন্দোলন করতেন, সেই 'ইখওয়ানুল মুসলিমুনের' তিনজন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব। ১৯৫৪ সালেও এ দলের ছয়জন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মিসরের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ডঃ আবদুল কাদের আওদা। এ সময় সাইয়েদ কুতুবের দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। ইসলামী আন্দোলনে মিসরের মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এবার জয়নাব গাজ্জালী নাম্নী এক মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সাইয়েদ কুতুবের বোন হামিদা কুতুবকে দেয়া হয়েছে দশ বছরের কারাদণ্ড। বেলাল, চিন্তা করতে পার কি এদের কথা? এদের জীবন শহীদের- মুজাহিদের জীবন। মৃত্যুও শহীদের মৃত্যু। এদের অপরাধ ছিল এই যে, এরা মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের অনৈসলামী কাজের সমালোচনা করেছিলেন। আমাদেরকেও ওদের মত হতে হবে। রসূলের পথ এই শাহাদাতেরই পথ। তোমরা তাই জেগে ওঠ। তৈরি হও সেই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য। এই শপথ নাও-
'আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমীনে গালেব করার জন্য আমরা দরকার হলে নিজেদের জান-মাল কোরবান করতেও কুণ্ঠিত হব না।'
বেলাল, তোমরা ছোট এখনও কিছুই জাননা। আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। তাই আমাদের বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। আমার বুকের ব্যথাটা যদি তোমাদেরকে জানাতে পারতাম। ভাই, জিন্দেগীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।

তোমাদের
মালেক ভাই

www.icsbook.info

ছয়.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ই মার্চ, '৬৭

প্রিয় বেলাল,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি, ভাল আছ। তোমার দু'দুটো চিঠি পেয়েছিলাম অনেক দিন আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার উত্তর দিতে পারিনি। শরীর ও মন কোনটাই ভাল যাচ্ছেনা ক'দিন থেকে। অনেক চিন্তা-ভাবনা মাথার ভেতর জট পাকিয়ে আছে। কখনও কখনও মনে হয়, কি করবো লেখাপড়া করে? আবার অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বইটা টেনে নেই। জানি এক অনন্ত কালের বুকে আমার জৈবিক সত্তা বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। আমরা এক সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলেছি- তোমার মত তরুণরা হবে সে পথের যাত্রী। আমরা হবো তার অগ্রপথিক। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা, তুমিও হবে সেই তরুণ মুজাহিদ দলেরই একজন সাথী। হেরার গুহা থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত, তাই হবে তোমার পথের দিশা। খুন রাঙা তলোয়ার হবে তোমার সম্বল।

তোমাদের কথা সব সময়ই মনে পড়ে; কিন্তু সময় করে উঠতে পারি না।

সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে এলে বুঝতে পারতে পাকিস্তানের তরুণ মুজাহিদরা কিভাবে এগিয়ে চলেছে এক সোনালী ঊষার পানে। আট শ'রও বেশী ছাত্রের এ সম্মেলন অনেকের মনেই কঠিন দাগ কেটেছে। মুজাহিদদের দৃপ্ত কণ্ঠের ধ্বনি সেদিন ঢাকার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল। অত্যাচারী অনৈসলামী শক্তির বুক সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তুমি আসবে বলে ক'দিন সকাল-বিকাল অনেক কাজের মাঝেও স্টেশনে খোঁজ নিয়েছিলাম। যাকগে সে সব। এখন কেমন কাজ করছো জানার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল। কারণ কচি-প্রাণ তরুণদের তাজা খুন জাহান্নামের আগুনে পুড়ুক, ভাবতেও যেন কেমন লাগে। ভালভাবে কাজ কর! বইগুলো পড়ার ব্যবস্থা করো। তোমাদের সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা।

ইতি
তোমাদের
মালেক ভাই

সাত.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ই এপ্রিল, '৬৭

প্রিয় বেলাল,

সালাম ও শুভেচ্ছা নিও। বসন্তের এক সোনাঝরা সকালে অনেক, অনেক দূরের একটি কামরার পশ্চিমের জানালা দিয়ে তোমাদের স্মরণ করছি। আমার স্মরণ পথের দিগন্ত রেখায় মুজাহিদ বেশে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। সে কাফেলা গিরি-দরি-বন ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে খাইবারের প্রান্ত থেকে চট্টলার সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত।

তোমার চিঠি পেয়েছি। আগাগোড়া বার কয়েক পড়লাম। পড়ে অনেক কিছু বুঝলাম। পরের চিঠিতে আরো একটু খুলে লিখো। সৃষ্টির আদি থেকে একটি শাশ্বত নিয়মের মত এ সত্য চলে এসেছে যে, যে মহাপুরুষই সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের মন-প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন, নির্মম সমাজ সেই মহাপুরুষকেই কঠিন ও নির্দয়ভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। বিদ্রূপ, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার এই ইতিহাস নতুন কিছু নয়। আরবের বালুকণা ও প্রস্তর কাদের তাজা খুনে রঞ্জিত হয়েছিল? উমর, উসমান, আলী আর হাসান-হোসাইনের জীবননাশের জন্য দায়ী কারা? উমর ইবনে আবদুল আজিজ, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম, কোতায়বা

www.icsbook.info

কাদের ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন? ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখ, রক্তের লাল স্রোত শুধু কারবালায়ই শেষ হয়ে যায়নি, আজও পৃথিবীর বুকে সহস্র কারবালার সৃষ্টি হচ্ছে। আজও মুসলমান ফাঁসির মঞ্চে নিজের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে খোদার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। তোমরা তো পৃথিবী দেখনি। দেখনি মুসলমানের উপর নির্যাতন। শোননি তাদের হাহাকার। যে ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মহামনব নিজের জীবন তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন, যার জন্যে হাজারো মুজাহিদের তপ্ত রক্ত পৃথিবীর মাটি লাল করে দিয়েছে, সেই ইসলামই লাঞ্ছিত হচ্ছে মুসলমানের হাতে।

যাক সে অনেক কথা। নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই। অনেক বাধা, অনেক বিপত্তিই আসবে, কিন্তু তবু আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনই আমাদের শেষ আশা, শেষ ভরসা। আমাদের বিভাগীয় অফিসে যে চিঠি লিখেছিলে, তার জবাব পেয়েছ কি? ওখানে প্রতি মাসেই চিঠি লিখ। আমার শরীর ভাল নয়। দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। খোদা হাফেজ।

তোমাদের
আবদুল মালেক

আট.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ই এপ্রিল, '৬৬

ভাই কামরুল,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমাদের মত সতেজপ্রাণ মুজাহিদদের কথা স্মরণ হলে মনে অনেক আশার সঞ্চার হয়। জানি, যে স্বপ্নে আজ আমরা বিভোর- সেই স্বপ্ন তোমাদেরও, সে স্বপ্ন প্রতিটি মুসলিম নওজোয়ানেরই হওয়া উচিত। আমরা চাই দুনিয়ার বুকে একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে। আমাদের সে কাফেলার তোমরাই হবে নিশানবর্দার। তোমরাই হবে তার সিপাহসালার।

কামরুল, আমি চাইনা- পৃথিবী চায় তোমরা হবে মুমিন, মুসলমানও মুজাহিদ। তোমরাই হবে আদর্শ পুরুষ। পৌঢ়দের দ্বারা কোন বিপ্লব হবে না। আলী খালেদ, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাশিম আর কোতায়বার মত নওজোয়ানরাই কেবল ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। সব বাধাকে তুচ্ছ করে গাঢ় তমসার বুক চিরে যেদিন আমরা পথ করে নিতে পারব- সেদিন আমরা পৌঁছব এ দুর্গম পথের শেষ মঞ্জিলে। আর সেদিনই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেদিন আমাদের চরিত্র হবে হযরত ইউসুফের মত, সেই দিনই- কেবল সেই দিনই আসবে সাফল্য। পড়াশুনা খুব ভাল করে করবে ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। দোয়া করি খোদা তোমার ও তোমাদের সহায় হোন।

তোমাদের
আবদুল মালেক

নয়.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৬শে জুলাই, '৬৭

ভাই বেলাল,

সালাম নিও। ক'দিন আগে তোমার পত্র পেয়েছি; কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি সময়মত। গত ১৬ থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত সংঘের পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হলো। এর

www.icsbook.info

ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটা আমার উপরই ছিল। সেখানে গিয়ে হলো জ্বর। তার জের মেটেনি। ডাক্তার বলেন, প্যারাটাইফয়েড হয়েছে। শরীরটাকে এমনভাবে দুর্বল করে দিয়েছে যে, উঠে দাঁড়াতেও কষ্ট হয়। ক'দিন থেকে ভাতের সাথেও সাক্ষাত নেই। এখন অবশ্য সুস্থ অনেকটা। কিন্তু দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

এতো গেল এক দিক। অন্য দিকে ঢাকা শহর সংঘের সভাপতি সাহেব পরীক্ষার জন্য ছুটি নিয়েছেন। ফলে দায়িত্বের একটি পর্বত প্রমাণ বোঝা আমার মাথায় এসে পড়েছে। আল্লাহ জানেন এ ঝুঁকি কতটা সামলাতে পারব।

সামনে আমার সব কিছুই কেবল শূন্য শূন্য লাগছে। সময় থাকলে একটু বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসতাম। কিন্তু একদিকে দায়িত্বের চাপ, অন্যদিকে ক্লাস পুরোদমে। দোয়া করো আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জান-মাল কোরবাণীর যে শপথ নিয়েছি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে জীবনের বিনিময়ে হলেও যেন তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবানী আর তোমাদের দোয়াই আমার এ দুস্তর পথে আশার আলো।

আল্লাহর কাছে প্রত্যেক নামাজের পরই দোয়া করবে। আল্লাহ তোমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলুন, কামনা করি।

(শহীদ আবদুল মালেক এ পত্রের শেষে নিজের নাম লিখেন নি)

দশ.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩১শে মে, ১৯৬৯

প্রিয় বেলাল,

সালাম নিও। কেমন আছ জানিনা। তবে প্রবাসীরা সব সময়ই তাদের আপনজনদের কল্যাণ কামনা নিয়ে বেঁচে থাকে। তোমাদের জন্যে সেই কামনা আমিও করছি। আশা করি, সবাই ভাল আছ। মনের অবস্থাটা খুব বেশী ভাল নয়। এ কথাটা কাউকে বলতেও পারছিনা। বিরাট এক আন্দোলনের নগণ্য এক কর্মী আমি। ঢাকা ইসলামী ছাত্রসংঘের মত বিরাট সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব আমায় হাঁপিয়ে তুলেছে। সবাই কর্মী আর এই কর্মীদের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধেই চেপেছে। তাই মন খারাপ থাকলেও কর্মীদের সামনে জোর করে হাসতে হয়। শরীর খারাপ থাকলেও জোর করে বাইরে বেরুতে হয়। কারণ, আল্লাহর দ্বীনের এ আন্দোলনের সামান্যতম ক্ষতি হোক, এটা চিন্তা করাও মুশকিল। যখন একা থাকি, তখনই যত রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় জট পাকায়। জীবনের এক কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে। গত ক'দিন আগে করাচী গিয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মীদের সাথে তৃতীয় বারের মত মোলাকাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। ভালই ছিলাম। কিন্তু আরব সাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে এক নতুন উপলব্ধি জেগেছিল। নয়া উপলব্ধি জেগেছিল- যখন সিন্ধুর উঁচু-নিচু পথ বেয়ে আমাদের গাড়িটি ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম এমনিভাবে যদি অনন্তকাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতাম। এমনি ভাবেই যদি চলতে পারতাম অনন্তকাল ধরে।

পৃথিবীর বুক থেকে বত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠে নীচে তাকিয়ে ছিলাম। ঘর-বাড়িগুলোকে খেলাঘরের মত দেখাচ্ছিল। বিরাট কলকাতা শহরটিকে একটি ছোট্ট বাজারের মত মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, আকাশের নিঃসীম নীলিমায় এমনিভাবে যদি উড়ে যেতে পারতাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি যে কত সুন্দর, তা মেঘের রাজ্যে না গেলে বোঝা যায় না; সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে বিকেলের রৌদ্রচ্ছটা না দেখলে অনুমান করা যায় না।

অনেক বড় চিঠি লিখলাম। মনটা বেশী সুস্থ নেই বলেই তোমার সাথে এত কথা বলে মন হালকা

www.icsbook.info

করার প্রয়াস। তোমার একটি পত্র পেয়েছিলাম; কিন্তু পত্রটা আমার হাতে পৌঁছতে একমাস সময় লেগেছিল। উত্তর দেইনি, কারণ তুমি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা কেমন হল জানিও। কোরবানীতে বাড়ি গিয়েছিলাম। তোমাদের সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। যাইনি কোথাও। বাড়িতে দু'দিন থেকে ঢাকা চলে এসেছি। ফেরার সময় তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি সালাম জানিয়ে এসেছিলাম। তুমি যদি জানতে বেদনার কতবড় পাথর বুকে চেপে কাটছে আমার প্রতিটি মুহূর্ত! আমি জানি না, আমার জীবনতরীর খেয়াঘাট কোথায়। তবুও চলতে হবে। সংগ্রামের জিন্দেগী- মঞ্জিল তো অনেক দূরে। কুরআন ডাকে, 'সেই পথে তীব্র গতিতে ছুটে চল।' তোমার বাড়ির সবাইকে সালাম দিও। তোমার পত্র পাওয়ার আশায় বসে রইলাম।

তোমার ভাই
আবদুল মালেক

এগারো.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮শে জুন, '৬৯

প্রিয় বেলাল,

সালাম ও শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন হলো তোমার চিঠি পেয়েছি। জবাব দিতে বেশ দেরী হয়ে গেল। আশা করি, মনে কিছু নেবে না। অনেক কথা লিখেছো, সেগুলোর জবাব আমার কাছে নেই। আর থাকলেও দেয়াটাকে সমীচীন মনে করি না। একথা বুঝে নেয়া দরকার, মানুষের জীবন অনেক জোয়ার-ভাটা আর পাওয়া না-পাওয়ার সমষ্টি। যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব কবুল করে নিয়েছে, তার দেয়া আইন ও কানুন ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন আইন যে মানে না, এক কথায় যে আল্লাহতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে, তার মনে দুনিয়ার কোন ব্যথা-বেদনাই অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না। নবী, রসূল ও সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগীতে এ সত্যেরই মহাপ্রকাশ ঘটেছে।

আজ ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাবার সময় কোথায়? তবুও ক্লান্ত মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে হয়। শৈশবের আরো অনেক বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই স্মৃতির পাতায় দোলা দিয়ে যায়। জিন্দেগীর চূড়ান্ত মাক্সাদ হিসেবে আমি ইসলামী আন্দোলনকেই কবুল করে নিয়েছি। বস্তুত এ ছিল আমার ঈমানেরই দাবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে এ কথাই ঘোষণা করেছেন, 'রসূলকে আমি পাঠিয়েছি হেদায়েত ও সত্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা দিয়ে এজন্য যে, তাকে সমস্ত দ্বীন বা জীবন বিধানের উপর চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করতে হবে।'

আজ একথা আমার অন্তরে উচ্চারিত হচ্ছে, কেবল নফল ইবাদত আর তসবীহ পড়ে ঐ তসবীহ্‌র দানার উপর ইসলাম কায়েম হবে না।

অনেক কথা বলা হয়ে গেল। দু'দিন পরে কলেজে আসবে। তাই জীবনের মাক্সাদ আর একবার স্মরণ করে নেয়া দরকার। তোমার আমার মত হাজারো তরুণ আজ ইসলামের জন্য জান দিতে প্রস্তুত। তাদের প্রাণে সমাজ ও পরিবারের ছোট-খাট ব্যথা-বেদনা অনুভব করার সময় কোথায়? আমার বিশ্বাস, জিন্দেগীর সে মঞ্জিলের দিকে তাকিয়েই সবকিছু ভুলে যাবে। সবাইকে সালাম বলো। খোদা হাফেজ।

তোমার ভাই
আবদুল মালেক

www.icsbook.info

এপার থেকে ওপারে

ফজুলল হক হল, ঢাকা
২৪.৮.৬৯

মালেক ভাই,

জানি, তুমি আজ যে জগতে স্থান পেয়েছ তা এ পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলের অনেক উর্দ্ধে- সত্য আর অসত্যের যে সংগ্রামে তুমি ছিলে এক অতন্দ্র প্রহরী। আজ সে সংগ্রামের পথে আত্মদানের পর তুমি নিষ্কৃতি পেয়েছ, দুর্গম যে পথের নির্ভীক যাত্রী হিসেবে স্রষ্টার স্বীকৃতি নিয়ে তারই রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছ- যেখানে সত্য, সুন্দর আর শান্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে রিবাজমান, জানিনা যে কর্মব্যস্ততায় ছিল তোমার নিবিড় আসক্তি- যে নিরলস সাধনা ছিল তোমার জীবনের বৈশিষ্ট্য- তাকে কেমন করে এখন ঘুমিয়ে রেখেছ। অবশ্য যারা ছিল তোমার যাত্রাপথের আলোকবর্তিকা- সেই তরুণ মুজাহিদরা, যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে সত্যের মশালকে জ্বালিয়ে গেছেন, আজ তাদের সাথেই হয়েছে তোমার সাক্ষাত, তারাই আজ তোমার সহচর। জানো, হিংসে হয় আমার, আমাদেরকে তুমি দিচ্ছ ব্যথা কিন্তু নিজে আজ আনন্দিত হয়েছ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকে লাভ করে।

তোমার মনে আছে কিনা জানি না, তবে আমার স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সেই দৃশ্যটি, জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে যেদিন তোমায় বিদায় দিতে দাঁড়িয়েছিলাম যমুনা তীরে, লঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি হাত নাড়ছিলে আর আমি তার জওয়াব দিচ্ছিলাম। যমুনার উত্তাল তরঙ্গ তোমায় ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল। যতক্ষণ পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিলাম ততক্ষণ এবং তারপরেও আমাদের পারস্পরিক হাত উঠিয়ে বিদায় নেওয়ার পালা চলছিল। কিন্তু যখন তুমি দিগন্তের কোলে মিলিয়ে গেলে তখন আমার দু'চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়েছিল। কেন যে হঠাৎ মনে হয়েছিল, একদিন এমনি করেই চলে যাবে স্রষ্টার মহান সান্নিধ্যে, আর আমি বঞ্চিত, হতভাগ্য হয়ে তোমায় শুধু বিদায় জানাব। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ যমুনার সে ব্যবধানের মতই বিরাজ করবে এক বিশাল ব্যবধান তোমার আমার মাঝে। সেদিন কেন হঠাৎ করে এমনি একটি চিন্তা এসে মগজে ঠাঁই পেয়েছিল বুঝতে পারিনি, আজ স্পষ্টই বুঝতে পারছি।

www.icsbook.info

মালেক ভাই, তোমার মনে আছে কি, রাত তখন তিনটের মত হবে। হলে আমার রুমে এসে তুমি মৃদু টোঁকা দিলে আমার দরজায়। ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। এরপর পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী দু'জনে Poster আর আঠা নিয়ে বের হয়েছিলাম। দারোয়ানের ঘুম ভাঙ্গলে ওর কষ্ট হয় সেজন্য অতবড় লোহার কলাপসিবল গেটটা টপকিয়ে পার হলাম দু'জনে। কার্জন হল, ঢাকা হল আর আমাদের হলে Poster লাগিয়ে হেঁটে চললাম এস.এম হলের দিকে। এস.এম হলের সামনের পলাশ গাছগুলোর পাতার ফাঁকে ফাঁকে রাতের আকাশে আমাদের একমাত্র সহচর চাঁদখানা যখন উঁকি দিচ্ছিল তখন তুমি বলছিলে যে কিভাবে মিশরের বুকে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদেরকে এক এক করে ফাঁসির মঞ্চে চড়ানো হয়েছে, কিভাবে শহীদ সাইয়েদ কুতুব, তার ভাই শহীদ মুহাম্মদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব একে একে ইসলামের জন্য ফাঁসির মঞ্চ আর কারাগারের নির্যাতনকে বেছে নিয়েছিল। কিভাবে তাদের পরিবারের ছোট ১০ বছরের বালক পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে কায়রো নগরীর পথে পথে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার মানসে দেয়ালে দেয়ালে Poster লাগাত। তোমার দরদভরা কণ্ঠে যেন শুনতে পেয়েছিলাম তাদের কণ্ঠধ্বনি, পথ চলতে চলতে সমস্ত শরীরের পশমগুলো সব কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। শপথ গ্রহণ করছিলাম সেদিন আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে, আমিও সেই পথে এগিয়ে যাব। রাতের নীরবতার মাঝে ঢাকা নগরীর ঘুমিয়ে পড়া রূপ দেখে, বিশাল নীল আকাশের বুকে জ্যোৎস্নার মায়াভরা আলোর খেলা দেখে, আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা দূর দূরান্তের সবুজ গাছগুলো দেখে কেমন যেন মনে হয়েছিল, সত্যি এ পৃথিবীটা বড় সুন্দর! আল্লাহর দেওয়া এ সুন্দর পৃথিবীতে তাঁরই দেওয়া জীবন বিধানই মানুষকে শান্তির সন্ধান দিতে পারে।

১৯৬৭ সালের একটি রাত্রি। তুমি বাড়ির পথে। ষ্টেশনে গিয়েছিলাম তোমায় বিদায় দিতে। মৃদু আপত্তি তুলেছিলে 'কি দরকার মঞ্জুর ভাই, কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন, আমি তো একাই যেতে পারব।' তোমার সেই মৃদু আপত্তিকে উপেক্ষা করেই সেদিন তোমার সাথে রওনা হয়েছিলাম। ট্রেনটা লেট করছিল, প্লাটফর্মের ধার দিয়ে হাঁটছিলাম। ছিন্নমূল কতগুলো পরিবার দিনের বেলায় যারা দু'মুঠো অন্নের তাগিদে আশ্রয় নেয় রাজধানীর কোলাহলময় পথের ধারে ধারে আর রাতে বিশ্রাম নেবার জন্য এসে উপস্থিত হয় রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে। তাদের ঘুমন্ত অবয়বগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তুমি বলেছিলে 'মঞ্জু ভাই, এদের কথা ভাবলে আমার আর দেরী সয় না। আর কতদিন এই বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে বাকী, যে ইসলামে হযরত উমরের মত খলিফা রাতের অন্ধকারে বেড়াতেন, নিজের কাঁধে ময়দার বস্তা নিয়ে বুভুক্ষুর গৃহে পৌঁছিয়ে দিতেন, যিনি অকপটে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার খিলাফতের অধীন সাধারণ মানুষ যা খেতে পায় না, আমার জন্যে তা হারাম। ঐ ফোরাতের কিনারে একটি কুকুরও যদি আজ অভুক্ত থাকে, তার জন্যে আমাকে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে।' আজ সে ইসলামকে তার সমস্ত সংবেদনশীলতাকে হারিয়ে মসজিদের তসবিহ্ টেপার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখার এক অশুভ চক্রান্ত গ্রাস করেছে।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আজ মুসলিম যুবকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখার মন্ত্রকে তারা স্বাগত জানাচ্ছে, অথচ ইসলাম তথা স্রষ্টার দেওয়া সর্বশেষ একমাত্র জীবনবিধান এসেছিল মানুষকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, গোলামী থেকে মুক্ত করে একটি সুখী সমাজ-রাষ্ট্র তথা গোটা মানবজাতির সৃষ্টির মহান মানসে। এ দ্বিমুখী চক্রান্তের ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি মুসলিম মিল্লাতের এ শোচনীয় অবস্থা, তুমি বলেছিলে, 'জানেন মঞ্জু ভাই, আজও পৃথিবীতে আমাদের এক বিরাট শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, এ ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদের, আমরা যারা তরুণ তাদের উপরই এ দায়িত্ব। নিপীড়িত বঞ্চিত জনতা আজ তাকিয়ে আছে আমাদেরই মুখপানে। তাদের বুকের ব্যথা-

এপার থেকে ওপারে www.icsbook.info

বেদনাকে আজ ভাষা দিতে হবে আমাদেরকেই। কিন্তু জানেন আমাদের শত্রুরা সাম্রাজ্যবাদের মরণ কামড় আজও হানছে সমানভাবেই। তাইতো দেখি, যাদেরকে দিয়ে আমরা গড়তে পারতাম এক নতুন পৃথিবী, সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত মানবতাকে যারা শান্তির আর মুক্তির পথ দেখাতে পারত, তারাই আজ বিদেশী শক্তির প্রবঞ্চনার জালে আটকে গেছে।

হলিউডের উগ্র নগ্নবাদ তাদেরকে কামনার লেলিহান শিখায় আত্মাহুতি দিতে ডাকছে, বস্তুবাদের চরম শিখরে উঠে ভোগের পেয়ালায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছে এরা। জানেন মালেক ভাই, একটি নিষ্পাপ শিশুকে দেখে আমার চোখে পানি আসে। আজকের এ নিষ্পাপ শিশু এ প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়বে ফাঁদে, তার নিষ্পাপ এ প্রাণ-মন সব কিছুই ধীরে ধীরে বিদায় নিবে, এ যেন অসহ্য লাগে আমার কাছে। এ পরিবেশ থেকে, এর করাল গ্রাস থেকে ভাবীকালের শিশুদেরকে মুক্তি দিতে হবে, তৈরি করতে হবে এমন একটি নির্মল স্বচ্ছ পারিপার্শ্বিকতা, যা অনাদিকালের মানুষকে দিবে সত্যিকারের মানুষ হবার সার্থক প্রেরণা। আমরা গুটিকয়েক তরুণ যারা বিশ্বস্রষ্টার মহান কৃপায় হারিয়ে যাইনি এ সর্ববিধ্বংসী স্রোতধারায়, তাদেরকে তৈরি করতে হবে এক নতুন আবর্ত।

রাত সাড়ে এগারোটায় তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসলাম। হলে এসে সহজে ঘুমাতে পারিনি। থেকে থেকে তোমার কথাগুলোই ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মস্তিষ্কের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করে তুমি আজ বাকী দায়িত্বটুকু আমাদের কাঁধে অর্পণ করে বিদায় নিয়েছ। জানি তোমার এ শূন্যস্থানটি পূরণ করা আমাদের কারো একার পক্ষে সম্ভব হবে না, তবে তোমার বিদায়ের সাথে সাথে খাইবার থেকে চট্টলা পর্যন্ত আজ হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে শহীদের জয়গান। তারা আজ শপথ নিয়েছে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে এ পাকভূমিতে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান কায়েম করবেই করবে। দুনিয়ার কোন শক্তিই আজ এ কাফেলাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যপথে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে না, অন্যায় আর অসত্যের ধ্বজাধারীরা আজ প্রমাদ গুণছে, তারা মরণ কামড়ের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে শেষ চেষ্টার পায়তারা করছে, কিন্তু আল কুরআনের ভাষায়, 'সত্য এসেছে, অসত্য বিদায় নিচ্ছে, নিশ্চয়ই অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।' আজ তাই চোখের পানি মুছে ফেলে তোমার ফেলে যাওয়া কাজগুলোকে সমাধা করার দৃপ্ত শপথ নিয়েছি, ওপার থেকে আশীর্বাদ করো যেন এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিন্দুমাত্র ভুলও না করে বসি। অবশ্য অসত্য আর অন্যায়ের ভগ্নস্তূপে যেদিন সত্যের আর শান্তির পতাকা উড্ডীন করব, নীল আকাশের নীচে যেদিন তা পত-পত করে উড়বে, সেদিন দু'চোখে হয়তো বা বাষ্পায়িত অশ্রুর মাঝে স্মরণ করব তোমায়।

আর বিশেষ কি লিখব, ধূলি ধূসরিত এ ধরণীর বুকে মানুষ যেদিন থেকে পদার্পন করেছিল, তার পর থেকে যে অগণিত নির্ভীক সেনানী স্রষ্টার দেওয়া সত্য আর ন্যায়ের পতাকাকে এ ধরণীতে উড্ডীন করতে গিয়ে জালেমদের হাতে শাহাদাতের রক্তরাঙা পথে বিদায় নিয়েছে, তাদের প্রতি রইল সংগ্রামী কাফেলার পক্ষ থেকে সালাম।

তোমারই স্নেহের

মঞ্জুর ভাই

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের

মায়ের কামনা

আমার পুত্রতুল্য ইসলামী ছাত্রসংঘের তরুণ সদস্যরা, আমার আন্তরিক দোয়া জেনো। জানতে পেলাম, তোমাদের ভাই, শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতি 'স্মারক' বের করতে যাচ্ছ। তোমাদের এ উদ্যোগ প্রসংশনীয়।

দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ও নাম-যশের কোন লালসাই শহীদ মালেকের ছিল না। আল্লাহর দ্বীন দুনিয়ায় বুলন্দ করা তার জীবনের লক্ষ্য বস্তু ছিল। এজন্য দরকারবোধে জান-মাল হাসিমুখে কোরবান করতে সে প্রস্তুত ছিল। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সে শক্তি দিন এবং শহীদের অসমাপ্ত কাজ তোমাদের দ্বারা পূর্ণ করে নিন।

আমার স্নেহের দুলাল মুহাম্মদ আবদুল মালেক তোমাদের মধ্যে আর নেই। আছে তার আদর্শটুকু। শহীদ হয়ে সে যে আদর্শ রেখে গেল, বিশ্বের বুকে তোমরা সেই আদর্শই অনুসরণ করে তোমাদের কর্তব্যের পথে এগিয়ে চলো। আমার এক আবদুল মালেক গেছে, তোমরা শত শত হাজার হাজার আবদুল মালেক রয়েছ। আবদুল মালেকের মত তোমরাও যেন হতে পার। দোয়া করি তোমাদের এ মায়ের মুখকে তোমরা উজ্জ্বল রেখো। আমি দেখতে চাই ইসলামী শিক্ষানীতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ডিগ্রি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হতে। এটা শুধু তোমাদের কাছে নয়, সরকারের কাছেও আমার আবেদন। হায় আফসোস! আজ পর্যন্তও সরকারকে দেখলাম না আমার পুত্র হত্যার কোন বিচার করতে, দেখলাম না তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবার পথে পা বাড়াতে। এটা কি ইসলামী রাষ্ট্র নয়? এই রাষ্ট্রে কি ইসলামের নাম নিলেই আমার পুত্রের মত অবস্থা হবে? আমি দোয়া করি, তোমাদেরকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি, বাছারা, তোমরাই আমার ছেলে, তোমরাই আমার আবদুল মালেক, আবদুল মালেকের মতই হও, আবদুল মালেকের উদ্দেশ্য সফল করো। আমীন।

তোমাদের আশীর্বাদিকা

ছাবিরুন নেছা

(আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদত স্মরণে প্রথম স্মারক গ্রন্থে শহীদের মায়ের বাণী। বর্তমানে তিনি জান্নাতবাসী)

www.icsbook.info

স্মৃতিচারণ

www.icsbook.info

স্মৃতিচারণ

আমার প্রিয় সাথী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

আপনি আবদুল মালেক?

হ্যাঁ তাই, আপনি নিজামী ভাই? সেদিনের সে কথাগুলো ডায়েরীর পাতায় লেখা না হলেও আমার মনের কোণে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গণে যখন আমরা মাত্র ক'জন কর্মী কাজ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেতাম তখন মফস্বল থেকে আমাদের বেশ কিছু কর্মী ঢাকায় আসছে দেখে আমরা সবাই আনন্দিত হয়েছি। আবদুল মালেক, নূরুল ইসলাম, আজিজ, ইসকান্দার ও মামুন সহ আরো অনেকে পরীক্ষায় ভাল করায় আমরা বেশ উৎসাহিত হয়েছি। আজিজ ছাড়া আর সবাই ঢাকায় আসবে এ সংবাদ পেয়ে আমরা প্রতীক্ষা করছি। ভর্তির সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আবদুল মালেক ছাড়া আমাদের সম্ভাব্য কর্মীদের সবাই এসে গেছে। আবদুল মালেকের অপেক্ষায় আমার মনটা বেশ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। রাজশাহী, বগুড়া অঞ্চলের কোন ছাত্রের সাথে দেখা হলেই ওর কথা জিজ্ঞেস করছি। আসবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত খবর পেয়েছি। দেরির কারণ জানা যাচ্ছে না। অস্থিরতা বেড়েই চলছে। সেদিনের সংগঠনের দুরবস্থা, কর্মীর স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে নতুনদের প্রতীক্ষায় আমাদের হৃদয় মন সঙ্গত কারণেই ব্যাকুল হয়ে

www.icsbook.info

উঠত। যতদূর মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মুহূর্তে নতুন ছাত্র এবং মফস্বল থেকে আগত কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কর্মী ছিল মাত্র দু'জন। অন্যদিকে সংগঠনটা সবেমাত্র গুছিয়ে উঠার পথে। তখন নাজির ভাই কর্মজীবনে পদার্পণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পূর্ব-পাক দফতরে তখন আমরা মাত্র দু'জনে কাজ চালাতাম, নাজেম এবং অফিস সেক্রেটারী। কর্মীর স্বল্পতার কারণে পূর্ব-পাক দফতরের দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে আমাকে ঢাকা শহরের কর্মী হিসেবেও কাজ করতে হচ্ছে। এমন সময় নূরুদ্দীন ভাইও ঢাকা শহর শাখার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কর্মীর স্বল্পতা ও নেতৃত্বের শূন্যতার এই মুহূর্তে একযোগে এতগুলো কর্মীর ঢাকা আগমনে আমরা মনে প্রাণে যে আনন্দ অনুভব করেছি তা কেবল উপলব্ধিই করা যায়, ভাষায় রূপ দেয়া যায় না।

তখন পূর্ব-পাক দফতর ছিল জয়কালী মন্দির রোডে। আমি ফজর পড়ে অফিসে যেতাম। অফিস থেকে ইকবাল হল পর্যন্ত আসা-যাওয়ার পথে ফজলুল হক হল, এস.এম হল ও শহর অফিসে দায়িত্বশীল কর্মীদের সাথে সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা হয়ে যেতো। ঢাকা শহরের কর্মী হিসেবে এর চেয়ে বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। নতুন সেশনে নতুনদের সাথে যোগাযোগের জন্য তবুও দৌড়াতে হচ্ছে। কলাভবন থেকে বিজ্ঞান ভবন, বিজ্ঞান ভবন থেকে কলাভবন, কখনো আবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেদিন পূর্ব-পাক দফতরের কাজ সেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো বিল্ডিং পেরিয়ে রেজিস্টার অফিসের পাশ দিয়ে ইকবাল হলে ফিরছি, বেলা তখন ১টা দেড়টা হবে বলেই মনে পড়ে। এই পর্যন্ত সব সময়ই আবদুল মালেকের কথাই মনে করে আসছি। হঠাৎ চার-পাঁচজন ছাত্রের এক গ্রুপ রেজিস্টার অফিস থেকে বেরিয়ে ওরা পুরাতন পরিষদ ভবনের গেটের পাশে এসে দাঁড়াতেই অকৃত্রিম আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে সালাম ও কোলাকুলির মাধ্যমে যে তরুণ মর্দে মুমিনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়, আবদুল মালেক শহীদ তার নাম। মুসলিম জাহানের অমূল্য রতন ভাগ্যবান এই তরুণের পূর্ণ পরিচয় লাভ করার মত দিব্য দৃষ্টি আমার ছিল না। তথাপি সততার উজ্জ্বল প্রতীক আবদুল মালেকের মুখ পানে চেয়ে সেদিন আমার মনে বিরাট আশা জেগেছিল। সংগঠনের সেই দুর্দিনে আবদুল মালেকের প্রথম দর্শনে জীবনের সকল ক্লান্তি যেন আমি ভুলে গেলাম। সংগঠনের যে শূন্যতা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলত আবদুল মালেকের প্রতিভাদীপ্ত চেহারা দেখে সে শূন্যতা পূরণের আশা জেগেছিল কি না তা বলতে পারব না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাস রীতিমত শুরু হয়েছে। আমাদের নবাগত কর্মীরা ক্লাসের সাথে সংঘের কাজেও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছে। সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধের মহূর্তে সংঘের কর্মী সমর্থক এমনকি সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও ইসলামী জোশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় সারওয়ার ভাই ও একরাম ভাই ঢাকায় এলেন। প্রদেশব্যাপী কাজকে ছড়িয়ে দেয়ার এক সুন্দর সুযোগ এল। এখন ঢাকায় কর্মীর অভাব অনেকটা দূর হয়েছে। অন্যদিকে প্রদেশব্যাপী কাজ বৃদ্ধির চাপ বেড়ে চলছে। সুতরাং ঢাকা শহরের কর্মী হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলাম। এবার পূর্ব-পাক দফতরে পুরোমাত্রায় অফিসিয়াল কাজে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে। তাই ঢাকায় থেকেও ঢাকার কর্মীদের সাথে সরাসরি পরিচয়ের খুব সুযোগ হচ্ছে না। শহর সভাপতির মাধ্যমেই নবাগত কর্মীদের তৎপরতা ও অগ্রগতি জানার চেষ্টা করছি। আবদুল মালেক একজন নীরব কর্মী, অনেকের কাছ থেকে তা জানা যাচ্ছে। এখন থেকে ঢাকার বৈঠকগুলোতে যোগদানের সুযোগ হচ্ছে না। মাঝে মধ্যে বড় কষ্টে সময় করে নিচ্ছি। এক বৈঠকে 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' এই বিষয়ের উপর আবদুল মালেকের বক্তৃতা শুনলাম। একজন নতুন কর্মীর কাছ থেকে এ কঠিন বিষয়ে এমন সুন্দর বক্তৃতা আমার জন্য ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্ত ছাড়া আবদুল মালেকের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হচ্ছে না। কারণ, বিনা প্রয়োজনে

www.icsbook.info

উর্ধতন সংগঠনের লোকদের সাথে আলাপের মাধ্যমে নিজের প্রদর্শন করা ছিল তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ।

মাত্র তিন মাসের মধ্যে আবদুল মালেক একজন দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য কর্মী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। এখন তিনি ঢাকা শহর শাখার অফিস সম্পাদক। অতি অল্পদিনে শহর শাখার অফিসের চেহারা পাল্টে গেছে। শাখা ও প্রশাখার কার্যক্রমের সুষ্ঠু রেকর্ড যেমন খাতাপত্রে সুরক্ষিত হচ্ছে, তেমনি তা সুরক্ষিত হচ্ছে আবদুল মালেকের মনে-মগজে। আবদুল মালেকের সহযোগিতায় ঢাকা শহর শাখার পর পর তিনজন সভাপতি যত সহজে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন তেমন আরামে এ গুরুদায়িত্ব পালনের সুযোগ কোনদিন কেউ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই।

সত্যিই অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী হয়েও আবদুল মালেক একজন নীরব কর্মী। যশ ও খ্যাতির বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না তাঁর মনে। নিজের যোগ্যতা প্রতিভাকে লুকিয়ে রেখে নীরবে কেবল কাজ করে যাওয়াতেই ছিল তাঁর তৃপ্তি। জিঞ্জিরায় সংঘের শিক্ষা শিবির হচ্ছে। রমজান মাসে দেড় শতাধিক কর্মীদের সে শিবিরে ব্যবস্থাপনা করতে হচ্ছে ঢাকার কর্মীদেরকে। আবদুল মালেককে খাদ্য ও পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে হচ্ছে। কাজের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে সে কেবল শারীরিক পরিশ্রমই করতে জানে। হঠাৎ কর্মীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সে ভুল ভেঙ্গে গেল। প্রদেশব্যাপী কর্মীদের এই প্রতিযোগিতায় আবদুল মালেক তৃতীয় স্থান দখল করল। এরপর ইনকিলাবের যুগ। সংঘের পক্ষ থেকে সাহিত্য সংকলন বের করা হবে। কিন্তু লেখক কোথায়? সারওয়ার ভাই অত্যন্ত পেরেশান হয়ে ফিরছিলেন। অনেক কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে চাপ দিয়ে চিঠি লিখেছি। লেখা সময় মত আসছে না। অথচ সংকলনটা সময়মত তাড়াতাড়ি বের করতেই হবে। আমি অফিসের ঝামেলা সেরে বেশ একটু সকালেই হলে ফিরছি। হঠাৎ সারওয়ার ভাই বেশ উৎফুল্ল মনে আমার কামরায় গিয়ে হাজির হন। মালেক ও মামুনের দুটো লেখা পেয়ে তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা প্রকাশ করার জন্যে আমার কামরায় গিয়েছিলেন কিনা বলতে পারি না। তবে সেদিনের আলোচনায় লেখা দুটোর প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্থান পায়নি। এভাবেই একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিভার প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকে। আলোচনার ফাঁকে একদিন হঠাৎ কে যেন মন্তব্য করল আবদুল মালেক কিছুটা নিরাশাবাদী। কাজ করা দরকার করতে হবে, কিন্তু এ আন্দোলনের সাফল্য এ যুগে কি করে সম্ভব? এমন চিন্তা নাকি সে মাঝে মাঝে করে থাকে। মূল ব্যাপারটা জানার সিদ্ধান্ত নিলাম। হল সংসদের নির্বাচনের পর মুহূর্তটাই এজন্যে সর্বোত্তম সময় হওয়ার কথা। নির্বাচনী ফলাফলকে সামনে রেখে আবদুল মালেক তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলাপ করছে। ঘটনাক্রমে আমার কানে একটি দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত আওয়াজ ভেসে এল Shangha will rise surely rise. আসলে মালেক ভাইয়ের কথাগুলো হতো সুষ্ঠু ও বাস্তব ভিত্তিক। সুতরাং তাঁকে যাচাই করতে গিয়ে যারা তাড়াহুড়া করে মন্তব্য করেছেন তারা তাঁকে বুঝেই উঠতে পারেন নি। হ্যাঁ, আবদুল মালেক সহজে ধরা দেবার ছেলে ছিল না। তাই তাকে বুঝতে হলে গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হত, নতুবা অতি নিকটে এসে তার সহচার্য লাভ করতে হত।

ইসলামী আন্দোলনের একজন উদীয়মান কর্মী হিসেবে তাঁর মন ছিল মানবতার দরদে ভরপুর। দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অবস্থা জানাও ছিল তাঁর অন্যতম কার্যসূচী। ঈদুল আযহা উপলক্ষে কর্মীরা বাড়ি যাচ্ছে। রাতের ট্রেনে আবদুল মালেক বাড়ি যাবে শুনেছি। দু'এক দিনের মধ্যে দেখা হয়নি। সময় মত ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। আবদুল মালেককে খুঁজে পেতে বেশ সময় লেগেছে। কারণ সে মধ্যম শ্রেণীতে উঠেনি। আমাকে দেখে সে বেশ অপ্রস্তুত হল। আমার ষ্টেশনে যাওয়া তার কাছে কেমন যেন লেগেছে। বেশ একটু জড়সড় হয়ে বলতে লাগল, 'আপনি ষ্টেশনে আসবেন জানলে আমি যে করেই হোক দেখা করেই আসতাম। অবশ্য একবার খোঁজ

www.icsbook.info

করেছি, আপনাকে পাইনি।' আমি কথাগুলোর দিকে কান না দিয়ে কামরাটার দিকে ভাল করে দেখছিলাম। তিল ধারণের জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে সারারাত। আমি চেষ্টা করলাম ইন্টারে জায়গা করে দেয়ার। টিকিটের ঝামেলাও চুকিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু রাজী করা সম্ভব হল না। আবদুল মালেক অকপটে বলে ফেলল 'এই লোকগুলোর সাথে আলাপ করলে আমার ভাল লাগবে'। তখনো বুঝতে পারিনি কত মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে এই কথাগুলো শুনেছি।

বছর শেষ না হতেই আবদুল মালেক সংঘের সদস্যপদ (রুকন) লাভ করল। এখন সে সংঘের প্রথম কাতারের কর্মীদের একজন। এত দ্রুত যারা অগ্রসর হয় তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত তাল সামলাতে পারে না। কিন্তু আমরা আবদুল মালেকের মধ্যে এর বিন্দুমাত্র ছাপ লক্ষ্য করিনি। ইতিমধ্যে আবদুল মালেক আন্দোলন ও সংগঠনকে বুঝার দিক দিয়ে অনেকের চেয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর অধীনে কাজ করতে আবদুল মালেকের মনে মোটেই সঙ্কোচ নেই। আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এ আদর্শ সংঘকর্মীদের জন্যে একটি স্থায়ী উদাহরণ।

এ পর্যন্ত আবদুল মালেককে নিকট থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। ১৯৬৫-৬৬ সেশন শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র এক মাস পরেই নতুন সেশন শুরু হবে। মুজিবের অনার্স এবং হাফিজুল্লাহ্ ভাইয়ের ফাইনাল পরীক্ষা। ঢাকা শহর শাখার কাজ তদারকের জন্য পূর্ব-পাক দফতরেও তখন সারওয়ার ভাই, একরাম ভাই পরীক্ষার্থী। এক মাসের জন্য আমাকে ঢাকার কাজ দেখা-শুনা করতে হবে। মনে করলাম দিনে ঢাকার কাজ দেখাশুনা করে রাত জেগে পূর্ব-পাক দফতরের কাজ সারতে হবে। কিন্তু আবদুল মালেকের সহযোগিতায় আমাকে বেগ পেতে হয়নি মোটেই। সারাদিনের পরিবর্তে একঘন্টা দু'ঘন্টা সময় দিয়ে আমি বেঁচে গেছি। নিজ হাতে তেমন কিছুই আমাকে করতে হয়নি। সামান্য কিছু বুঝিয়ে দিয়েই আমি পূর্ব-পাক দফতরে যথারীতি আমার কাজ করেছি। আবদুল মালেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও কর্মকুশলতায় প্রতিটি কাজই হয়ে যেতো। দায়িত্বানুভূতি ও স্বতস্ফূর্ততা ছিল আবদুল মালেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও অদ্ভুত কর্মকুশলতায় প্রতিটি কাজই হয়ে যেতো। দায়িত্বানুভূতি ও স্বতস্ফূর্ততা ছিল আবদুল মালেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে একদিন ঢাকায় প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেল। আগামসি লেনস্থ সংঘের পূর্ব-পাক দফতর থেকে বেরোবার উপায় ছিল না আমাদের। বস্তির লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন কলাভবন, হোসেনী দালান ও সিটি 'ল' কলেজে আশ্রয় নিয়েছে। আমি কোন মতে ফজলুল হক হলে গেলাম। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা কি করতে পারি সে সম্পর্কে পরামর্শ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে কথা উঠার আগেই আবদুল মালেকের মুখে খবর পেলাম ঢাকা শহর অফিসে পানি উঠেছে। বৃষ্টি একটু থেমে যেতে সে অফিসে গিয়ে সব দেখে এসেছে। অধিক পানি উঠায় কাগজ-পত্রাদি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবদুল মালেক এগুলো সব ঠিকঠাক করে এসেছে। তাঁর দায়িত্ব সচেতনতার এ চাক্ষুষ প্রমাণটুকু আমার পক্ষে কোনদিনই ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর কর্মী বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন নিউমার্কেট ও আরেক দিন জিন্নাহ্ এ্যাভিনিউতে রোড কালেকশন করা হল। অল্প সময়ে কর্মীদেরকে জমায়েত করে এত বড় কাজ আঞ্জাম দেয়ার মত আর কোন কর্মীই ছিল না। আমার তো কাজ ছিল শুধু কাগজের টুকরায় কিছু নোট লিখে অথবা আধাঘন্টা-পনের মিনিটের আলাপে মোটামুটি কিছু বুঝিয়ে দেয়া। আবদুল মালেকের সুদক্ষ পরিচালনায় সংগৃহীত অর্থের নিখুঁত হিসাব পেলাম। সিকি, আধুলী পাই পয়সা থেকে নিয়ে কত টাকার নোট কতটি, তার হিসাবের ব্যবস্থাও সে করে রেখেছিল। এরপর তিনদিন তিনরাত একটানা পরিশ্রম করে আবদুল মালেক অল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে চাল বন্টনের কাজ সমাধা করে ফেলল। সেদিন আবদুল মালেককে

www.icsbook.info

স্বচক্ষে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছি। আর মুরব্বী সেজে পরামর্শ দিয়েছি কাজটা আর একটু সহজে কিভাবে করা যায়। এই ভাগ্যবান ব্যক্তির পরিশ্রমকে লাঘব করার জন্য সেদিন তার সাথে মিলে নিজ হাতে কিছু করতে পারলে আজ মনকে কিছু সান্ত্বনা দিতে পারতাম।

অক্টোবর থেকে ১৯৬৬-৬৭ নয়া সেশন কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা এবং পূর্ব-পাক সংগঠনে নেতৃত্বের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। ঢাকার তৎকালীন সভাপতি মুজিব অনার্স পরীক্ষা শেষ করে এম.বি.এ পড়ার উদ্দেশ্যে করাচী চলে যাচ্ছে। ঢাকায় সিনিয়র কর্মী নেই বললেই চলে। অন্যত্র থেকে নেতৃত্বের অভাব পূরণ করা যায় কিনা আলোচনা চলছে। ঢাকা শহর শাখার বার্ষিক নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে প্রায় এক মাস। কেন্দ্র থেকে তাগিদ আসছে। কিন্তু আমরা কিছুই যেন ঠাওর করতে পারছিনা। সারওয়ার ভাই অবশ্য চিন্তা করছিলেন শেষ পর্যন্ত পূর্ব-পাক দফতর থেকেই কোন একজনকে ঢাকা শহর শাখায় দিয়ে দেবার কথা। ঢাকায় তখন সদস্য সংখ্যা একেবারেই সীমিত। এর মধ্যে চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে আবদুল মালেকই ছিল অগ্রসর। একদিকে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তদুপরি সদস্য হয়েছে মাত্র কয়েকমাস আগে। সুতরাং এত তাড়াতাড়ি তার উপর বিরাট কোন জিম্মাদারী চাপালে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট হয় কিনা সে প্রশ্নটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সারওয়ার ভাইয়ের নির্দেশে আমি ঢাকায় সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগতভাবেও সমস্যা সম্পর্কে আলাপ করলাম। এ সুযোগে সংগঠনের বর্তমান ভবিষ্যত সম্পর্কে আবদুল মালেকের চিন্তার গভীরতার সাথে আন্দোলনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে যে বলিষ্ঠ, যোগ্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন নেতৃত্ব আমাদের মধ্যে না থাকলে আমরা কাজ করবো না এমনও হতে পারে না। আমাদের মধ্য থেকে অপেক্ষকৃত অভিজ্ঞ এবং সিনিয়র যে কোনো একজনকে সামনে রেখে আমরা কর্মীরা যদি পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি নিয়ে কাজ করে যাই তা হলে এ অভাব অবশ্যই পূরণ হয়ে যাবে। এ ধরনের একটা বিজ্ঞচিত উক্তি শুনে আমরা অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে ঢাকা শহর শাখার নির্বাচন দিয়ে দিলাম। ফজলু ভাই নির্বাচিত হয়ে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হলেন। মাঝে মধ্যে দু'একবার অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টাও করলেন। শেষ পর্যন্ত কর্মী গঠনের কাজটা এ সেশনেই ভাল হয়েছে বলে আমার ধারণা। এ সেশনে আবদুল মালেক শাখা সম্পাদক হিসেবে সংঘের মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করল।

১৯৬৬-৬৭ সনের নতুন সেশন শুরু হয়েছে। কিন্তু বিগত সেশনের ন্যায় কাজে যেন গতি আসছে না। একই যোগে ঢাকা শহর ও পূর্ব-পাক সংগঠনের নেতৃত্বের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। মুজিব সবেমাত্র তৈরি হতেই বিদায় নিয়েছে। সারওয়ার ভাইতো উল্কার বেগে এসে উল্কার মতই চলে গেলেন। প্রাক্তন কর্মীদের থেকে শুরু করে সংঘের সর্বস্তরের কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহল এতে বিস্মিত হলেন। সারওয়ার ভাইকে রাখার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর আমি একরাম ভাইকে সামনে রেখে কাজ শুরু করে দিয়েছি। সম্মেলন ও মাহে রমজানের সার্কুলার একরাম ভাইয়ের নামে ইস্যু করা হল। ইতিমধ্যে সারওয়ার ভাই চট্টগ্রাম থেকে এসে গেলেন। তিনি এবার গঠনতান্ত্রিকভাবে কাউকে কার্যকরী সভাপতি করে বিদায় নেয়ার উদ্দেশ্যেই আসছিলেন। গত এক বছরের সাংগঠনিক জীবনে সারওয়ার ভাইয়ের সাথে খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আমার আলাপ হত বেশী। কিন্তু এবারে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। আমাকে ডিঙ্গিয়ে পর্দার আড়ালে কিছু একটা হচ্ছে বলে মনে হল। সারওয়ার ভাই সংঘের ভবিষ্যত নেতৃত্ব সম্পর্কে এদিক ওদিক কিছু সলা-পরামর্শ করছেন। ফজলু ভাই, ফোরকান ভাই ও মালেক ভাইয়ের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি একটা ফয়সালা করে ফেললেন বলেই আঁচ করা গেল। পরদিন কার্যকরী পরিষদের জরুরী অধিবেশনে সারওয়ার ভাই ছুটি নিলেন। আর আমকে কার্যকরী

www.icsbook.info

সভাপতি নিযুক্ত করা হল। ব্যাপারটা ভীষণ খাপছাড়া লাগল আমার কাছে। কারণ ১৯৬৩ থেকে ৬৬ পর্যন্ত সংঘের কেরানীগিরির কাজ ছাড়া আমার অন্য কোন ভূমিকাই ছিল না। পাঁচ/দশ জনের একটি কর্মী বৈঠক চালানোর অভিজ্ঞতাও হয়নি। সংঘের নিজস্ব প্রোগ্রামে মাঝে মধ্যে দারসে কুরআন ও দারসে হাদিস দেয়া ছাড়া সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এ পর্যন্ত বক্তৃতা দেয়ার তেমন একটা সুযোগ আসেনি। এখন হঠাৎ করে প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে এটাও কি সম্ভব? সাংগঠনিক শৃঙ্খলার খাতিরে পরিষদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিলেও এটাকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত বলে আমার মনে আস্থা আসেনি। সম্মেলনে নাজেমে আলা সদস্যদের অভিমত নিয়ে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করবেন, সে মুহূর্তে নিশ্চয় আমি বেঁচে যাব এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আমি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে। ৮ তারিখ পর্যন্ত প্রস্তুতির দিকে ভালভাবেই নজর নিয়েছি। ৯ থেকে ১০ তারিখের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কোন কিছু করতে পারিনি। বেলা তিনটায় সম্মেলন উদ্বোধন হলো। তার আগে নাজেমে আলার পরিচালনায় পূর্ব-পাক সভাপতি হিসেবে আমাকে শপথ নিতে হল।

বিরাট সম্মেলনের নিয়ম-শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগী হতে পারিনি। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় অনেকটা উদাসীনভাবে চারটা দিন কেটে গেল। এ ফাঁকে সম্মেলনের পরিবেশও অনেকটা নষ্ট হল। সম্মেলন উত্তরকালে তার প্রভাব দু'এক জায়গায় মারাত্মক আকার ধারন করল। এ সময়টা সংগঠনের জন্য যেমন ছিল অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্ত তেমনি আমার নিজের জন্যেও। সেদিন আবদুল মালেকের আন্তরিক সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ না পেলে হয়তো আমার পক্ষে আন্দোলনে টিকে থাকাও সম্ভব হতো না।

সম্মেলন শেষ হওয়ার পর পর বেশ কয়টি জায়গা সফর করে এলাম। কর্মীদের অনেকের মন্তব্য শুনলাম। যে কয়জন নীরব কর্মীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বিচক্ষণতার কারণে সম্মেলন শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছিল আবদুল মালেকের নাম তাদের শীর্ষভাগে। প্রথম সফর থেকে ঢাকায় ফিরে ফজলুল হক হলে গিয়েছি। আবদুল মালেক আমার থেকে বাইরের খবর জানল এবং ঢাকার অবস্থা জানাতে চেষ্টা করল। ঢাকার কোন এক উপশাখায় আমাকে কেন্দ্র করে মারাত্মক একটা কিছু হয়ে গেছে, আরো হতে যাচ্ছে বলে খবর পেলাম। সেদিকে কোন কান না দিয়ে সফরের দ্বিতীয় পর্বের দিকে মনোযোগী হলাম। আমার অনুপস্থিতিতে ঢাকার পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়েছে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সবাই স্বীকার করেছেন ব্যাপারটা আমাদের সাংগঠনিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু একে স্থায়ীভাবে প্রতিহত করার জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিস্কার ছিল। ঢাকা এবং পূর্ব-পাক সংগঠনের নেতৃত্বকে দুর্বল এবং অসহায় মনে করে সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মানসে কিছু সংখ্যক অকর্মী কর্মী সেজে এ অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুলো দমন করার জন্যে যখন দায়িত্বশীল কর্মীদেরকে রাজী করাতে পারিনি তখন দায়িত্ব ছেড়ে সরে পড়ার মনোভাব আমার প্রবল হয়েছিল। 'আমার হাতে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে আমি সরে পড়ি, তারপর যাদের উপর দায়িত্ব আসবে তারা পারলে সংগঠনকে বাঁচাবে নতুবা নিজেরাই দায়ী হবে' এমন বাজে চিন্তা আমার মনে একাধিক বার এসেছে। সংগঠন জীবনে এ ছিল আমার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্ত। আবদুল মালেকের একক হস্তক্ষেপের ফলে সেদিন দরবেশী কায়দায় এহেন শয়তানী ওয়াস্ওসা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম।

কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আবদুল মালেক থেকে সবচেয়ে উন্নত পরামর্শ পাচ্ছি অথচ সে মজলিসে শুরায় নির্বাচিত হয়নি। কারণ সদস্য হিসেবে সে নতুন, সে সাথে নীরব কর্মী হিসেবে সে অনেকটা অপরিচিতও। মজলিসে শুরার প্রথম সাধারণ অধিবেশনে তাকে বিশেষভাবে ডাকা

www.icsbook.info

হল।এতে সংগঠনকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তার থেকে বেশীর ভাগ সহযোগিতা পেলাম। শুরায় তার ভূমিকা দেখে তাকে পরে মনোনয়ন দান করা হয়েছিল। তারপর প্রদেশব্যাপী কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের পালা। সংগঠনের দাবী অনুযায়ী কাজ অনেক করা দরকার। কিন্তু আমি সহ পূর্ব-পাক সংগঠনের চারজন কর্মী বি.এ পরীক্ষার্থী। একই সময়ে আবদুল মালেকেরও Subsidiary পরীক্ষা। শুরার সদস্যরা পরীক্ষা দেখে তেমন কোন প্রোগ্রাম না নেয়ার দিকে রায় দিচ্ছেন। আবদুল মালেকের সম্মতিক্রমে আমি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হলাম। শেষ পর্যন্ত সেশনের দুটো উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম- স্কুল কর্মীদের শিক্ষা শিবির ও বিশিষ্ট কর্মীদের শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বেশীর ভাগ ঝুঁকি নিল আবদুল মালেক। সংগঠনের নাজুক পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করে মন প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করে চলেছে আবদুল মালেক। সংগঠনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করছে সে। এ বছর ঢাকা শহর শাখার তিনটি পাঠচক্র পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করতে হয়েছে আমাকে। পাঠচক্রের সদস্যদের কাছ থেকে সে চক্রের অবস্থা জেনে নিচ্ছে আর আমার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছে যোগদানকারীদের অবস্থা। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত যতবার সফর থেকে এসেছি প্রায় প্রতিবারই সে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিভিন্ন শাখার অবস্থা জানার চেষ্টা করেছে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেও সঙ্কোচ করেনি কোনদিন।

৬৭-৬৮ সেশন শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনটি শিবিরের ব্যবস্থাপক হিসেবে আবদুল মালেকের যোগ্যতার প্রচ্ছন্ন রূপটি কর্মীদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বিগত সেশনে সে প্রাদেশিক মজলিসে শূরায় নির্বাচিত হয়নি। এবারে সে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য। দ্রুতগতিতে আন্দোলনের এত সামনে আসা তার কাছে ভাল লাগেনি। আবদুল মালেকের মনে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। নিজের প্রদর্শনী (Projection) হয় এমন যে কোন প্রোগ্রাম এবার এড়িয়ে যেতে সে বদ্ধপরিকর। তার এরূপ অনমনীয় মনোভাব আর কোনদিন লক্ষ্য করিনি। ব্যাপারটা অবশ্য আমার বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু খুব সহজে এটাকে আমল দিতে চাইনি। কার্যকরী পরিষদের এক বৈঠকে স্কুল কর্মীদের প্রোগ্রাম দেয়ার জন্যে আমি জোর করছিলাম। পরিষদ সদস্যদের সবাই চাপ দেয়ার পরও সে রাজী হচ্ছে না। এ ছিল তার সংঘ জীবনের একটা ব্যতিক্রম ঘটনা। মজলিসে শুরার ফয়সালা হিসেবে পেশ করার পর অবশ্য সে মৌন সম্মতি জানাল। একদিন পর হঠাৎ আমার হাতে একটা এনভেলাপ এল। খুলে দেখি ওটা তার মজলিসে শূরা থেকে ইস্তফাপত্র, আমি বিশেষ কোন চিন্তা না করে ওটা প্রত্যাখ্যান করলাম। পরে আর একটা বিরাট পত্র এল যা পড়ার মত ধৈর্য আমার ছিল না। আমি সরাসরি আলাপ করতে গেলাম। ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে কয় ঘণ্টা আলাপ হলো হিসাব নেই। 'ইসলামী আন্দোলনের জন্য নৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন তার কিছুই আমার নেই। অথচ অনেক বেশীই আমাকে সামনে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এটা আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর হবে এবং আমার নিজের জন্যেও।' এ অভিযোগের জবাব আমি কি দিয়েছিলাম মনে নেই। তবে সরাসরি কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা না বলা পর্যন্ত তার মত পরিবর্তন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিশেষে ইস্তফাপত্র Withdraw করতে সম্মত হল সে। এর পর থেকে আর এরূপ মনোভাব তেমন একটা লক্ষ্য করিনি।

১৯৬৮-৬৯ এর সেশন শুরু হয়েছে। এবার আবদুল মালেক ঢাকা শহর শাখার সভাপতি। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে নির্বাচিত তিন সদস্যের সে অন্যতম। গণ আন্দোলনের কর্মমুখর এই বছরে বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মনের দিক দিয়ে অনেক সরল ও মজবুত আবদুল মালেককে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী কোমল মনে হচ্ছে। গত ক'বছরে তার সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটা সহকর্মী ও

www.icsbook.info

সহপাঠী পর্যায়ের। এবারে কিভাবে তা ছোট ভাই বড় ভাইয়ে রূপ নিল তা বুঝে উঠতে পারিনি। এখন থেকে আবদুল মালেক প্রাদেশিক দফতরে মাসিক রিপোর্ট অথবা পরিকল্পনার কপির সাথে ছোট একটা চিঠিও দিয়ে দেয় যার শেষে লেখা থাকে 'আপনার স্নেহের ছোট ভাই আবদুল মালেক'। তার সারা জীবনের ভালবাসাটুকু অন্তর নিংড়িয়ে দিয়ে যেতে চাচ্ছিল কিনা কে বলবে। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ডেমরার অগণিত জান-মালের ক্ষতি হয়েছে। সংঘের পক্ষ থেকে সেখানে রিলিফ ওয়ার্কে যেতে হবে। ঢাকায় কর্মীদের নিয়ে আবদুল মালেক হাজির। সেখানকার অবস্থার দেখাশুনা ও কায়িক পরিশ্রমে যা কিছু করা যায় তার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কর্মীদের পাঠিয়ে দিল সে। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় যেখানে মানুষগুলো হাহাকার করছে সেখানে খালি হাতে যেতে মালেক রাজি হচ্ছে না। মনটা তার বেশ ভারাক্রান্ত। কোন মতে সম্মেলন ফান্ড থেকে টাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হল। মালেক পাউরুটি নিয়ে ডেমরা যাবে। আমি কাউসার হাউসে গিয়েছি। হঠাৎ এক টেলিফোন এল। বিশেষ কোন কথা নয়। কিছু একটা সাথে নিয়ে যেতে পারছে বলে মনটা একটু হালকা হয়েছে। এবার আমার মনটা হালকা করা দরকার। তাই নিজামী ভাই বলে ডাক দিয়েছে- এই আর কি! কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বৈঠক উপলক্ষে করাচী যেতে হবে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের সকলের যোগদান সম্ভব নয়। আমার সাথে আর যে কোন একজনের যেতে হবে। আবদুল মালেককেই সাথে নেয়ার সিদ্ধান্ত হল। এতে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হলো সে। বিমানে উঠে তার থেকে দুটো নতুন জিনিস পেলাম। বিগত আন্দোলনের গতিধারা বিশ্লেষণ করে সামনের পদক্ষেপ সম্পর্কে উচ্চাঙ্গ আলাপ হলো। এর আগের ঘটনাটি ছিল শিক্ষণীয়। বিমানে উঠেই দু'জনে দুটি পত্রিকা হাতে নিয়েছি। আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পত্রিকার প্রথম আর শেষ পাতায় চোখ বুলিয়েই এবার আবদুল মালেকের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি। পাস ফিরে তাকাতেই দেখি ও পত্রিকার দুটো বিশেষ খবর নোট করছে। মিষ্টি হাসি হেসে আমার কাছে আরো কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিল সে।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন থেকে ফিরে এসেছি। প্রদেশব্যাপী ব্যাপক প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। নূরুল ইসলাম পরীক্ষার্থী বলে এবার সফর একাকীই করতে হচ্ছে। সফরে যাবার আগে আবদুল মালেকের সাথে দেখা করে যাই। আর ফিরে এলে ও আমার Tour Impression জানার চেষ্টা করে। এখন থেকে ওর সততাদীপ্ত চাহনী আর আন্তরিকতাপূর্ণ কথা আমার মনের উপর নতুন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রাদেশিক মজলিসে শূরার বৈঠকের মাত্র দু'একদিন আগে হঠাৎ করে আবদুল মালেক বাড়ি যাবে বলে শুনলাম। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল। আমি ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। মনটা বেশ ভারাক্রান্ত মনে হলো ওর। 'বাড়ি যাওয়াটা প্রয়োজন মনে করছি, কিন্তু আপনাকে না বলে বাড়ি যাচ্ছি একথা বলতে পারি না' মালেক উত্তর করল। ছোট খাট কারণে সে বাড়ি যেতে পারে না। সুতরাং তাকে বাধা দেবার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু একদিকে তার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে অন্যদিকে তার অনুপস্থিতিতে মজলিসে শুরার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হবে এটা আমার কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। তার কারণটা জানতে চাইলাম। কি যেন একটা স্বপ্ন দেখে সে বাড়ি যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। 'সংগ্রামী জীবনে আমরা স্বপ্নকে এরূপ গুরুত্ব দিতে পারি না, বাস্তবে কিছু ঘটে থাকলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। বাড়ি গেলে বেশ সময় যাবে। বরং টেলিগ্রাম করে প্রকৃত অবস্থা জেনে নিলেই তো ভাল হয়।' আমার মুখ থেকে একটুকু কথা বের হতেই মালেকের চোখে মুখে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পরে আমি নিজেই তাকে বাড়ি যাবার জন্য কয়েকবার চাপ দিয়েছি। মালেক উত্তর দিয়েছে 'এখন না গেলেও চলবে, বাড়ি থেকে চিঠি পেয়েছি'। কে জানত যে শহীদ হয়েই সে মায়ের কাছে ফিরে যাবে।

www.icsbook.info

মজলিসে শূরার পরিকল্পনা অনুসারে ৯ আগস্ট আমার সফরসূচী শেষ হয়েছে। ১০ আগস্ট ভোরে ঢাকায় পৌঁছেছি। একটানা আড়াই মাস সফর শেষে ক্লান্ত হয়েছি বেশ। সারাদিন আর বাইরে বের হতে পারিনি। মালেকও অন্যান্য বারের ন্যায় প্রাদেশিক অফিসে এসে খোঁজ নেয়নি। মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। শেষ সফরে কেন যেন তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরে আসার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। নীলফামারীর প্রোগ্রামটা সংক্ষেপ করে একদিন আগেই রংপুর পৌঁছে গেছি। দিনগুলো দু'হাত দিয়ে ঠেলছিলাম। ফিরবার পথে গাড়ীটাও যেন বেশ বিলম্বে পৌছল। দিন শেষে আবদুল কাদের থেকে খবর পেলাম আজ রাতে ঢাকায় রুকনদের জরুরী বৈঠক আছে। মাগরিবের নামাজ পড়ে ধীরে ধীরে রওয়ানা হলাম। পথে বেশ একটু দেরিও হয়ে গেল। কার্জন হলে পৌঁছতেই এশার জামায়াতের একামত শুরু হলো। মালেক অজু শেষ করে মসজিদের দিকে পা বাড়াতেই আমি সামনে হাজির। সালামের জবাবটা দিয়েই কিছু সময়ের জন্যে আমার দিকে অবাক দৃশ্যে তাকিয়ে রইল সে। তার স্বভাবসুলভ মিষ্টি মধুর হাসি ভরা মুখে বলল 'আপনি আসছেন'? নামাজ শুরু হয়ে গেছে। কথা বলা সম্ভব ছিল না। শুধু হাতটা মিলিয়ে জামায়াতে শামিল হলাম। একটু পরে বৈঠক শুরু হল। শেষ হতে হতে রাত বাজল প্রায় ১টা। সুতরাং কারো সাথে ব্যক্তিগত আলোচনার সুযোগ হলো না। রুকনদের এই বৈঠকে মালেক তার শেষ হেদায়াত দিচ্ছিল, একথা আমরা কেউ তখন বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, এটাই ছিল মালেকের শেষ আরকান ইজতেমা। তার শেষ হেদায়াত আমি সরাসরি শুনতে পেয়ে এখন নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। শহীদি আত্মার স্মৃতি বিজড়িত এই আরকান ইজতেমার তিনটি কথা আমাদের সংগ্রামী জীবনের প্রতি পদক্ষেপের স্থায়ী পাথেয় হয়ে থাকবে। 'রুকনদের ভূমিকা বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হতে হবে। আন্দোলনের দাবী ও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রুকনদের Career Sacrifice এর 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মূল সংগঠনের দাবী পূরণের প্রাধান্যকে উপেক্ষা করে Side Organization এর প্রতি অহেতুক ঝোঁক প্রবণতাকে রোধ করতে হবে।' কথাগুলোর প্রতি এত বেশী জোর দিচ্ছিল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, আবদুল মালেক Career Sacrifice এর হেদায়াত দিয়ে নিজেই তার চূড়ান্ত স্বাক্ষর রেখে গেল। ঈমানের দাবী পূরণ করতে গিয়ে আবদুল মালেক দ্বিধাহীন চিত্তে শাহাদাতের পিয়ালা পান করল। জীবনের বিনিময়ে বাতিলের মোকাবেলায় সত্য প্রতিষ্ঠার রক্ত স্বাক্ষর রেখে গেল সে। মালেক আমাদের মধ্যে ছিল সর্বোত্তম একথাও সবাই জানতাম। কিন্তু আল্লাহর পথে শহীদ হবার মত এত বড় মর্যাদায় সে ভূষিত হবে এটা বুঝে ওঠা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আন্দোলন ও সংগঠনের হাজারো সমস্যা নিয়ে মালেকের সাথে আলাপের সুযোগ আর হলো না। ১০ তারিখের রাতের সেই মুহূর্তে আমার দিকে সে যেভাবে তাকিয়ে ছিল ১৭ তারিখের অপরাহ্নে তার জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে আমি অনুরূপ চেয়ে আছি।

লেখক :আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.icsbook.info

স্মৃতিচারণ

মালেক ভাইকে যেমন দেখেছি

ডঃ এ জামান

১. ফজলুল হক হলের মসজিদের নীচে একটি কক্ষে তিনি অবস্থান করতেন। কিন্তু ফজরের নামাজের সময় কদাচিৎ তাকে এই মসজিদে দেখা যেত। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি হল থেকে দূরে অন্য কোন মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তেন। এবং সেসব জায়গায় নামাজের পরে সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

২. পোশাক পরিচ্ছেদ খুবই সাধারণ মানের ছিল। এমনকি পায়জামা এবং পাঞ্জাবী উভয়ই সাদা হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রংয়ের মেচিং হতে দেখা যেত না। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সারাদিন কাজ করে এসে রাতে এশার নামাজের পর হলে ফিরতেন এবং তার এই পাজামা পাঞ্জাবী রাতে ধুয়ে দিয়ে সকালে ওগুলো পরে আবার রওনা হতেন।

৩. শহীদ আবদুল মালেকের বৃত্তির একটা বড় অংশ ব্যয় হত বই কেনার পেছনে। ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত বহুবিধ পুস্তক তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে সংগৃহীত ছিল। এর বাইরেও অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বর্তমান বিশ্ব ইত্যাদি নানাবিধ পুস্তক এবং বহুবিধ ম্যাগাজিনের একটা বিশাল তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তার শাহাদাতের পর তাঁর কক্ষে অবস্থিত ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে। জানা গেছে তিনি অনেক সময় সকালের নাস্তার পয়সা বাঁচিয়ে নীলক্ষেতের পুরানো মার্কেট থেকে Readers Digest ক্রয় করতেন।

www.icsbook.info

৪. শহীদ আবদুল মালেকের পোশাকাদি ও স্যান্ডেল দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কেউ তাঁকে Underestimate করতে পারতো। কিন্তু তার সাথে কথা বলার স্কোপ হলে ৫ মিনিটের মধ্যে এই ভুল বিশ্বাস অবশ্যই ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হত।

৫. শহীদ আবদুল মালেকের চরিত্রে অহংকারবোধ সংক্রান্ত কোন ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জীবনে কখনোই পরিদর্শিত হয়েছে বলে জানা নেই। এর অতীতের জীবনে কি এ ধরনের কোন ঘটনা আছে কি না সে সম্পর্কে আমরা কোন তথ্য পাই না।

৬. শহীদ আবদুল মালেকের বক্তৃতা খুবই উন্নতমানের হত। বক্তৃতায় শব্দচয়ন, শব্দ উচ্চারণ, তথ্য, অকাট্য যুক্তি এবং প্রয়োজন মাফিক বাক্যে Stress প্রদান খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল। মূলতঃ তাঁর এ বক্তৃতার কারণে সে সময়ের ছাত্র সংগঠন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ ইসলামী শিক্ষার পক্ষে দ্রুত জনমত সৃষ্টি করে সম্মুখে এগুচ্ছিল। বলা হয়ে থাকে, একারণে সঠিকভাবে তাদের দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পেরেছিল।

৭. শাহাদাৎ যে কোন মুমীনের জন্য লোভনীয় ব্যাপার ছিল। তাঁর শাহাদাতের পরে তাঁর লাশ নিয়ে ঢাকা সিটিতে যে মিছিল বের হয়েছিল সাধারণভাবে তা লোক সংখ্যা অনুমান করা যায় না তবে পিজি শাহাবাগ মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলা মোটরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যতদূর পর্যন্ত রাস্তা দেখা যায় তার শাহাদাতের মিছিল পুরা রাস্তাটা ক্যান্সার করে ফেলেছিল। এটা একজন মিছিলকারীর কাছ থেকে জানা যায়, মিছিলের সামনে পিছে কতদূর বিস্তৃত ছিল এটা তিনি স্মরণ করতে পারছেন না।

৮. শহীদ আবদুল মালেকের জানাজার নামাজের ইমামতি করেন মোস্তফা আল মাদানী। জানাজার নামাজে আসতে তার কিছুক্ষণ দেরি হয়েছিল। তার আগেই তাঁর লাশ ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় মসজিদের পূর্ব পাশে রাখা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীরা সবাই যখন ক্রন্দনরত ছিলেন সেই সময় মোস্তফা আল মাদানী সেখানে উপস্থিত হন এবং চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন এবং বলেন হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কেন গ্রহণ করছ না, কেন এই বিশাল মর্যাদা প্রদান করলে না? আমি কি আবদুল মালেকের মতই তোমার দৃষ্টিতে শাহাদাত প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করিনি? তুমি আমাকে এ মর্যাদা প্রদান কর। ... জানা গেছে পরবর্তীকালে তিনিও শাহাদাৎ বরণ করেন।

লেখক : শহীদের হলমেট, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

www.icsbook.info

স্মৃতিচারণ

আবদুল মালেক এবং আমি

ইঞ্জিনিয়ার ইসকান্দর আলী খান

আবদুল মালেক শহীদ ভাই এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের কোন এক বিকেলে। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনের পার্শ্বের আমতলায় ইসলামী ছাত্র সংগঠনের একটা অনুষ্ঠানে মালেক ভাই অত্যন্ত জোরালো, বলিষ্ঠ ও তেজস্বী বক্তব্য রেখেছিলেন। আমরা অনেকেই বক্তব্য রেখেছিলাম। আমার বিবেচনায় মালেক ভায়ের বক্তব্যটি শ্রেষ্ঠ হয়েছিল।

১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সাক্ষাৎ থেকে ১৯৬৯ সালের ১৫ই আগস্ট মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের দিন পর্যন্ত মোট ৪টি বছর। এ চারটি বছর মালেক ভাইয়ের সাথে একত্রে কাজ করেছি এ দেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ করে ছাত্রদের অঙ্গনে।

এ স্বল্পকালীন সময়ের প্রায় প্রতিদিনই বিকেল ও রাতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমরা একত্রিত হতাম। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন কার্যক্রম স্টাডি সার্কেল, ট্রেনিং ক্যাম্প, কর্মীসভা, সাধারণ সভা, পোষ্টারিং, লিফলেট বিতরণ, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ও দাওয়াতী কাজে মালেক ভাইয়ের সাথে আমরা ছিলাম নিত্য সাথী।

প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা ও ঈমানী দৃঢ়তায় তিনি আমাদেরকে পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে নেতা নির্বাচিত করলাম।

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা ঢাকা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও স্কুলসহ প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছাত্রমত গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অধিকাংশ ছাত্র আমাদের দাবীর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাই। নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা একটা দেউলিয়া শিক্ষাব্যবস্থা।

ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্র, সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রকারী কতিপয় বিভ্রান্ত ছাত্র নামধারী নেতার গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে গঠিত বিপুল ছাত্রমত। তাই তারা টার্গেট নিয়েছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আবদুল মালেককে হত্যা করার। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে সুযোগ তারা পেয়েছিল ১৯৬৯ সালের ১২ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টি.এস.সিতে)।

জাতির উপর ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদ করার অপরাধে(!) প্রতিভাবান ছাত্র আবদুল মালেককে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করে তারা হত্যা করেছিল।

এ দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবদুল মালেক। সেদিন ১৯৬৯ সালের ১২ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে বাতিল পন্থীরা যা ঘটিয়েছিল তা জাতির জন্য একটা কলঙ্ক।

আবদুল মালেকের শাহাদাতের ৩৩ বছর পর জাতি আজ লক্ষ্য করছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অস্থিরতা, মারামারি ও খুনোখুনি। জোট সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভাষণ দিচ্ছেন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও নকল প্রতিরোধের জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমরা চাই এ বক্তব্যের সফল বাস্তবায়ন।

আধুনিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে একটি সুখী, সুন্দর, ইনসাফভিত্তিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নই হোক- আবদুল মালেক শহীদ দিবসের কামনা ও প্রত্যয়।

লেখক : ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সেক্রেটারী ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর অন্যতম ডাইরেক্টর

www.icsbook.info

স্মৃতিচারণ

শহীদ আবদুল মালেক
ক্ষণিকের স্মৃতি

শরীফ আবদুল গোফরান

১৯৬৮ সালের রমযান মাস। তারিখটি আমার সঠিক মনে নেই। আমি তখন চট্টগ্রাম টাইগার পাস হাই স্কুলের ছাত্র। সংঘের ছোট কর্মী। চট্টগ্রাম জে.এম. সেন হলে সংঘের কর্মী সম্মেলন। খুব ইচ্ছা অংশগ্রহণ করার। কিন্তু স্কুল খোলা থাকার কারণে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারিনি। ফলে বিকালে সংঘ অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। সম্মেলনে ঢাকা থেকে আগত প্রধান অতিথিকে একনজর দেখার খুব ইচ্ছা। চন্দনপুরা বড়মসজিদের কাছে যেতেই আবদুর রব ভাই বললেন, কি ভাইয়া, এত দেরি করে এলে কেন? উত্তরে বললাম, স্কুল খোলা তাই। আবদুর রব ভাই হলেন সংঘের সাবেক নেতা গোলাম সরওয়ার ভাইয়ের ছোট ভাই।

চন্দনপুরা বড়মসজিদের পাশ দিয়ে সামান্য পূর্ব দিকে গেলেই রাস্তার ডান পাশে একটি পুকুর, পুকুরের চারপাশ পাকা। সান বাধা ঘাট। দক্ষিণ পাশ দিয়েও একটি রাস্তা মেইন সড়কের সাথে মিশেছে। পুকুরটি ছিল বেশ সুন্দর। বিকেল বেলায় বাতাসের ধাক্কায় যখন পানি এসে পাড়ে আঁচড়ে পড়তো, তখন মন ভরে যেতো। অনেক দিন এই পুকুর পাড়ে বসে সময় কাটিয়েছি, মনে হয় আজও সেদিনের চিত্রটি আমার সামনে জীবন্ত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই পুকুরের পূর্ব পাশেই সংঘ অফিস। এক তলা একটি বিল্ডিং তার দক্ষিণ পাশে ছিল চৌচালা আর একটি ঘর। এ ঘরটি ছনের ছাউনি দেওয়া। এই ঘরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো। মূল অফিসের পশ্চিম পাশের কক্ষে ছিল একটি বিরাট লাইব্রেরী। তা ছাড়া এই কক্ষে কয়েকটি টাইপ মেশিনও পড়ে থাকতো। কয়েকজন ভাই বসে বসে খট খট করে টাইপ করছেন। আমি রব ভাইয়ের সাথেই অফিসে ঢুকেছি, ইতিমধ্যে অফিসে অনেক লোক চলে এসেছেন। জে.এম সেন হলের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। ঢাকা থেকে আগত মেহমান অফিসে আসবেন। এ কারণে সবাই অফিসের দিকেই ছুটছেন, আমারও ইচ্ছা মেহমানকে একনজর দেখার, কারণ অনুষ্ঠান দেখার ভাগ্য তো হয়নি, যদি অতিথিকে একনজর দেখতে পাই। আগেই বড় ভাইয়ের কাছে শুনেছি ঢাকা থেকে আবদুল মালেক ভাই আসবেন। বড় ভাই রুহুল আমিন চট্টগ্রাম মহানগরীর দপ্তর সম্পাদক। মাওলানা আবদুল মান্নান ভাই তখন মহানগরীর সভাপতি। মান্নান ভাই খুব বড় মানুষ ছিলেন। আমাকে খুবই আদর করতেন। আমার মনে পড়ে তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতেন না। কথা বলতে মুখে আটকে যেতো। আমি লাইব্রেরীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকের বইগুলো দেখছিলাম। হঠাৎ করে কে যেন পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম ভাইয়া? আমি চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি মুখে ভরাট দাড়ি, ছোট ছোট চুল, একজন মানুষ আমাকে আদর করছেন, আর জিজ্ঞেস করছেন, তোমার নাম কি। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে যেন রশ্মি বেরুচ্ছে। যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। আজ বার বার মনে পড়ে, সেই দিনটির

www.icsbook.info

কথা, আমি যদি জানতাম সত্যিই জান্নাতে তিনি ঘুরে বেড়াবেন, তারকার মতো আলো ছড়াবেন, তাহলে জড়িয়ে ধরতাম, মন ভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, আর দেখতাম। আবদুল মান্নান ভাই ও মাওলানা আবু তাহের ভাই পাশে দাঁড়ালেন। আমি নাম বলতেই মান্নান ভাই পরিচয় করে দিলেন, রুহুল আমিন ভাইয়ের ছোট ভাই। তিনি তাকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে আমাকে একটি বই দিয়ে বললেন, নাও ভাইয়া এই বইটি পড়বে। ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদের হাত দিয়ে আমাকে পড়তে দেওয়া ঐ বইটির নাম ছিলো, ইমাম গাযযালী। আমাকে কত যে আদর দিলেন, আমি বুঝতে পারলাম ইনিই ঢাকা থেকে আগত অতিথি আবদুল মালেক ভাই। তাঁর আচরণ দেখে আমার আর বুঝার বাকি থাকলো না। আনন্দে মন ভরে গেল, যার এত গল্প শুনলাম তাকে কখনো চোখে দেখিনি, আজ আর আমার মনে কোন দুঃখ নেই। আজো যেন মালেক ভাইয়ের হাত আর আমার কপালে চুমো খাওয়া ঠোঁটগুলো যেন লেগে আছে। আমি এখনো সেই ক্ষণিকের স্মৃতিকে নিয়ে ভাবনার সাগরে হারিয়ে যাই। নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করি। কারণ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদের হাত আমার শরীর স্পর্শ করেছে। যে শহীদ জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর স্পর্শ পেয়েছি, দু'মিনিট কথা বলার সুযোগ হয়েছে, এ থেকে আমার আনন্দের আর শেষ নেই।

শহীদ আবদুল মালেক একটি নাম, একটি ইতিহাস। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইতিহাসের প্রয়োজন মেটাতে শহীদ আবদুল মালেকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি যে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিলেন সেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণতা না পেলেও মালেক ভাইয়ের লাখো সাথী আজ তার পূর্ণতার চেষ্টা করছে। সংগ্রাম করছে। তিনি যে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তা আমাদের জন্য অনুসরণীয়, অনুকরণীয়, আজ তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে না এলে হয়তো একদিন তাঁর সামনে অপরাধী হয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি সেদিন হয়তো প্রশ্ন করবেন আমার ফেলে আসা অসমাপ্ত কাজগুলোর কি করেছ?

আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামে শহীদ হন। সেদিন ছিলো ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) নির্মমভাবে প্রহৃত হয়ে ১৫ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ আবদুল মালেক তাঁর জীবনের সকল কিছু উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের জন্য। মাঠে ময়দানে তৎপরতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখিতেও ছিলেন তৎপর। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

শহীদ আবদুল মালেক ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। সর্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালার নির্ধারিত দিন ও সময়েই তিনি নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন অদৃশ্যের জগতে, আল্লাহর মেহমান হয়ে। আগে আর পরে প্রত্যেক মানুষকেই তার নির্ধারিত দিনে চলে যেতে হবে। এটাই পরম সত্য। তবে জান্নাতের ঘ্রাণ নিয়ে হয়তো সবাই বিদায় নিতে পারেনা। যারা আগেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন তাদের মধ্যে শহীদ আবদুল মালেক ভাই একজন। এ কারণেই তো সেদিন হাসতে হাসতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। নিয়েছেন জান্নাতের সুঘ্রাণ।

তবুও কোন প্রতিভাধর ভাল মানুষের অকাল বিদায় আমাদের ব্যথিত করে। ক্ষতিগ্রস্ত করে। শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাতেও আমরা ব্যথিত। আজকে আমরা সাহিত্য আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, এমনকি জাতির বৃহত্তর আন্দোলনেও একজন মালেক ভাইয়ের অভাব অনুভব করি। অনুভব করি একজন মালেক ভাইয়ের মতো অভিভাবকের। মালেক ভাই যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে তিনি আমাদের ভাষা বুঝতে পারতেন। বুঝতে পারতেন সাহিত্য সংস্কৃতির মূল ধারা। তাঁর থেকে আমরা পথ নির্দেশনা পেতাম। বটবৃক্ষের মতো ছায়া পেতাম। ঐ ছায়ায় আশ্রয় নিয়েই ইসলামী বিপ্লবের রাজপথকে উন্মুক্ত করতে পারতাম। ছুঁতে পারতাম নীল আকাশের তারা মন্ডলীকে।

শহীদ আবদুল মালেক ভাই সাহিত্যের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর 'ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা' প্রবন্ধটি পড়লেই বুঝা যায় তিনি আমাদের কত কাছের বন্ধু হতে চেয়েছিলেন, হতে চেয়েছিলেন একজন যোগ্য অভিভাবক।

লেখক : সাব-এডিটর, দৈনিক সংগ্রাম

www.icsbook.info

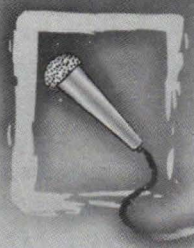

সাক্ষাৎকার

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের সাথে আপনার প্রথম কোথায় দেখা হয়?

উত্তর : বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয় যদ্দূর মনে পড়ে জিঞ্জিরাতে একটা শিক্ষাশিবিরে। সেই শিক্ষাশিবিরে উনার উপর খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব ছিল। তাকে ছোটাছুটি করতে দেখতাম, বাজার এবং রান্না করার কাজে খোঁজ খবর নিতে দেখতাম। শিক্ষার্থী যারা তাদের গোসলের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে দেখতাম। শিক্ষার্থীরা তখন বুড়িগঙ্গা নদীতেই গোসল করত। এভাবেই তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়।

ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে উনার সাথে আমার দেখা হয়নি, কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যেই উনার সাথে আমার দেখা হয়। তিনি যে এই ধরনের একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে যাবেন তা যদি তখন বুঝতে পারতাম তাহলে হয়ত অন্যভাবে দেখতাম। মানুষ হিসেবে ভবিষ্যত জানা সম্ভব হয়নি বলেই ঠিক সাধারণভাবে যেমন দেখা হয় সেভাবে দেখেছি। তবে তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য আমি ফরিদপুর থেকে আসতাম। ঢাকায় দু'একদিন থাকতে হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল রুমে অথবা আগামসির লেনের ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের অফিসে দেখা হত। এভাবেই তাকে জানতে শুরু করি।

প্রশ্ন : তার সংস্পর্শে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে পড়ে কি?

উত্তর : গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে আমার মনে দাগ কাটার মতো যেটা বলতে চাই সেটা হলো, উনি ফজলুল হক হলে থাকতেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে এসে এখনকার মতো এত ভালো থাকার সুব্যবস্থা তখন ছিল না। আমরা যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসতাম তাদের ঢাকায় অবস্থানরত দায়িত্বশীল ভাইদের হোস্টেল, মেস বা বাসায় থাকার ব্যবস্থা করা হতো।

www.icsbook.info

কোন এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এসে আমার থাকার ব্যবস্থা হয় আবদুল মালেক ভাইয়ের ফজলুল হক হলের ১১২ নং রুমে। তখন উনার হল জীবন সম্পর্কে টাচ্ করতে পেরেছি। সহজ সরল সাধারণ একটা জীবন। তাকে দেখে কখনও আর্থিক সংকট বুঝা যেত না তবে তার কার্যক্রমে বুঝা যেত। শুধু একটি গেঞ্জি একটা লুঙ্গি কলাপাতা রঙের একটা গামছা, সাধামাটা চাদর, যতদূর মনে পড়ে চাদরটা সাদা রঙের আর একটা বালিশ। উনার সাথে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলে উনি কিছুতেই নিজের সিটে থাকতে রাজি হতেন না, নিচে বিছানা করে শুতেন। আমাকে সিটে শুতে বাধ্য করতেন, আর তিনি নিচে শুতেন। এমন সাইজের সিট যে তাতে ডাবলিং করা কোন মতেই সম্ভব হতনা। যেহেতু আমি তার কাছে কর্মী সাব্যস্ত ছিলাম সেজন্য তার কথা না মেনে পারা যেত না। এই ঘটনাগুলো এখনও মনে পড়ে। আর একটি মূল্যবান ঘটনা। সেটা হলো কোন একটা প্রোগ্রামে এসে ফজলুল হক হলে আমি রাত্রিযাপন করি এবং সকালে নাস্তা খাওয়ার সুযোগ হয়। তখন ক্যান্টিনগুলোর রান্না ভাল ছিল। রুটি, পরাটা, ভাজি, কলিজা বা রোস্ট পাওয়া যেত। এগুলো দিয়ে আমাদের নাস্তা করিয়েছেন। উনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি কিন্তু উনি শরীক হন নাই। আমাদেরকে ভালভাবে নাস্তা করিয়েছেন। আমার মনে পড়ে একই সাথে পরাটা, ভাজি গোস্ত, চা এসব পরিবেশনের ক্ষেত্রে অনুধাবন করা যায়নি যে আর্থিক সংকটের মধ্যে তিনি ছিলেন। অনেক পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, সাথে সাথে নয়। নিজের পয়সা থেকে খাইয়েছেন, ছাত্র সংগঠনের পয়সা দিয়ে নয়। কারণ তখন ছাত্রসংগঠনের বায়তুলমালের অনেক সংকট ছিল। নিজের পয়সা এবং ঐ পয়সা দিয়ে তিনি নিজে যদি নাস্তা করতেন তাহলে এভাবে করতেন না। এই সমস্ত ঘটনাগুলো আমার দৃষ্টিতে অন্তত আমার মনে রেখাপাত হয়ে আছে। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলতে আমি তার সহজ সরল, সাদামাটা, ত্যাগী, অপরের জন্য নিজের স্বার্থ কুরবানী করার ঘটনাবলী আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : ছাত্রজীবনে তিনি স্কুল জীবন থেকেই মেধাবী ছিলেন। পড়াশুনার প্রতি তার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি। ভাইদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল মধুর এবং গভীর। মায়ের স্নেহসিক্ত আকর্ষণ তাকে সব সময়ই মায়ের প্রতি পাগলপারা করে রাখত। এককথায় মাতৃভক্ত সন্তান। সহপাঠীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল ঐকান্তিক। এখনও তার দু'একজন সহপাঠীদের সাথে যখন সাক্ষাত হয় তখন তারা তাকে স্মরণ করে। তার মেধার কথা, তার ব্যবহারের কথা, তার মাতৃভক্তির কথা, তার শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধার কথা, তার পড়াশুনার কথা, তার কোন কিছু ভাবার উপরে তার চিন্তার গভীরতার কথা এখনও তারা বলেন। পরিশ্রম করেছেন, ব্যক্তিগত প্রাইভেট-টিউটর ছাড়াই তিনি স্কুল জীবনে আকর্ষণীয় ফলাফল করেছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি ষ্ট্যান্ড করেন। যার ফলে S.S.C পাশ করার পর Scholarship এর পয়সা পাবার কারণে- এদিক দিয়ে তার একটা নিশ্চয়তা ছিলো- ইন্টারমিডিয়েটেও তিনি ষ্ট্যান্ড করেন। ক্লাসে তিনি মেধাবী ভাল ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন সহপাঠীদের কাছে। শিক্ষকগণ একবাক্যে তাকে অত্যন্ত স্নেহের মেধাবী ছাত্র মনে করতেন। মানুষের জীবন বলতে যা বুঝায় সে জীবন শুরুর আগেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেন। এজন্য তার জীবন বলতে ছাত্রজীবনকে বুঝায়। তার জীবন বলতে মায়ের আদরের কোলের জীবনকে বুঝায়। তার জীবন বলতে ভাইদের সাথে একসাথে চলার জীবনকে বুঝায়। আর ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে আসার পর তার জীবন বলতে আন্দোলনের জীবনকে বুঝায়। তিনি আন্দোলনকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আর মিশন হিসেবে ঘুনে ধরা সমাজ পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজ বিনির্মানের লক্ষ্যই ছিলো তার চেতনার গভীর প্রকাশ। তার শয়নে স্বপনে চালচলনে আচার ব্যবহারে, কথা-বার্তায়, পড়াশুনায়, বক্তব্য, লিখুনিতে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তিনি যে কমিটেড ছিলেন, এটাই যে

www.icsbook.info

তার জীবন, এটাই যে তার মরণ- এটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। "ইন্না ছালাতা ওয়া নুসুকি ওয়ান আহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত এ ঘোষণাকে তিনি বাস্তবে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন : তাঁর শাহাদাতের দিনটি কেমন ছিল?

উত্তর : তাঁর শাহাদাতের ঘটনার সময় আমি ঢাকায় ছিলাম না। শাহাদাতের কয়েকদিন আগে শিক্ষাব্যবস্থার উপরে একটা সেমিনারে শ্রোতা হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম- NIPA ভবনে। সেখানে মালেক ভাই বক্তা ছিলেন। অনেক শ্রোতার মত আমরা সেখানে শ্রোতা ছিলাম। উনার শিক্ষা ব্যবস্থা- ইসলামী নীতির উপর বক্তব্য আমি শুনেছি বসে বসে। যতটুকু মনে পড়ে- এটা শাহাদাতের ঘটনার অল্প কয়েকদিন আগে। আমি যেহেতু ঢাকায় বসবাস করতাম না- ফরিদপুর চলে যাই। যেদিন এ ঘটনা ঘটে সেদিন আমি মফস্বলে ছিলাম। সেখানে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের তদানীন্তন দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম পাই। যেহেতু মালেক ভাই সমাজতন্ত্রীদের হাতে শহীদ হন সেজন্যে টেলিগ্রামে ছিলো- ল্যাংগুয়েজটি এখনো আমার মনে পড়ে Create sentiment against socialist fundalism.

এটার মাধ্যমে আমি প্রথমে জানি। তখন টেলিফোন যোগাযোগ আজকের মতো ডিজিটালের তো প্রশ্নই ছিল না- এমনকি টেলিগ্রাম অফিসে গিয়ে টেলিফোন করতে হতো ট্রাঙ্কলের মাধ্যমে। আমি এর মাধ্যমে সর্বশেষ অবস্থা জানি। কিভাবে শাহাদাত বরণ করলেন জানতে পারলাম। তখন সভাপতি ছিলেন জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। হৃদয় থেকে উপলব্ধি করলাম। তবে সংগঠনের দায়িত্বশীল কর্তৃক যেহেতু এলাকাভিত্তিক করণীয় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিলো- পরবর্তীতে কর্মসূচী দেয়া হয়েছিলো সেজন্যে আর ঢাকায় আসার চিন্তা হয়নি। এলাকাতেই আমি কর্মসূচী পালন করি। তবে শাহাদাতের ঘটনাটা যেভাবে ঘটানো হয়েছে- শহীদ হওয়া সেতো সৌভাগ্যের বিষয়, তার জন্য কোন বেদনাদায়ক ব্যাপার না, কিন্তু যারা আমরা জীবিত ছিলাম এখনও জীবিত আছি তাদের কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। অত্যন্ত কষ্টের।

প্রশ্ন : কেন সর্বজনপ্রিয় এ মানুষটিকে জীবন দিতে হলো?

উত্তর : মানুষের সাথে যদি ধর্মবোধ না থাকে, ধর্মবিশ্বাস না থাকে- সে যে মতবাদেরই হোক না কেন তার মাঝে মনুষ্যত্বের পরিবর্তে পশুত্বের প্রাধান্য পায়- আবদুল মালেক শহীদের শাহাদাতের ঘটনায় তা প্রমাণ হয়। নতুবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার কাছে পরিচিত ছিলো যে, আবদুল মালেক একজন মেধাবী ছাত্র, আবদুল মালেক একজন চরিত্রবান ছাত্র, আবদুল মালেক শিক্ষকদের প্রতি অনুগত ছাত্র, সে ছোটদের স্নেহ করতে জানে, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করতে জানে এরপরও তাকে লাঠি দিয়ে, হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে, আঘাত করে মগজ চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে। তাতে এটা প্রমাণ হয়- তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের কারণে নয় বা অন্যকোন কারণে নয়, আদর্শের কারণে এবং তার যোগ্যতার কারণে তাকে তারা এমন নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো। আদর্শের কারণে তো আরো অনেকেই কমিটেড থাকতে পারে। কিন্তু যার আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা সাথে সাথে যোগ্যতা-দক্ষতা- এদুইটার সমন্বয় হয় সে সম্পদ হয়। পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য সম্পদ হয়। আর সে ব্যক্তি যদি কোন আন্দোলনের লোক হয় তাহলে সে আন্দোলনের সম্পদ হয়। আর আন্দোলনের যে প্রতিপক্ষ থাকে তার জন্য সে হয় Liability আবদুল মালেক শহীদকে তারা সেভাবে মনে করেছিল। তার শাহাদাতের ঘটনা নিরেট নির্ভেজাল ছিলো বলেই আমার মতে- আমার ব্যক্তিগত Observation আবদুল মালেক শহীদের শাহাদাতের ঘটনা যেভাবে চারদিক আলোড়িত করেছিলো এরকম দু'একটি ঘটনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এটার পিছনে তার নির্মল-নির্ভেজাল জীবন মূল কারণ বলে গণ্য।

www.icsbook.info

প্রশ্ন : বর্তমান ইসলামী আন্দোলন তাঁর জীবন থেকে কি শিক্ষা নেবে?

উত্তর : আজকে ব্যক্তি হোক, সমষ্টি হোক, সংগঠন হোক, আন্দোলন হোক- যারাই আবদুল মালেক শহীদের শাহাদাতকে সামনে রেখে কিছু করতে চায় বা স্মরণ করে বা শ্রদ্ধা করে তাদের অনেক কিছু করণীয় আছে বলে আমি মনে করি। যেহেতু আজকে ইসলামী আন্দোলন একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছে- এটা ব্যাপকতা লাভ করেছে সেজন্যে আবদুল মালেক শহীদ যেভাবে নিরেট আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্দোলন করেছেন সেখানে তেমনি অন্য কোন কিছু প্রবেশ করতে পারে না। আজকের আন্দোলনে সে নির্মল পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন, কেননা বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা আন্দোলনের মধ্যেই চলে এসেছে। এজন্য প্রথমেই করণীয় মনে করি, যিনি যতবেশী আন্দোলনে অবদান রাখতে চান- তাকে ততবেশী সরল, সাদামাটা, বিনয়ী, ত্যাগী জীবন যাপন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের জন্য শহীদ আবদুল মালেক এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আমি আগেই বলেছি তার জীবন বলতে ছাত্রজীবন বুঝায়। কেননা ছাত্রজীবনের বাইরে বাস্তব জীবনে তিনি আসতে পারেননি। তার গোটা জীবনটাই ছাত্রদের জন্য। তার থেকে ছাত্রদের, ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের জনশক্তির শিক্ষা হলো পড়াশুনায় খুব সিরিয়াস হতে হবে, ইসলাম জানার ব্যাপারে, কুরআন বুঝার ব্যাপারে, রাসূল (সা) কে জানা-বুঝার ব্যাপারে একাডেমিক ক্যারিয়ার নির্মাণেও। আবদুল মালেক শহীদ আন্দোলন করেছেন, দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন যে একাডেমিক ক্যারিয়ারের ব্যাপারে কোন আপোষ নাই।

তৃতীয়তঃ তিনি যতটুকু শিখেছিলেন যতটুকু জেনেছিলেন তিনি তা তাঁর জীবনে প্রতিফলিত করে গেছেন যেটা দিন দিন আজকে দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

চতুর্থতঃ আন্দোলনের জন্য হযরত আবুবকর (রা) কে নমুনা সামনে রেখে তিনি এক অনন্য ত্যাগী নিদর্শন রেখে গেছেন। নিজেরটা যেটা কুরবানী করা কোন দিক দিয়ে তার জন্য ফরজ ছিলো না সেটা তিনি অকাতরে কুরবানী করে গেছেন।

পঞ্চমতঃ তার ব্যবহারিক জীবন নিরহংকার ছিলো, এবং খুব মিষ্টি ছিলো। তার সাথে কথা বলে মানুষ আরাম পেত। অল্প সময়ে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হতো।

ষষ্ঠতঃ তার নামাজ ছিলো খুবই সুন্দর। খুশুগুজুর সাথে নামাজ আদায় করার যে তাগিদ আছে তার একটি নমুনা তিনি পেশ করতেন, এবং এখানে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার ছিলো- চেষ্টা করে করতেন তা নয় সুন্দর করে নামাজ আদায় করা তিনি অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন।

আরো অনেক কিছু আছে তার জীবনে যাকে সামনে রেখে আমাদের করনীয়- তার মধ্যে অন্যতম একটা হলো- তার জীবন আখেরাত কেন্দ্রীক ছিলো। তার সাথে কথা বলে অন্তত বৈষয়িক কোন কিছুর প্রতি আকর্ষিত হয় নাই। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল হতে হবে, ছাত্রজীবন শেষ হলে একটি সুন্দর বাড়ি হতে হবে, গাড়ী লাগবে বা আমি এভাবে চলবো, এরকম হয় নাই। তার সাথে আলাপে সবসময় আখেরাত কেন্দ্রীক জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়তো। দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আবদুল মালেক শহীদের সাথে আলাপ করে কখনও বৃদ্ধি পেত না। আমাদের নিজেদের জীবনটাকেও আখেরাত কেন্দ্রীক করে গড়ে তোলার জন্য আবদুল মালেক শহীদের এ নমুনাকে সামনে রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। আমীন।

সাক্ষাতকার গ্রহণে : মিয়া মুহাম্মদ তরুণ, মুহাম্মদ আমিনুর ইসলাম
২৪.০৮.০২ বড়মগবাজার, ঢাকা

www.icsbook.info

সাক্ষাৎকার

আবু নাছের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স, ইসি চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:

প্রশ্ন : শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় কিভাবে ঘটে?

উত্তর : এটা ছিল ১৯৬৫ সনে; ডিসেম্বর মাস। ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক শিক্ষাশিবিরে যোগ দেয়ার জন্য সকাল ৮টার দিকে ঢাকা স্টেশনে পৌঁছলাম। এটা ছিল সাংগঠনিক জীবনের প্রথম শিক্ষাশিবির এবং প্রথম বারের মত রাজধানী সফর। স্বভাবতই মনটা ছিল রোমাঞ্চ ও উৎসাহে ভরা। সংগঠনের সিনিয়র ভাইদের কাছে শিক্ষাশিবির সম্পর্কে অনেক কিছু শুনতাম। তাই নতুন কিছু দেখার ও শেখার স্বপ্নে মশগুল ছিলাম। কমলাপুর রেলস্টেশনে নেমে দু'জন ভাইয়ের সাথে দেখা। এদের একজন পূর্ব পরিচিত। অন্য জনকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল, 'ইনিই মালেক ভাই' বলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। ধবধবে ইস্ত্রিবিহীন শার্ট, পাজামা আর চপ্পল পরিহিত হাসি হাসি মুখের সাধারণ চেহারার এই লোকটিকে প্রথম সাক্ষাতেই ভালো লেগে গেল।

প্রশ্ন : সেই সময়ে আপনার সাংগঠনিক দায়িত্ব কি ছিল?

উত্তর : আমি তখন ফেনীতে। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। আমার দায়িত্ব ছিল ফেনীর প্রধান প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকার বায়তুল মাল, লাইব্রেরী ইত্যাদি, সব মিলিয়ে ৮টা দায়িত্ব ছিল। যতদূর মনে পড়ে তখন আমি সংগঠনের সদস্যপ্রার্থী ছিলাম।

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন কি?

উত্তর : উনি খুব সম্ভবতঃ আমার পরেই মজলিশে শূরার সদস্য হন। শূরার অনেকগুলো মিটিংয়ে উনার সাহচার্য পেয়েছি, একসাথে অনেক রাত কাটিয়েছি, বহু বিষয়ে তাঁরসাথে আলোচনা হতো, সে সময়ে আমি চিটাগাংয়ের মহানগরীর দায়িত্বে ছিলাম। মালেক ভাই তখন ঢাকা সিটির সভাপতি ছিলেন। তখন Major সিটিই ছিল দুটি। দুই সিটির সভাপতি হিসেবে দু'জনের সম্পর্ক আরো গাঢ় ছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শূরাতেও উনি এবং আমি একসাথে সদস্য হই।

প্রশ্ন : ব্যক্তি জীবনে মালেক ভাইয়ের কোন্ দিকটি আপনাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করতো?

উত্তর : ব্যক্তি জীবনে তিনি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। আমার মনে পড়ে, '৬৭ সালের কোন একসময় তাঁর রুমে গেলাম রাত কাটানোর জন্য। বিছানার অবস্থা নেহায়েত সঙ্গীন। একটা মাত্র বালিশ। মালেক ভাই হাসি মুখে বললেন, 'ছেঁড়া বিছানায় শোয়ার অভ্যাস তো বোধ হয় আপনার নাই।' বললাম, মনের বিছানা তো আপনার বিলকুল অটুট আছে, ওখানটায় আমাদের জন্য একটু স্থান দেবেন- তাহলেই চলবে। যা হোক, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ জেগে দেখি, খবরের কাগজ বিছিয়ে ম্যাগাজিনকে বালিশ বানিয়ে মশারি ছাড়াই

www.icsbook.info

ফ্লোরে ঘুমিয়ে আছেন মালেক ভাই। খুব রাগ হল। সকাল বেলায় জিজ্ঞেস করাতে, কেবল মৃদু হাসলেন কোন জবাব দিলেন না। সামান্য সময়ও তিনি হেলায় অপচয় করতেন না। প্রোগ্রামের বিরতিতে আমরা হয়তো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু মালেক ভাইকে দেখতাম ইসলামী ম্যাগাজিন অথবা সাহিত্য নিয়ে বসে গেছেন অথবা প্রোগ্রামের পরবর্তী এজেন্ডা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনীয় পয়েন্ট টুকে নিচ্ছেন।

প্রশ্ন : উনার সাথে আপনার অন্য কোনো স্মরণীয় ঘটনা আছে কি?

উত্তর : আরেকটি ঘটনা। ১৯৬৭ সনের মাঝামাঝিতে বোধ হয়। গুলশানে একটি শিক্ষাশিবির ছিল। মালেক ভাই ইনচার্জ। নদীর পাড়ে ডেলিগেটদের জন্য অস্থায়ী টয়লেটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কয়েকটার অবস্থা ছিল নড়বড়ে। যথা নিয়মে মালেক ভাইকে জানালাম- চুপ করে শুনলেন। দুপুরের দিকে নিজামী ভাই আমাকে বললেন মালেক ভাইকে ডেকে নিয়ে আসতে। কোথাও না পেয়ে টয়লেটের দিকেও খোঁজ করতে গেলাম। দেখলাম, কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে তিনি ব্যবহৃত পায়খানা ঘরগুলোকে মজবুত করার কাজে ব্যস্ত। আমাকে দেখে সন্তুষ্ট হলেন না। আসলে আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা এরকম নীরবে কাজ করতেই পছন্দ করেন।

প্রশ্ন : এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই। সমসায়িক বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই প্রেক্ষিতে ইসলামী নেতৃত্বে আরো নতুন কি কি যোগ্যতা অর্জন করা জরুরি?

উত্তর : আমার মনে হয় না যে, Contemporary World-এ মৌলিক কোন পরিবর্তন এসেছে। আজকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমেরিকাকে। বহুশত বছর আগে পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্যও তখনকার জন্য Super power ছিল। সালাহউদ্দিন আয়ুবী যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতেন, সেই সময়ের জন্য ওটাই ছিল Latest, আসলে মূল জিনিসটা তো একই রয়ে গেছে, শুধু বাইরের রূপটাই কিছু ক্ষেত্রে পাল্টেছে। ইসলামী Movement এর লোকেরা সব সময়ই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করেছে।

প্রশ্ন : এখানে আরেকটি ব্যাপার এসে যায়, যেটাকে আমাদের মনে হচ্ছে, আন্দোলনের জন্য একটি মৌলিক সংকট। আর তা হলো, নেতৃত্বের মধ্যে যারাই জাগতিক যোগ্যতায় সেরা তাদের মাঝে আবার খুলুসিয়াত এবং দ্বীনি মেজাজের ঘাটতি দেখা যায়। এটাকে Balance করা যাবে কিভাবে?

উত্তর : একটু পেছনের দিকে যাই। ইনসানিয়াতের পরিপূর্ণ নমুনা, নবী-রাসূলদের পর আমরা দেখতে পাই খোলাফায়ে রাশেদার এবং আসহাবে রাসূলের জীবনে। তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমরা জাগতিক জ্ঞানের দিক থেকে, শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে, প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে তুলনামূলকভাবে অগ্রসর দেখতে পাই তাকওয়া পরহেজগারীর দিক থেকে তার কোন্ অংশে কম ছিলেন? ঘোড়ায় চড়লেই হাফ্‌প্যান্ট পরতে হবে- এটা খুব জরুরি না। আমরা দেখি যে সতর ঢেকেই আমাদের মুজাহিদরা ঘোড়ার সবচেয়ে উত্তম সওয়ারী ছিলেন।

তাক্‌ওয়ার সাথে দুনিয়াদারী জ্ঞান অর্জন বা প্রভাব-প্রতিপত্তির আমি তো কোন Contradiction দেখিনা। গোলমালটা তখন দেখা দেয়, যখন জ্ঞানটুকু, সম্পদ, শক্তি বা ক্ষমতা দ্বীনের জন্য ব্যবহার না করে নিজের উত্থান বা আরাম-আয়েসের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা ইসলাম নয়- হতে পারেনা।

প্রশ্ন : সর্বশেষ একটি কথা : মালেক ভাইয়ের পুরো জীবনকে আপনি কিভাবে মুল্যায়ন করেন?

উত্তর : আমি তো প্রায় সময় বলি, কিছু কিছু ফল আছে যাদের কোন অংশই ফেলনা নয়, সবকিছুই ব্যবহার করা যায়। মালেক ভাই হচ্ছে তেমনি একটি ফল, যার জীবনের প্রতিটি অংশ থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি।

সাক্ষাতকার গ্রহণে : মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান, সাইম উদ্দিন খন্দকার হাসিব, হামিদুল হক
১০.০৮.০২

www.icsbook.info

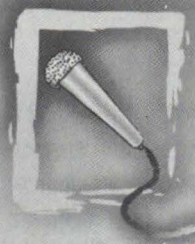

সাক্ষাৎকার

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

ই.ভি.পি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
(শহীদ আবদুল মালেকের সভাপতি)

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের সাথে আপনার পরিচয় ঘটে কিভাবে?

উত্তর : আমরা একটা গ্রুপ ১৯৬৫-এ ঢাকা ভার্সিটিতে একসাথে ভর্তি হই। এ পরিচয় আরো গাঢ় হয় জিঞ্জিরা ১৯৬৮-এ, একটা T.C হয়েছিল- সেখানে।

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনার সুত্রপাত হয়েছিল কিভাবে?

উত্তর : ঘটনাটা সুত্রপাত হয়েছিল সম্ভবত ১২ তারিখে তারও ২/৩ দিন আগে NIPA তে একটা আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল। সেই আলোচনায় আমি, শহীদ মালেক এবং মেজর জেনারেল ইব্রাহীম অংশগ্রহণ করেছিলাম, ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে।

প্রশ্ন : ঐ অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা কারা ছিল?

উত্তর : NIPA, National Administration of Public Administration আয়োজন করেছিল। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন রব নামের এক ভদ্রলোক। সে আলোচনায় বাম ছাত্র সংগঠনগুলো ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল। ওরা আমাদের আলোচনার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারেনি।

প্রশ্ন : সেই সময়কার জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ছিল ইসলামিক আইডিওলজির সাথে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ। সেক্যুলার শিক্ষার ধারক বাহকরা এটাকে বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এবং তুমুল আন্দোলন করে, ১৭ই সেপ্টেম্বর হরতাল পালন করে, যেটাকে পরবর্তীতে তারা শিক্ষাদিবস হিসেবে পালন করে।

পরবর্তীতে আয়ুব খানের সময়, নূরখান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। সেই সময় ছাত্রসংঘের একটি ডেলিগেশন নূর খানের সাথে সাক্ষাৎ করে। সেই ডেলিগেশন আমি, মালেক ভাই এবং মাসুদ আলী ভাই ছিলাম।

www.icsbook.info

নূর খানের সাথে আমরা ডিটেইল আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার সময় স্কোয়াড্রাম লীডার এম.এম. আলমও ছিলেন। এম.এম. আলমের নাম তোমরা শুনেছোতে? He was a hero of 1965 war. তিনি ছিলেন ঐ সময়কার জাতীয় বীর।

প্রশ্ন : নূর খানের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি কেমন ছিল?

উত্তর : হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের চাইতে একটু অনুন্নত হলেও ইসলামী Idiological side মোটামুটি Cover করেছিল। এ রিপোর্টও বাতিলের জন্য তারা আগের মত আন্দোলন শুরু করেছিল। এ রকম অস্থির পরিস্থিতিতে, সরকারের পক্ষ থেকে NIPA ভবনে এই শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্রদের Motivate করার জন্য। সেই আলোচনায় বামরা চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল, এটা ছিল ওদের জন্য একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়।

প্রশ্ন : তখন ঢাকা ভার্সিটি ছাত্র সংসদগুলো এ ব্যাপারে কি ধরনের Stand নিয়েছিল?

উত্তর : ঢাকসু'র ক্ষমতায় ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। ঢাকসু'র পক্ষ থেকে তারা শিক্ষানীতি বিষয়ে টি.এস.সি'তে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এবং সেখানে ছাত্রসংঘের কেউ যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা তারা নিয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষানীতির পক্ষে প্রথম আওয়াজ তুলেছেন জহিরুল হক সাহেব (বর্তমানে লন্ডনে অবস্থানরতর)। ঐ মুহূর্তে নিজামী ভাই, আমি এবং ইউনুস ভাই- আমরা তিনজন মধুর ক্যান্টিনে বসা ছিলাম। ঢাকা সিটিতে সংগঠনের কি একটা প্রোগ্রাম ছিল। নিজামী ভাই এবং ইউনুস ভাই সেখানে চলে গেলেন। আমাকে দায়িত্ব দিলেন টি.এস.সি'তে যাওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম বক্তৃতা পর্ব চলছে। তারা তাদের বক্তব্য দিয়েছে। আমরা বক্তব্য দিতে চাইলাম, সুযোগ দেয়া হলো না। আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম। এর মধ্যে আমাদের কেউ আবার জোর আওয়াজে ফ্লোর চাইতে লাগল। স্টেজে তখন তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, শামসুদ্দোহা (CPB) মোস্তফা কামাল হায়দার (সাবেক Minister জাতীয় পার্টির), (এরা সবাই শহীদ মালেক হত্যা মামলার আসামী) ক্ষুব্ধ। এদেরকে আমি শান্ত করার চেষ্টা করেছি। আমাদের কর্মীদের সবাইকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে চলে আসতে বলেছি। ঐ সময় তারা লাঠি-সোটা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। বুঝতে পেরে আমাদের লোকজনকে- টি.এস.সি'র যেখানে বাস থামতো- সেখানে বাসে উঠিয়ে দিয়েছি। প্রায় সবাই পার হয়ে গেছে; আমরা ৪/৫ জন ছিলাম; মালেক ভাই আমাদের পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে সাহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে একটা জটলা এবং কাউকে যেন পেটাচ্ছে। আমরা ৪জনই সেদিকে ছুটলাম। দেখলাম যে দু'টো লাশের মতো পড়ে আছে। একটা গাজী ইদ্রিস, আরেকটা শহীদ মালেক। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের সামনে গেলাম। ওখানে গিয়ে স্কুটার ধরলাম। সেখান থেকে সোজা ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্ন : ঘটনার Feed-back কি রকম ছিল?

উত্তর : মূলতঃ তারা এক চেটিয়াই মালেক ভাইকে পিটিয়েছে, ঘটনার বিবরণ ও ছবি পত্র-পত্রিকায় এসেছে। Case হল। খুনীদেরকে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। রাজনৈতিক মামলা হওয়ার কারণে পরবর্তীতে মামলার প্রসেডিংসের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

প্রশ্ন : ঐ মামলায় আসামী ছিলো কারা কারা?

উত্তর : আসামীদের অনেকেই আজকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যেমন তোফায়েল আহমেদ, মোস্তফা জামাল হায়দার, শামসুদ্দোহা, মাহফুজ উল্লাহ্। এরাই মূলতঃ হত্যাযজ্ঞের মূল নেতৃত্বদানকারী। আবদুর রাজ্জাক ছিল কিনা আমার মনে নেই।

www.icsbook.info

প্রশ্ন : ঘটনার কাছে ধারে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ছিল না?

উত্তর : আজকের মত তখন কিন্তু ভার্সিটি ক্যাম্পাসে সবসময় পুলিশ থাকতো না।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি কেমন ছিল?

উত্তর : যদিও বামরা আমাদের উপর সাংঘাতিক খড়গহস্ত ছিল। তারপরও সব হলেই আমাদের সংগঠন ছিল, প্রোগ্রামাদিও হত। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ আমরা এককভাবে হরতাল পালন করেছিলাম। খড়গহস্ত হওয়ার আরো কিছু কারণ ছিল। 'শিক্ষার সংকট' নামে একটা বুকলেট শহীদ মালেক ও আমার যৌথ সম্পাদনায় বের হয়েছিল। এটা আমরা বুদ্ধিজীবীদের মাঝে পৌঁছে দিয়েছিলাম। বিশেষ করে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ এবং তৎকালীন বাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা, চীনে বাংলাদেশের সেই সময়ের রাষ্ট্রদূত কামরুদ্দীন আহমদ সাহেবদের মত লোকদের কাছে এটা ছিল অবাক হওয়ার মত।

প্রশ্ন : মালেক ভাইকে তো আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, উনার ব্যক্তি জীবনের কোন্ দিকগুলো আপনার ভালো লাগতো?

উত্তর : জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগামী ছিলেন। বেশীর ভাগ সময় পাঞ্জাবীই পরতেন। বড়জোর ২/৩টি পাঞ্জাবী ছিল তার। চপ্পল পরে ভার্সিটিতে আসতেন। তার মধ্যে যে মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ ছিল- তা ছিল অনন্য, অসাধারণ। সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন 'মডেল'। ঝাঁঝালো এবং উত্তেজিত করার মত উপকরণ তার বক্তৃতায় ছিল না। তাত্ত্বিক, হৃদয় কেড়ে নেয়ার মত যুক্তিবাদী এটিচুড ছিল তার বক্তব্যে। সবচেয়ে বড় যেটা- তিনি ছিলেন নির্লোভ, একেবারেই সিম্পল। বিলাসী জীবন মোটেও পছন্দ করতেন না। হাসিখুশি থাকতেন সব সময়। সবার সাথেই মিশতেন। তার জানাযাকে পড়িয়েছে জানো তো? প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন সাইয়েদ মোস্তফা আল মাদানী সাহেব। উনি বলছেন উনার বক্তৃতায় যে, 'আল্লাহ তুমি আমাকে শহীদ মালেকের মত শাহাদাত নসীব করিও।'

প্রশ্ন : উনার সাথে আপনার কোন স্মৃতি মনে আছে কি?

উত্তর : উনাকে যখন আহত অবস্থায় Emergency তে নিয়ে গেলাম, তখন বাম এবং আওয়ামী ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করতে বিলম্ব করছিল। একজন তো চিৎকার করে বলেইছিল, Let him die. পরবর্তীতে আমরা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় উনাকে ডাক্তার জুম্মার চেম্বারে নিয়ে যাই।

প্রশ্ন : মৃত্যুর পূর্বে আহত অবস্থায় যে ক'দিন ছিলেন, সেই সময়ে তিনি কি কথাবার্তা বলতে পেরেছিলেন?

উত্তর : ঐ সময় উনার তো সেন্স ছিল না। মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হায়েনারা তো উনাকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করেছিলো।

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের সাথে, মারাত্মকভাবে আহত গাজী ইদ্রিস ভাইয়ের অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর : উনিও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তবে মাথায় অতটা আঘাত পড়েনি।

.....

সাক্ষাতকার গ্রহণে : সাইম উদ্দিন খন্দকার হাসিব ও জেড.এ. ভূঁইয়া

www.icsbook.info

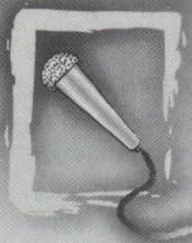

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
(তৎকালীন ঢাকা মহানগরীর সভাপতি)

প্রশ্ন : শহীদ মালেক ভাইয়ের সাথে আপনার কখন, কোথায় ও কিভাবে পরিচয় হয়?

উত্তর : শহীদ আবদুল মালেক ভাই ছিলেন একজন বোর্ডস্ট্যান্ডধারী ও তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র। মালেক ভাই যেদিন প্রথম রাজশাহী হতে ঢাকায় আসেন তখন তাকে স্টেশন হতে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের অফিসে নিয়ে আসার জন্য দায়িত্ব ছিল মাসুদ আলী ভাই, মঞ্জুর এলাহী ভাই, মাহবুবুল আলম ভাই (সিলেট) এর উপর। আমি, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন অফিস সম্পাদক), শেখ নূরউদ্দিন ভাই আমাদের অফিসে বসে গভীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের ও মহানগরীর অফিস ছিল ৮০ হোসেনী দালান রোড, ঢাকায়। প্রতীক্ষার এক পর্যায়ে মালেক ভাই ও অন্যান্য ভাইয়েরা এসে আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। তখনই তার সাথে আমার পরিচয় হয়। সম্ভবত ১৯৬৬ সালে।

প্রশ্ন : আপনি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করেছেন, কোন Subject ও কোন Year এ পড়তেন, আপনার সাংগঠনিক দায়িত্ব কি ছিল?

উত্তর : জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা থেকে বি.এ পাস করেছি। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছি। আমি ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) একজন আবাসিক ছাত্র ছিলাম। ঢাকা মহানগরীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

প্রশ্ন : ছাত্র হিসেবে মালেক ভাই কেমন ছিলেন?

উত্তর : যদি Excellent বলি তাহলে ঠিক হবে না। উনি ছিলেন একজন Super Excellent

www.icsbook.info

ছাত্র। তিনি ছিলেন বোর্ডস্ট্যান্ডধারী। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হতে মেধাবী ছাত্রদের জন্য দেয়া বৃত্তি তিনি পেতেন। আমাদের আরও কয়েকজন ভাই এই বৃত্তির টাকা পেতেন। আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল হতে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের জন্য কমিটি দিয়েছিলাম। ছাত্রসংসদ থেকে দেয়া এই কমিটিতে আমরা সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছিলাম। নির্বাচনের জন্য যে ব্যয় হয়েছে এই টাকা মালেক ভাই ও অন্যান্য কয়েকজন ভাইয়ের বৃত্তির টাকা থেকে আমরা যোগান দিয়েছিলাম। নির্বাচনের জন্য আমরা আলাদা কোন কালেকশন করিনি। এই বৃত্তির জমানো টাকা দিয়ে নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করার পরও যে অতিরিক্ত টাকা ছিল তা দিয়ে আমরা সংগঠনের জন্য একটি স্টীলের আলমারি ক্রয় করি। এটিই ছিল আমাদের সংগঠনের তখন ২য় আলমারী। (সম্ভবত সাহিত্য সম্পাদক মাহবুবুল আলম/ফায়জুল গেলানী)

প্রশ্ন : একজন মানুষ হিসাবে তাঁকে কেমন দেখেছেন?

উত্তর : তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর এবং খুব নম্র। আদর্শিকভাবে বিরোধিরাও তাকে শ্রদ্ধা করত। তখন ছাত্রইউনিয়নের কর্তৃত্ব ছিল বেশী। তাদের সাথে কখনও কখনও তর্ক-বিতর্ক হলেও সংঘাত হয়নি। একবার ফজলুল হক হল, ঢা.বি মসজিদে এস.এস.সি ফলপ্রার্থী ভাইদের নিয়ে একটি শিক্ষাশিবির হয়েছিল। সেখানে ডেলিগেট হিসেবে আমাদের বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামান ভাইও ছিলেন। তখন আশরাফ ভাই নামে এক দায়িত্বশীল ভাইয়ের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে বিরোধী ছাত্ররা খুব গোলমাল শুরু করেছিলো। তখন মালেক ভাই খুব সুন্দরভাবে এই গোলমালের তাৎক্ষণিক সমাধান করেছিলেন।

তিনি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তার মাত্র একটি পায়জামা এবং পাঞ্জাবী ছিল। ময়লা হয়ে গেলে রাতের বেলায় এগুলো ধুয়ে শুকিয়ে দিতেন এবং পরদিন সকালে আবার এগুলি পরেই বের হতেন।

হলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। হল প্রাধ্যক্ষ তাকে খুবই মায়া করতেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তার সাথে পরামর্শ করতেন।

তখন প্রাণ-রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব কামালউদ্দিন। আর মালেক ভাই ছিলেন সেই বিভাগের ছাত্র। চেয়ারম্যান স্যার তাকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। অন্যান্য শিক্ষকগণের নিকটও তিনি ছিলেন খুব প্রিয়।

প্রশ্ন : তার কোন স্মৃতিটি আপনাকে এখনও বেশী নাড়া দেয়, দয়া করে বলবেন কি?

উত্তর : আমি যখন ঢাকা মহানগরীর সভাপতি, মালেক ভাই তখন ছিলেন শাখা সেক্রেটারী। একদিন রাতের বেলা অফিসে গিয়ে দেখলাম মালেক ভাই মোম জ্বালিয়ে খাতা কলম নিয়ে হিসেব করছেন। আমি ঢুকে সাংগঠনিক কথা শুরু করলে তিনি হটাৎ মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলেন। মোমবাতি নিভানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বন্যার্ত মানুষের জন্য সংগৃহীত রিলিফের টাকা দিয়ে মোমটি কেনা হয়েছে। রিলিফের টাকায় কেনা মোম দিয়ে সাংগঠনিক কাজ করা ঠিক নয়। পরে তিনি সংগঠনের টাকায় কেনা অন্য একটি মোম জ্বালালেন। বন্যাটি ছিল ১৯৬৭ সালের। এ থেকে তার অত্যাধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মালেক ভাইয়ের এই স্মৃতিটি আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন : তিনি কিভাবে সাংগঠনিক কাজ ও পড়ালেখার ভিতর ভারসাম্য রক্ষা করতেন?

উত্তর : আমাদের সময় সাংগঠনিক কাজের সময় ছিল আসর থেকে মাগরিব। মাগরিব থেকে

www.icsbook.info

এশা এই সময় আমাদের জন্য পড়ালেখা করা ছিল বাধ্যতামূলক। আমরা কখনও এই সময় সাংগঠনিক কাজ করতাম না। এশার পর হতে অন্যান্য প্রোগ্রাম ও সাংগঠনিক কাজ যতক্ষণ ইচ্ছা ও প্রয়োজন হত তা সম্পন্ন করতাম। তাছাড়া মালেক ভাই ক্লাসে যাওয়ার আগেও ২/৩ ঘন্টা পড়তেন। দিনে প্রায় ৫/৬ ঘন্টা তিনি পড়াশুনা করতেন। তার মেধা ছিল অত্যাধিক তীক্ষ্ণ। তিনি সর্বদাই Library work করতেন।

প্রশ্ন : তিনি কিভাবে ইসলামী আন্দোলনকে মূল্যায়ন করতেন ও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন?

উত্তর : ইসলামী বিপ্লব ছিল তার নিজ জীবনের স্বপ্ন। যদিও তার Carrer খুব ভাল ছিল তথাপি তিনি ক্যারিয়ার বিল্ডিং-এর চেয়ে Sacrifice mentality-কে বেশী প্রাধান্য দিতেন। তিনি শুধু বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব নয় গোটা বিশ্বের মুসলিম জাহানকে নিয়ে ভাবতেন। তিনি তখন মাসিক পৃথিবী পত্রিকায় একটি আন্তর্জাতিক কলাম লিখতেন। এটা ছিল অত্যধিক উন্নতমানের ইসলামী গবেষণার ফল। তার জীবনে কোন বিলাসিতা ছিলনা। তিনি সর্বদাই বলতেন, 'শাহাদাতই আমাদের কাম্য।'

প্রশ্ন : শহীদ মালেকের জীবনী থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু জানতে চাই।

উত্তর : শহীদ আবদুল মালেক ভাই খুব দায়িত্বপরায়ণ ছিলেন। নিখুঁতভাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতেন। খুব সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বৃহত্তর আন্দোলন ও বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে তিনি সর্বদা খোঁজ-খবর রাখতেন। আন্তর্জাতিকভাবেও তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তার একটি ভাল বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি শত ব্যস্ততার ভিতরেও তার পরিবার এবং লজিং বাড়ির সাথে চিঠির মাধ্যমে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। তার জীবনী থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই–

দ্বীন কায়েমই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে।

শাহাদাতের মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ মৃত্যু।

জীবনকে যত সহজ ও সাধারণ রাখা যাবে আন্দোলনে তত বেশী অবদান রাখা যাবে।

মানুষের সাথে যতবেশী সুসম্পর্ক রাখা যাবে আন্দোলন তত বেশী বেগবান হবে এবং জনগণও আন্দোলনে আকৃষ্ট হবে।

কথা নয়, বাস্তব জীবনই হবে উদাহরণ।

প্রশ্ন : আন্দোলনকে নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা জানতে চাই।

উত্তর : আপনি হয়তো জানবেন যে, আমরা নিঃসন্তান। আমি এবং আমার স্ত্রী এই দুই সদস্যের সংসার আমাদের। বর্তমানে টিনশেড বাড়িটি ভেংগে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাড়িটিকে চারতলা করার কাজ ধরেছি। ৩য় তলা মহিলা জামায়াতকে এবং ইসলামী ছাত্রীসংস্থাকে রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে দিয়েছি এখন থেকেই। আর আমার মৃত্যুর পর নীচতলা, ২য় তলা ও ৪র্থ তলা জামায়াতকে দিয়ে দিব। আমার বাড়িটি ইতিমধ্যেই জামায়াতকে রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে দিয়েছি। আর যে ক'দিন বেঁচে থাকি আন্দোলনের কাজ করে যাব ইন্‌শাআল্লাহ।

সাক্ষাতকার গ্রহণে : মুহাম্মদ আকতার হোসেন, ১৩.০৮.০২

www.icsbook.info

সাক্ষাৎকার

আবু শহীদ মোহাম্মদ রুহুল

শহীদের সহকর্মী

প্রশ্ন : শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় কখন হয়?

উত্তর : মালেক ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় সংগঠনের অফিস ৮০ নম্বর হোসনী দালানে। তিনি তখন রাজশাহী থেকে নতুন এসেছিলেন। তিনি তখন কর্মী ছিলেন আর আমি সদস্য ছিলাম। তারপরে আমার দায়িত্বশীল হন।

প্রশ্ন : শহীদ আবদুল মালেক ভাইকে আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। মালেক ভাইকে ঘিরে আপনার কোন বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ে কি?

উত্তর : স্মৃতিটি খুব করুণ। মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের মাত্র চার দিন পূর্বে তিনি আমাকে বিশেষভাবে ডেকে পাঠান। তিনি সেদিন কার্জন হল মসজিদে একটি কর্মী সভায় আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করতে বলেন। কর্মী সভা শেষে তিনি আমার প্রায় দেড়ঘন্টার মত একান্তভাবে কথা বলেন এবং পুনর্বার ছাত্রসংগঠনে কাজ করার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। মূলতঃ তাঁর পরামর্শেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং বায়তুলমালের দায়িত্ব দেন।

প্রশ্ন : শাহাদাতের পূর্বে কি সেটাই শেষ সাক্ষাৎ ছিল?

উত্তর : না, শেষ দেখা নয়, আমার পক্ষ থেকে তবে তিনি আমাকে শেষবার দেখেন। আমি তার আহত হবার পর থেকে শাহাদাত পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজে তাঁর পাশেই ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি মালেক ভাইকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। মালেক ভাই সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

www.icsbook.info

উত্তর : তাঁর সম্পর্কে এক কথায় মূল্যায়ন করা কঠিন। মালেক ভাই ছিলেন 'খুদাদাত মালাকা' বা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ প্রতিভা। তিনি বিশেষ ভাবে আন্দোলনের কর্মীদের তাযকিয়া এর কাজ করেছেন পরবর্তী নেতৃত্ব গঠনের জন্য। তাঁর এই তাযকিয়ার ফল শহীদ মোস্তফা ইমরান শওকত, শহীদ সাইয়্যেদ শাহ জামাল, শহীদ আবদুল হক, শহীদ আবদুল মতিন, শহীদ খলিলুল্লাহ, মরহুম শামসুল হক। লেখালেখির ব্যাপারেও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

প্রশ্ন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে কাজ করেছেন?

উত্তর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শাসনের সময় ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সংগঠন প্রকাশ্যে ছিলনা। ১৯৬৫ সাল থেকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। আমি অফিসের দায়িত্বে ছিলাম তাঁর ঢাকা আগমনের সময়। আমরা প্রায় দেড় বৎসর ৮০ নম্বর হোসনী দালানে একত্রে কাজ করেছি। তিনি কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করতেন না। তিনি নিঃসংকোচে অফিস ঝাড় দিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও আমরা একসাথে কাজ করেছি। বিশেষ কোন প্রোগ্রাম থাকলে আমাকে রাত্রে উনার রুমে থাকতে বলতেন। উনি এবং মাসুদ আলী সাহেব একরুমে থাকতেন। আমি একুট বড় হওয়ার কারণে তিনি আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। উনাকে আমি সহকারী এবং দায়িত্বশীল দু'ভাবেই দেখেছি এবং দুই অবস্থাতেই আমি তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়েছি।

প্রশ্ন : তাঁর সাথে সাংগঠনিক কাজের কোন ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি?

উত্তর : একদা আমরা একসাথে চকবাজারে কালেকশনে যাই। তখন তাঁর অতি সাধারণ ইস্ত্রিবিহীন পাঞ্জাবী-পায়জামা এবং চপ্পল দেখে এক সুধী মালেক ভাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় বলে মনে করেন। এতে সহকর্মীরা ক্ষুব্ধ হলে মালেক ভাই আমাদেরকে এই বলে সান্তনা দেন যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। আমি আমার জন্য যে মানের পোশাক প্রয়োজন মনে করেছি সে মানের পোশাকই পরিধান করেছি। কে আমার পোশাক দেখে কি ভাবল তাতে আমার কোন ভাবনা নেই। এছাড়াও আমি ক্যাম্পাসে মালেক ভাইয়ের সাথে গ্রুপ দাওয়াতী কাজ করেছি।

প্রশ্ন : শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে মালেক ভাইয়ের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর : ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মালেক ভাই প্রচুর পড়াশুনা করতেন। তিনিই এ সম্পর্কে প্রথম ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা এখনও এক্ষেত্রে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করছে। তাঁর শাহাদাতের পর মাত্র এক বৎসরে সারাদেশে কাজ বিস্তার লাভ করে যা পূর্ববর্তী দশ বৎসরেও হয়নি।

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের বক্তব্যের কোন বিশেষ অংশ আপনার মনে পড়ে কি?

উত্তর : তিনি কার্জন হল মসজিদে একটি কর্মী সমাবেশে বলেন, 'আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি তারা যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করতে পারি তবেই ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

আপনাকে স্মৃতিচারণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

আপনাদেরকেও মুবারকবাদ।

.....

সাক্ষাতকার গ্রহণে : আনোয়ার সাদাত ও জেড.এ. ভূঁইয়া

১০.০৮.০২

www.icsbook.info

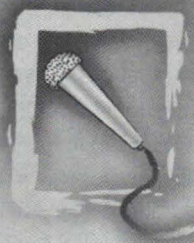

সাক্ষাৎকার

মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী

[গাজী ইদ্রিস]

শহীদের সাথে সোহরাওয়ার্দীর ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের সাথে আপনার পরিচয় কবে থেকে?

উত্তর : '৬৯-এ আমি আলিয়া মাদ্রাসায় কামেলের ছাত্র ছিলাম। মাদ্রাসায় আমাদের সংগঠন ছিল জমিয়তে তালাবায়ে আরবিয়া, আমি আলিয়া মাদ্রাসা শাখার সেক্রেটারী ছিলাম। মালেক ভাই তো তখন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা মহানগরী আমীর। তখন থেকেই তার সাথে পরিচয়।

মালেক ভাই খুব সাদাসিধে থাকতেন। অনেক সময় পাজামা-পাঞ্জাবীর সাথে ইংলিশ সু পরতেন। আমরা বলতাম, মালেক ভাই এটাতো মিলল না। উনি বলতেন, এত কিছু দেখার সময় আছে নাকি? একটা পাজামা-পাঞ্জাবী ছিল। ঐটাই ধুয়ে হাত দিয়ে ভাঁজ করে বালিশের নীচে রেখে দিতেন। মালেক ভাই প্রায়ই বলতেন, পড়াশুনা করে শুধু বড় ডিগ্রি নিয়ে কি লাভ যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা না পাওয়া যায়। ডিগ্রি তো নেয়া শুধু বাঁচার তাকিদে।

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তর : ১২ই আগস্ট টি.এস.সি-তে একটা মতবিনিময় সভা ছিল ডাকসু'র উদ্যোগে নূর খান শিক্ষা কমিশনের উপরে। আমরা সেখানে গেলাম। অনেকে মতামত ব্যক্ত করার পর ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে মালেক ভাই মতামত ব্যক্ত করতে চাইলেন। ওরা ছাত্রসংঘকে ফ্লোর দিতে চাইল না। এ নিয়ে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে মালেক ভাইকে বক্তৃতা দিতে দেবার সুযোগ দেয়া হল। মালেক ভাই এমন সুন্দর বক্তৃতা দিলেন যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল এবং জনমত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে চলে এল। আলোচনা অনুষ্ঠানের সংগঠকরা এটা মেনে নিতে পারল না। 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই না' - এই মর্মে শ্লোগান দিলে আমাদের সাথে হাতাহাতি হয়। উভয়পক্ষে অল্প বিস্তর আহত হয়। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে মালেক ভাই আমাদের সবাইকে চলে যেতে বললেন। আমরা কয়েকজন ভাবলাম মালেক ভাই একা থাকবে? সে তার বৈশিষ্ট্য হিসেবেই উনি সবাইকে চলে যেতে বলছেন কিন্তু উনার একা থাকা তো ঠিক হবে না। আমরা তিন-চারজন মালেক ভাইয়ের সাথে রয়ে গেলাম আমি, নোয়াখালীর আবদুর রব, আর কে কে ছিল মনে নেই। সবাই চলে যাবার পর আমরা মালেক ভাইসহ টি.এস.সি এলাকা থেকে বের হলাম। তখন ১২.৩০ টার মত বাজে এমন সময় রড,

www.icsbook.info

হকিস্টিক হাতে কতগুলো ছেলে আমাদের হামলা করতে আসতে লাগল। আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মধ্য দিয়ে দৌড় দিলাম। ওখানে একটা কালি মন্দির ছিল। আমি আর মালেক ভাই পাশাপাশি ছিলাম। আমি কালি বাড়ির ওখানে যেতে চাইলাম। মালেক ভাই ভাবলেন ওখানে যাওয়া নিরাপদ হবে না। তখন উদ্যানের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি বেরিয়ে যাবার চিন্তা করলাম। কিন্তু দৌড়ে অভ্যস্ত ছিলাম না। ওরা আমাদের ধরে ফেলল। আমার মাথার পিছন থেকে বাড়ি দিল। আমি পড়ে গেলাম। চোখ মেলে দেখলাম মালেক ভাইও আমার পাশে, ওরা মারছে। আমরা আল্লাহ আল্লাহ করতে ছিলাম। ওরা বলল, চুপ শালা, আল্লাহর নাম নিবি না। এরপর তো Senseless হয়ে গেলাম। আমি জ্ঞান ফিরে পাই আড়াই দিন পর ১৪ তারিখে। শুনলাম মালেক ভাই মারাত্মক রকম আহত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিখ্যাত ডাক্তার ডাঃ জুম্মা এর আসার কথা। কিন্তু উনি আসার আগেই ১৫ তারিখ মালেক ভাই শাহাদাতবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি হাসপাতালে ছিলম প্রায় ১৫-২০ দিন। T.S.C তে হামলা গন্ডগোল এবং পরবর্তীতে এই ঘটনায় কোন পুলিশ আসেনি।

প্রশ্ন : হত্যাকান্ডটি কি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল?

উত্তর : মালেক ভাই তো মেধাবী ছাত্র, তুখোড় নেতা ছিলেন। এ হিসেবে ওদের টার্গেটে ছিল। তবে তখন এই হত্যাকাণ্ড পূর্ব পরিকল্পিত ছিল কিনা তা ঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্ন : এই হত্যাকাণ্ড কারা ঘটিয়েছিল?

উত্তর : কারা ঠিক আক্রমণ করেছিল, বলতে পারব না। ওদেরকে তো চিনি না। তারপর তখন ভালভাবে দেখার মত পরিস্থিতি ছিল না। আমরা দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়াই টার্গেটে ছিলাম।

তবে, আমার এক মেয়ে বরিশাল মেডিকেল কলেজে পড়ে। ওর এক বান্ধবী উত্তরবঙ্গে বাড়ি, একদিন কথায় কথায় বলেছিল, ওর এক দূর সম্পর্কের ভাই এই হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল। পরে অসুখ হয়ে অকালে মারা যায়। তবে ডকুমেন্টারী কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

ঐ ঘটনায় আমি আর মালেক ভাইই শুধু আহত হই। আমার আঘাত লেগেছিল মাথায় আর হাতে। তখন কিছুদিন আমার প্রস্রাব বন্ধ ছিল। পরে কিছুটা ঠিক হলেও প্রস্রাব করতে কষ্ট হত। এরপর অপারেশন করলাম। তবে পুরোপুরি সুস্থ হইনি। এখনও এই অসুবিধাটি আমার রয়ে গেছে। মালেক ভাইয়ের বড় আঘাত লেগেছিল মাথায়।

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের মূল্যায়ন আপনি কিভাবে করবেন?

উত্তর : মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের পর ইসলামী ছাত্রসংঘের কাজ অনেক বেগবান হয়। আসলে শহীদের রক্তের উপর দিয়েই ইসলামের বিজয় স্তম্ভ রচিত হয়। এই রক্ত ভেজা আত্মত্যাগের পথ বেয়েই বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে উপনীত হতে পেরেছে। মালেক ভাই শহীদ না হলে আন্দোলন এত বেগবান হত না হয়ত। আমরা সবাই যদি মালেক ভাইয়ের মত শহীদি জযবা নিয়ে আন্দোলনে নামি তাহলে ইসলামের বিজয়ের সোনালী সূর্য আর খুব বেশি দূরে থাকবে না, ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রশ্ন : আপনার পড়াশুনা, সাংগঠনিক জীবনের কিছু কথা বলবেন কি?

উত্তর : আমি গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর থেকে মাদ্রাসা লাইনে ফাজিল পাস করে জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই '৬৬ তে। তখন থেকেই ছাত্রসংঘ করি। ইন্টারমিডিয়েটের পর কামিলে ভর্তি হই আলিয়া মাদ্রাসায় আর একই সাথে ইসলামিক স্টাডিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হই। তবে অনার্স শেষ করতে পারি নাই। স্বাধীনতার পর শেখ কামাল আমার নামে জঘণ্য এক মিথ্যা মামলা দেয়। শেখ কামালের শালাকে ৭১-এ কিডন্যাপ করে হত্যা করে। আলিয়া মাদ্রাসায় থাকতে ছাত্রলীগের সাথে খেলার মাঠ নিয়ে আমাদের বেশ কিছু গন্ডগোল হয়। আগে ছাত্রসংঘ করতাম- এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে আর সাইয়্যেদ নূরুল ইসলামকে এই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। এই মামলার জন্য পড়াশুনা আর শেষ করতে পারিনি। পরে ব্যবসায় নেমে পড়ি।

সাক্ষাতকার গ্রহণে : এম. গালিব, ১১.০৯.০২

www.icsbook.info

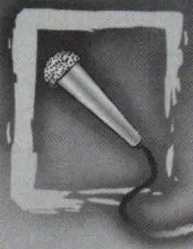

সাক্ষাৎকার

মুহাম্মদ আবদুর রকিব

রমনা থানার তৎকালীন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর যিনি শহীদের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করেন

প্রশ্ন : ১৯৬৯ এর আগস্ট মাসে আপনি কোথায় কর্মরত ছিলেন?

উত্তর : আমি ১৯৬৯ সালের জুন মাসে মুন্সীগঞ্জ থানা থেকে রমনা থানায় বদলী হই। আগস্ট মাসে রমনা থানাতেই পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলাম।

প্রশ্ন : শহীদ আবদুল মালেককে কি আগে থেকেই চিনতেন?

উত্তর : না, চিনতাম না, তবে জানতাম। মেধাবী ছাত্রনেতা হিসেবে তার নাম পরিচিত ছিল পূর্ব থেকেই।

প্রশ্ন : শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ্ডগোল হয়ে কিছু ছাত্র আহত হয় এটা শুনেছিলাম তবে বিস্তারিত জানা ছিল না। ১৫ আগস্ট মাগরিবের পর এস.পি সাহেব আমাকে ডাকলেন এবং আহত আবদুল মালেকের মৃত্যুর খবর দিয়ে তার সুরতহাল রিপোর্ট করতে যেতে বললেন। আমি সিভিল ড্রেসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়ে লাশ দেখে সুরতহাল রিপোর্ট করলাম। ছাত্রদের আবেগ বিস্ফোরণমুখী ছিল বিধায় পুলিশের ড্রেসে সেখানে যাবার মত অবস্থা ছিল না।

প্রশ্ন : মালেক ভাইয়ের লাশ কেমন দেখেছিলেন?

উত্তর : উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য আমি খুব বেশীক্ষণ সেখানে থাকিনি। তবে যতটুকু মনে পড়ে, দেখতে শ্যামলা ছিলেন, ঘন কালো চুল ছিল আর চেহারাটা ছিল অসম্ভব সুন্দর মায়াবী যেন শান্তির দ্যুতি খেলা করছে। মাথার মধ্যভাগ থেকে একটু পিছনে এক থেকে দেড় ইঞ্চি গভীর একটা আঘাত ছিল।

প্রশ্ন : শহীদের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করতে গিয়ে আপনার অনুভূতি কি ছিল?

উত্তর : আমার জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতার সামনে এর ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দেশ, জাতি, ধর্মের স্বার্থে যে জীবন উৎসর্গ করেছে সে তো অসাধারণ। আমার মনে প্রশ্ন জাগল, ইসলামের জন্য যে কাজ করতে যাবে, তারই কি এই অবস্থা হবে?

প্রশ্ন : আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাত পরবর্তী প্রভাব কেমন ছিল?

উত্তর : আবদুল মালেকের শাহাদাত ছাত্র-জনতা সবার মধ্যেই এক অসাধারণ আবেগের সৃষ্টি করে। ঐদিন রাতেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আবদুল মালেক শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। অবশ্য সরকারের নির্দেশে আমরা পুলিশ বিভাগ বাধা দিয়েছিলাম, টিয়ারগ্যাস ছোড়া হয়েছিল, পরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : মালেক শহীদের অসমাপ্ত শিক্ষা আন্দোলন ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : শিবির স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী জ্ঞানে সজ্জিত ধার্মিক জনগোষ্ঠী তৈরি করছে- এটি একটি বিরাট কাজ। এরা মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম না হয়েও তাদের চেয়ে ইসলামের খেদমত অনেক বেশী করছে।

.....

সাক্ষাতকার গ্রহণে : এম. গালিব, ২৯.০৮.০২, শরীয়তপুর থেকে

www.icsbook.info

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিদের অনুভূতি

www.icsbook.info

মীর কাশেম আলী

মালেক ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত '৬৭ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাশিবিরে। তখন বাংলাদেশে একটাই শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হতো। মালেক ভাই ট্রেনিং ক্যাম্পের পরিচালক ছিলেন। সেই ট্রেনিং ক্যাম্পে একজন দায়িত্বশীল হিসেবে মালেক ভাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একজন আদর্শ শিবির পরিচালক হিসেবে কখনো রাগ কখনো আদর করতেন।

এরপর যেহেতু চট্টগ্রামে থাকতাম সেই জন্য তখন সরাসরি উনার সাথে সাক্ষাত কম ঘটত। তবে কিছু ঘটনা মনে পড়ে। চট্টগ্রামে উনি গিয়েছিলেন প্রোগ্রামের বক্তা হিসেবে। উনার বক্তৃতার বিষয়, বক্তৃতার পয়েন্ট এখনো আমার মুখস্থ আছে। তাতে বুঝা যায় তিনি সফল বক্তা ছিলেন, উনার একটা বিষয় ছিল 'আলোর পথে দিশারী সাহাবারা'। আর একটা ছিল 'ইসলামী বিপ্লবের সম্ভাবনা'। (ইসলামী) বিপ্লবের সম্ভাবনা বক্তৃতার পয়েন্টগুলো আমার এখনো মনে আছে। আজকাল বক্তব্যের বিষয় একটু পরেই মনে থাকে না। একটা বিষয় উনি বলেছিলেন- The role of media. বর্তমানে মিডিয়ার বিপ্লব হয়েছে যেমন টেলিভিশন, স্যাটেলাইট। তখন তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন যেন, এগুলো ইসলামের পক্ষে কাজে লাগানো যায়। মিডিয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ তাড়াতাড়ি জানতে পারে। তাই ইসলামের পক্ষে যখন মিডিয়া Positive কাজ করবে তখন বিপ্লব সম্ভব। কিন্তু যখন Negetive কাজ করবে তখন বিপ্লব সম্ভব নয়। এটা তিনি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন।

তিনি যখন সাহাবীদের বর্ণনা দিতেন, তখন মনে হতো যেন সাহাবীদের নিজ চোখে দেখেছেন। তার একটা বিষয় হলো পড়ালেখার বিষয়। তিনি প্রচুর পড়ালেখা করতেন। তার তৎকালীন চিন্তা-চেতনা বর্তমানে প্রতিফলিত হচ্ছে। তার প্রত্যেকটা বিষয় ছিল আদর্শিক। পাকিস্তানের সময় অনেকগুলো শাখা মডেল হিসেবে ছিল, জামালপুর, শেরপুর রাজশাহী আমার এখনও মনে আছে সবার উপরে ঢাকা মহানগরী ছিল অন্যতম মডেল। এ শাখা সবসময় সারা দেশকে প্রভাবিত করেছে। এখানে কর্মীদের মান, শিক্ষার্থীর মান, কর্মীদের আচরণ এবং ভাল ছাত্রদের বিরাট সমাবেশ ঘটতো।

তখনকার সময় সারা দেশে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে বিভিন্ন Journal পড়তেন, বই পড়তেন।

মালেক ভাই যখন ঢাকা সিটির সভাপতি তখন তার বিভিন্ন তৎপরতাও Approach সারা দেশে তেমনি প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের পর অসংখ্য মেধাবী ছাত্র সংগঠনে আসেন। মালেক ভাইয়ের মডেলকে কাজে লাগাতে পারলে আগামী দুই দশকের মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবির এদেশে বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

শহীদ আবদুল মালেক আমার কাছে এক অতিপ্রিয় নাম। শহীদ আবদুল মালেকের প্রসঙ্গ আসলেই আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। শহীদ আবদুল মালেকের সাথে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। শহীদ আবদুল, মালেক আমাদের প্রেরণার এক জীবন্ত উৎস। তাঁর মধ্যে খোদাভীতি, সততা, ছবর, ইসলামকে জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মানসিকতা, আধুনিক ও ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সুব্যবহার, দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতাসহ অসাধারণ যেসব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল তা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। আমার মধ্যে একটি আফসোস রয়ে গেছে যে, শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের মত হতে পারলাম না।

www.icsbook.info

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের

মালেক ভাইয়ের নাম তো আগে শুনেছি। আমি প্রথম দেখি উনাকে ১৯৬৪ সালে। '৬৪ সালে তালাবা ইলমের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন উপলক্ষে আমি চট্টগ্রাম থেকে আসি। আমাদেরকে জানানো হয়েছিল ৩৪ আগামসি লেনে ইসলামী ছাত্রসংঘের অফিস। এখানে আসলেই সব তথ্য জানতে পারবেন। আমি কমলাপুর থেকে নেমে রিক্সায় আগামসি লেনে যাই। সেখানে ঠিকানা তালাস করে বের করি। একটা বাউন্ডারি ওয়ালা ছোট্ট বাড়ির মতোই। ঢুকার সময় দেখি টিউবওয়েলে একজন ২২/২৩ বছরের যুবক কাপড় কাচছে সাবান দিয়ে। আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করি, তিনি বললেন, আপনি পাশে অপেক্ষা করুন লোক এসে আপনাকে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে দেখি ঐ আধা ভেজা পাজাম-পাঞ্জাবী পরে একজন ফাইলপত্র সহ বের হয়ে গেলেন। পরে লোকদের সাথে আলাপ করি, তখন উনারা বললেন যে উনি আমাদের আবদুল মালেক ভাই, ঢাকা মহানগরীর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি। এইটুকুই উনার সাথে আলাপ-আলোচনা হয়।

পরে চট্টগ্রামে আমাদের একটা শিক্ষাশিবির। ছিল সেখানে মালেক ভাই বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আমার যতটুকু মনে পড়ছে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা এই বিষয়ের উপর উনি আলোচনা পেশ করেন। খুবই প্রাণবন্ত এবং প্রাঞ্জল ভাষায়। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি ভবিষ্যতে অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নতি হবে আর এটি ইসলামী আন্দোলনে কাজে লাগানোর একটা বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে। একথাও বলেছিলেন যে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতিও সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী শক্তি বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্র এবং নির্যাতন বেড়ে যাবে। উনি এত দূরদর্শি ব্যক্তি ছিলেন যে, সেই সময় যা বলেছেন এখন তার প্রায় ৩০/৩৫ বছর পরে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। উনার বক্তৃতাটা আমাদের সকলকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। এছাড়া উনি একটা পাঠচক্র পরিচালনা করতে গিয়ে একদিন আমাদের সাথে ছিলেন। ঐ প্রোগ্রামেই উনার সাথে বাস্তবে পরিচয় ও কথা বার্তা বলার সুযোগ হয়। এটা ১৯৬৫ সালেই হবে। এরপর বিভিন্ন প্রোগ্রামে, পরবর্তীকালে ঢাকায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম গুলোতে যখন আসছি তখন দেখা সাক্ষাত হয়েছে।

শহীদ মালেক ভাই এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যে, সাহাবীদের অনেক কিছুই উনার মধ্যে দেখা যায়। সহজ সরল জীবন এবং Simple ভাবে চলতেন। এটা প্রায় সকলেই জানে- উদাহরণ দিয়ে বলার দরকার নেই। উনার ব্যবহার আমল আখলাক, অন্যদের সাথে মেশা, ইসলামী আন্দোলনের জন্য ত্যাগ কুরবানী সব মিলে ব্যক্তিগত জীবনটা একেবারেই মুমিনের জিন্দেগীর প্রতিচ্ছবি ছিল। পাশাপাশি উনার জ্ঞানের গভীরতা, বলিষ্ঠ বক্তব্য এগুলো আমাদের আকৃষ্ট করার মতো ছিল। মাসিক 'পৃথিবী'তে তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর একটা কলাম লিখতেন, এটা যারা পাঠ করতেন তারাই জানেন, কত পান্ডিত্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণমূলক লেখা ছিল সেগুলি। জ্ঞান আমল, তৎপরতা সব দিক থেকেই উনি একজন মডেল ছিলেন।

এনামুল হক মঞ্জু

শহীদ আবদুল মালেক ভাইকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। উনি যে মাসে ঢাকায় শাহাদাত বরণ করেন সে মাসেরই কোন একদিন আমি চট্টগ্রাম কলেজে ১ম বর্ষে ভর্তি হলাম এবং সংগঠনে যোগদান করলাম।

সংগঠনের দায়িত্বশীল ভাইদের কাছে শুনতাম শহীদ মালেক ভাইয়ের কথা। চট্টগ্রাম কলেজে আমরা পালন করলাম শহীদ মালেক সপ্তাহ। এ উপলক্ষে বের হল একটি সংকলন যা সারাদেশে প্রসংশিত হয়। মনে পড়ে সেই সংকলন নিয়ে আমরা গ্রুপ করে ছাত্রদের মাঝে, সুধীদের মাঝে বিক্রি করতাম। বিশেষত চট্টগ্রাম কলেজের প্রত্যেক শিক্ষকের বাসায় গিয়ে বিক্রি করেছি। সবার মাঝেই শহীদ মালেকের মেধা ও প্রতিভার আলোচনা শুনেছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখলাম- মালেক ভাইয়ের

www.icsbook.info

শাহাদাতের অল্প সময়ের মধ্যেই সেদিন মালেক ভাইয়ের প্রিয় সংগঠন ছাত্রদের মাঝে গণসংগঠনের পরিণত হল। শাহাদাতের সরাসরি ফসল এটা। শহীদ মালেক আমাদের আন্দোলনের সবচেয়ে গর্বের উত্তরাধিকার।

আহমদ আবদুল কাদের

শহীদ আবদুল মালেক এদেশের ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের এক অমর শহীদের নাম। জ্ঞানে, মেধায়, মননে, চরিত্রে, নিষ্ঠায়, তাকওয়ায়, সাহসিকতা ও কর্মচাঞ্চল্যে তিনি ছিলেন অনন্য অসাধারণ, প্রজ্জ্বল এক শিখা। জীবনের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি রেখে গেছেন এদেশের ইসলামী আন্দোলনে এক সুগভীর প্রভাব। নিজের রক্ত দিয়ে এ পথে চলার শক্তি যুগিয়েছেন তিনি। অনাগতকাল ধরে তাঁর ত্যাগ ও কুরবানী প্রেরণা যুগাবে সত্যের পথের সৈনিকদের। যুগ যুগ ধরে দুর্নিবার সাহস যোগাবে আমাদের রক্ত রাঙা শহীদি পথে চলার জন্য।

মৃত্যুর মাঝেও যারা জীবনের জয়গান গেয়ে যান তিনি তাদেরই একজন। দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়াকে পিছনে ঠেলে দিয়ে-তিনি বেছে নিয়েছিলেন খুন ঝরা পথ। সে পথ ধরেই তিনি পৌঁছে গেলেন কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে। সে মঞ্জিলের নাম শাহাদাত।

তাঁর রক্তস্নাত স্বপ্ন ছিল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজ বিপ্লব। রমনার সবুজ চত্বরে ফিনকি দেয়া তাঁর তাজা খুন আজো ডাক দিয়ে যায় সে পথে চলার। অকুতোভয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।

সাইফুল আলম খান মিলন

মালেক ভাইয়ের সাথে আমার যখন পরিচয়, তখন তিনি জীবন দিয়ে বাংলার মানুষের ঘুম ভাঙিয়েছেন। তার শাহাদাতের সে রক্ত শিখা বহুদূর থেকে আমাকে আলোকিত করেছিল। আমার মনে হয় মালেক ভাইয়ের জীবনী আরও বেশী করে ছাত্র সমাজের কাছে তুলে ধরা দরকার। আল্লাহর গোলামী, অতি সরল জীবন, মেধা ও জ্ঞান চর্চার এক প্রচন্ড শক্তি মালেক ভাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মেধা, বাগ্মীতা, ক্ষুরধার যুক্তি ও তুখোড় সাংগঠনিক তৎপরতার কাছে জাহেলিয়াত পরাজিত হয়েছিল। তাই একা পেয়ে মালেক ভাইকে ওরা আঘাত করেছিল। কিন্তু হেরার আলোকে আলোকিত সে মশাল তারা নেভাতে পারেনি। আজও সে মশাল বিতরণ করছে আলোক অজস্র ধারায়। মালেক ভাই দেখিয়ে গেছেন খোদাভীতি, সরল জীবন, মেধা আর পরিশ্রম প্রিয়তা থাকলে জাহেলিয়াত জয় করা যায়। আমাদের আরও মালেক প্রয়োজন।

মুহাম্মদ তাসনীম আলম

১৯৬৯ সালে যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আমার সাথে সাক্ষাত ঘটেনি। তাঁর শাহাদাতের পর ১৯৭০ সালে আমি ছাত্রসংঘে যোগ দিই। জানতে পারি শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের ঘটনা একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র ছিলেন।

'৭০ সালে ছাত্রসংঘে যোগ দিয়ে উনার শাহাদাতের উপর একটা বই পড়ে আমার মধ্যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি তো রাজশাহী বোর্ডের ১১তম স্থান করেছিলেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে আকর্ষণ একটু বেশী হয়। তিনি সহজ ও সরলভাবে চলতেন। নাস্তার পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনতেন। আমলে জিন্দেগী সাহাবায়ে চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি নিজে ফ্লোরিং করতেন এবং মেহমানকে খাটে ঘুমাতে দিতেন। এটাও একটা আকর্ষণীয় দিক।

www.icsbook.info

আর একটা দিক আমাকে আকর্ষণ করতো সেটা হলো, যখন প্রোগ্রামে হাজির হতেন প্রস্তুতি নিয়ে হাজির হতেন। তিনি মাসিক পৃথিবীতে বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে লিখতেন। আর একটা বিষয় ভাল লেগেছে তা হলো, তিনি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করতেন।

ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতা হিসেবে, তিনি তিলে তিলে জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শাহাদাত আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমেই তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। প্রথমতঃ ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলামী বিপ্লব কায়েম করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাই মালেক ভাইয়ের জীবন অনুকরণীয়। বর্তমানে আমরা যদি সত্যের উপর টিকে থাকতে চাই তবে মালেক ভাইয়ের সহজ সরল জীবন তোমাদের অনুকরণ করতে হবে। তিনি নিজ হাতে পোস্টার লাগিয়েছেন, নিজ হাতে সংগঠনের ছোট খাট কাজ করেছেন। শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের চিঠি-বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ইসলামী জ্ঞানে তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। একদিক দিয়ে দুনিয়াবি পারদর্শিতা অন্যদিকে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিলো তাঁর।

জাহেলি সমাজ পরিবর্তন করে যদি আমরা ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চাই, তবে আমাদেরকে শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের সেই আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে।

ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের

শহীদ আবদুল মালেককে কখনো আমি দেখিনি, তবে বিভিন্নভাবে আমি তাকে পরে জেনেছি। শহীদ আবদুল মালেক ভাই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের Model ছিলেন। তাঁর শাহাদাত আন্দোলনের চলার পথে একটি Turning Point ছিল।

তাঁর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এক, তাঁর অতি সাধারণ জীবন যাপন এবং আন্দোলনের কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্তকরণ ও আন্দোলনের জন্য ত্যাগ। আরেকটি দিক যেটি আমাকে আকর্ষণ করেছে তা ছিল তাঁর অসাধারণ মেধা। তিনি ইসলামী আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত থাকায় একবার কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে বাকি বিষয়গুলো ভালো হবে না ভেবে ড্রপ দিলেন। পরে দেখা গেল যে, যে ক'টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাতে তিনি First Class Mark পেয়েছিলেন। যে গুণগুলো আজকে আমাদের অনেকের মাঝে অনুপস্থিত।

মালেক ভাইয়ের আদর্শের উপর দৃঢ়তা ও বিলাসিতা বর্জিত জীবনচারিতা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে সময় ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও সেক্যুলার আন্দোলনের একটি পাশাপাশি অবস্থান ছিল। সেই সময়েই মালেক ভাই শহীদ হন। মালেক ভাই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হবার কারণে তিনি শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলনের লোকদের নিকটই পরিচিত ছিলেন না, মেধা ও যোগ্যতার কারণে সকল ছাত্রদের মাঝে এবং তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন। যার কারণে তাঁর শাহাদাতের পর সকল ইসলাম ও দেশপ্রেমিক সচেতন জনগণের মাঝে চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। তারা ইসলামী বিরোধীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন এবং ইসলামী আন্দোলনের তাকিদ অনুভব করেছিলেন। তাঁর শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনের জোয়ারের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম

শাহাদাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত এক মহান মর্যাদা। এ মর্যাদা আল্লাহপাক তার সে সকল বান্দাদের দান করেন যাদেরকে তিনি কবুলিয়াত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে চান। শহীদ আবদুল মালেক ভাই ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম উৎকৃষ্ট ফসল। তাই তাকে আল্লাহ পাক বাছাই করেছেন ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ হিসেবে। আধুনিক জাহেলিয়াতের পঙ্কিল পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য শহীদ আবদুল মালেকের জীবনের প্রতিটি দিকই শিক্ষা ও প্রেরণার উৎস। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ক্যারিয়ার গঠনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেক। আন্দোলনের কঠিন ও দুর্গম পথে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শহীদ আবদুল মালেক একটি দীপ্তমান তারকা, যা যুগ যুগ ধরে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদেরকে জ্যোতি ছড়াবে। তিনি আদর্শ নেতৃত্ব, ত্যাগ ও আনুগত্যের তিনি এক ভারসাম্যপূর্ণ মডেল। তাই তার শাহাদাত আন্দোলনের সাথীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে এক অপ্রতিরোধ্য জজবা। মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের রক্তের প্রতিটি বিন্দু ইসলামী আন্দোলনকে শক্তি দান করেছে। এর গতিকে করেছে বেগবান। স্রোতকে করেছে অপ্রতিরোধ্য। তার শাহাদাতের পরেই ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কাজ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ যুবকের অন্তরে দ্বীনের এমন জজবা পয়দা করেছে যার পথ ধরে দ্বীন বিজয়ের জন্য তারা অকুণ্ঠ চিত্তে জীবনের সর্বশেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিতে প্রস্তুত। তাই হাজারো অপপ্রচার, জুলুম, নির্যাতন এবং লোভ-লালসা শহীদি কাফেলার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারছে না।

..... ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল .....

১৯৬৯ সাল তখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। মালেক ভাই এবং তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে কি সেই সময় তেমন কিছুই জানার সুযোগ হয়নি পরবর্তীতে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবদুল মালেক ভাই সম্পর্কে জানতে পাই মোহতারাম মওলানা মতিউর রহমান নিজামী ভাইয়ের একটি আলোচনার মাধ্যমে। এরপর অনেক লেখক আলোচনা এবং শহীদের লেখনির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। তবে যা আমাকে শহীদ আবদুল মালেক সম্পর্কে বুঝতে বেশী সহায়তা করেছে তা হল মওলানা আবু তাহের ভাইয়ের একটি উক্তি। বিন্দু মাঠে সিন্দু ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন আমাদের মাধ্যে যদি কোন সাহাবী আসতেন তিনি কেমন হতেন তারই একটি নমুনা পাওয়া যায় শহীদ আবদুল মালেকের মাঝে। শাহাদাতের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত হই ১৯৮২ সালের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার মাধ্যমে। ক্রমে ক্রমে শহীদদের সহকর্মী হবার শহীদদের জানাযায় শরীক হওয়ার আর খোকসাবাড়ী সহ শহীদদের কবরের পার্শ্বে দাড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা বাংলাদেশের অগণিত শহীদের রক্তের মাঝে কোন পার্থক্য অনুভব করিনি। বরং মনের অজান্তে এই শব্দটি বারবার ধ্বনিত হয়েছে যে, শহীদ আবদুল মালেক তিনি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে শহীদ মালেকের উত্তরসূরীরা ছড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন দিকে এখনকার সময়ের দাবী হচ্ছে শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন আর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এজন্য প্রয়োজন তাকওয়া, মৌলিক মানবীয় যোগ্যতার শীর্ষে পৌঁছানোর সাধনা, যে পথে শহীদ আবদুল মালেক আমাদের প্রেরণার উৎস। আল্লাহ পাক আমাদের শহীদ মালেকের মত শ্রেষ্ঠ দা'য়ী হওয়ার তৌফিক দিন। সাথে আমরা সমসাময়িক সুযোগের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানবতার সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে পারি আর আমরা প্রত্যেকে এক এক ফিল্ডে একটা মডেল গড়ে তোলার নিরলস চেষ্টা চালাই। এজন্য মালেক ভাইয়ের মত নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমাদের Intellectual Supremacy অর্জন করতে হবে। সর্বোপরি মালেক ভাইকে অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুগভীর করার জন্য।

..... আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ .....

যখনই আবদুল মালেক শহীদের শাহাদাতের কথা চিন্তায় আসে তখনই নিজের ক্ষুদ্রত্বের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যাই। মনে হয় তিনি হচ্ছেন দূর আকাশের বুকে জ্বল জ্বল করা এক অনিন্দ্য সুন্দর ধ্রুবতারা আর আমি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্থির দৃষ্টির এক মুগ্ধ বালক। ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরের এক ঘরোয়া আলোচনা সভায় প্রথম তাঁর নামের সাথে পরিচিত হই। আলোচকগণ অধিকাংশই তাঁর সাথী। তাদের বক্তব্য শুনছিলাম আর বিস্ময়ে ভাবছিলাম- আল্লাহ কোন কোন মানুষকে এভাবে বিশিষ্টতা দান করেন। এভাবেই অপর দশজন থেকে আলাদা করে নেন।

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের পর ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম শহরের স্কুল ছাত্রগণ খুবই আকর্ষণীয় একটি স্মারক প্রকাশ করে। নাম 'পায়রা'। তার একটি কপি আমার হাতে এসে পৌঁছে। প্রতিটি লেখা আমাকে উদ্বেলিত ও উদ্ভাসিত করে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত ছিল এক বিশেষ ঘটনা। মনে হয় যেন তিনি আমাদের সামনে আমাদেরই একজন ভাইকে চরিত্র মাধুর্য্য, সাংগঠনিক ক্ষমতা, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, অনুসরণীয় কর্মতৎপরতার এক অসাধারণ মাইল ফলক স্থাপন করে শতাব্দীর পথহারা তরুণদের জন্য বিরল দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন।

শহীদ আবদুল মালেকের লেখা প্রবন্ধ ও চিঠি, তাকে নিয়ে তাঁর নেতা ও কর্মীদের রচনাসমূহ পড়ে, সর্বোপরি বিগত ২৫টি বৎসর তাঁর সান্নিধ্যে আসা লোকদের কথা শুনে মনে হচ্ছে শহীদ আবদুল মালেক এক মহীরুহ গোলাপ ঝাড়- যেখান থেকে প্রতিদিন সুরভি ও সুষমা ঝরে পড়ছে, আলোকিত ও সুরভিত করছে আমাদের চারদিক।

হামিদ হোসাইন আজাদ

মালেক ভাইকে চোখে দেখিনি, তাঁর কর্মী হয়ে কাজ করার সুযোগও পাইনি। অতএব তাঁকে নিয়ে লিখা কি আমার জন্য ধৃষ্টতার নামান্তর নয়?

ভাবনার টানা-পোড়নের সন্ধিক্ষণে এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো মালেক ভাইয়ের ঐতিহাসিক লিখার কথা-

'আমাদের এই পৃথিবীতে জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব চলে আসছে বরাবর, এই বিরাট জীবন সমুদ্রে একটি জীবন বুদবুদের ন্যায় মিলে যায়, আর একটি জীবন পূর্ণ করে তখন তার স্থান। জীবন-মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ জীবনের সংস্পর্শে আসছি। কিন্তু জীবনের ও স্রোতের মধ্যে দুই একটি জীবনের সন্ধান মেলে, যা সর্ববিষয়ে সাধারণ হতে স্বতন্ত্র। মহত্ব, জ্ঞানে, কর্মে সে জীবন হয়ে উঠে আমাদের আদর্শ। তাঁকেই লক্ষ্য করে আমরা ছুটে চলি, এ সীমাহীন মহাসাগরের বুক চিরে। লেখাটির কথা মনে পড়তেই লেখার সাহস পেলাম। সত্যিই মালেক ভাই ছিলেন অসাধারণ। তাঁর মহত্ব, জ্ঞান ও আমল ছিল আদর্শস্থানীয়। তাই জীবন্ত মালেকের চেয়ে শহীদ আবদুল মালেক অনেক বেশী প্রভাবশালী। শরীরী মালেক ভাইকে দেখিনি একথা সত্য কিন্তু 'আদর্শ জীবন' মালেককে দেখছি জীবনের প্রতিটি বাঁকে।

আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত মনীষী খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?' শহীদ আবদুল মালেক তাঁর সেই আক্ষেপকে প্রশমিত করেছিলেন। কিন্তু দেশদ্রোহী খোদার দুশমনরা তাঁর অনুপম জীবনকে সহ্য করতে পারল না।

ইংল্যান্ডে এক স্টাডি সার্কেলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম খুররম জাহ্ মুরাদকে এক শিক্ষার্থী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি তো অনেক প্রতিভাধর শিক্ষার্থীদের দেখেছেন বা সার্কেল চালিয়েছেন, আপনি কি মনে করেন এদের মাঝে মাওলানা মওদূদী (রহ) এর মত চতুর্মুখী যোগ্যতার অধিকারী কেউ হবে? তিনি জবাবে বলেছিলেন, না এমন কাউকে দেখছিনা, তবে একজন ছিলেন, যিনি আল্লামা মওদূদী (রহ) এর মত হওয়ার সকল যোগ্যতা/প্রতিভা ছিল, তিনি হচ্ছেন আবদুল মালেক। কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা তাঁকে বাঁচতে দিলো না।

শহীদ আবদুল মালেকের শূণ্যস্থান আজও পূর্ণ হলো না। সন্ত্রাস কবলিত শিক্ষাঙ্গন ও দূর্নীতি কবলিত সমাজ অঙ্গন, আবদুল মালেকের মত নেতার অভাবের কথাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে বার

www.icsbook.info

বার দেখিয়ে দিচ্ছে। দুর্ভাগা বাংলাদেশ মূলতঃ এমন কিছু জীবনের অভাবেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতিচারণ যদি এমন জীবন গঠনে কাউকে উদ্বুদ্ধ করে তাতেই হবে এ মহান জীবনের স্মৃতিচারণ সার্থক।

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান

শহীদ আবদুল মালেক ভাইকে দেখার বা সাহচার্য্য লাভের সুযোগ আমার হয়নি। তবে ১৯৮১ সালের দিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগদানের পর থেকেই মালেক ভাইয়ের নাম শুনি। বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের নিকট থেকে বিভিন্ন টি.সি, টি.এস-এ শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের অনেক গল্প শুনেছি। যা আমাকেও আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। যাই হোক শহীদ মালেক ভাই কি রকম মেধাবী ছিলেন ২০/২২ বছরের একজন যুবক 'পৃথিবী'র মত গবেষণাধর্মী পত্রিকার বিশ্বপরিস্থিতি লেখা থেকে অনুমান করা যায়। জ্ঞানের পরিধি কেমন হলে এটা সম্ভব তা বুঝা যায়। সত্যিই এটা আমার কাছে অবাক লাগতো। তার জ্ঞানের ব্যাপকতা দেখে তার একজন অনুসারী হিসেবে আমিও গর্বিত। ইসলাম তথা ইসলামী আন্দোলনকে যে তার জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন তা তার উক্তি থেকে জানা যায়- 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের চাইতে ছাত্রসংঘের অফিস আমার নিকট অধিক প্রিয়।' শহীদ মালেক ভাই ছিলেন সত্যিকারের অনুসরণীয় নেতা। তিনি তার কর্মীদেরকে যে অস্বাভাবিক ভালবাসতেন শাহাদাতের ঘটনাই তার প্রমাণ। তিনি কর্মীদের রেখে যাননি বরং সকল কর্মীকে হায়েনাদের হাত থেকে নিরাপদে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর তিনি রওয়ানা দিয়েছিলেন। এরপরই ইসলামের দুশমনেরা পরিকল্পিত আঘাতের পর আঘাত করে শহীদ করে একালের শ্রেষ্ঠ নেতা, শহীদ আবদুল মালেককে। সার্বিকভাবে শহীদ আবদুল মালেক ভাই ছিলেন ইসলাম তথা ইসলামী আন্দোলনের জন্য একজন পাগলপারা নেতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ শাহজাহান

শহীদ মালেকের জানাযায় বিভিন্ন মতাদর্শের বুদ্ধিজীবির উপস্থিতি, পত্র-পত্রিকায় নেতৃবৃন্দের প্রদত্ত বিবৃতি এবং বিভিন্ন সংবাদভাষ্য প্রমাণ করেছে, শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত ছিল সর্বমহলে একটি যুগান্তকারী ও বেদনাদায়ক ঘটনা।

আবদুল মালেক-এর শাহাদাত এদেশে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে আরও তরান্বিত করেছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকদূর।

শহীদ আবদুল মালেক ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা এবং মেধাবী ছাত্র। তিনি ছিলেন অসাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী- যা সবার জন্যই অনুসরণীয়।

আল্লাহ শহীদ মালেকের আত্মত্যাগকে কবুল করুন। আমীন।

মতিউর রহমান আকন্দ

শহীদ আবদুল মালেক ভাইকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু তাঁর জীবন আমার জিন্দেগীর উপর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মনে হয়েছে জীবিত মালেক ভাইয়ের চাইতে শহীদ আবদুল মালেক ভাই আমার নিকট অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী।

১৯৮২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

www.icsbook.info

ঐ সময় আমার কাছে শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাত নিয়ে লেখা একটি স্মৃতি স্মারক সংকলন এসে পৌঁছল। সংকলনটি পড়ে শেষ করে ফেললাম। মালেক ভাইয়ের অনাড়ম্বর জীবন, বিনয়ী ব্যবহার, সাদাসিধে চলন ও জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা আমাকে দারুণ ভাবে আকৃষ্ট করলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদরঘাট পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে নাস্তার পয়সা বাঁচিয়ে বই কেনা ও পড়ার ঘটনা আমাকেও জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলো। সেদিন থেকে আমি মালেক ভাইয়ের বই কেনার অভ্যাস আমল করার চেষ্টা করছি। তার জ্ঞানের বিশাল পরিধি আমাকে বারবার অধ্যয়নের জগতে অবগাহন করতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

তাঁর জীবন আমাকে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করেছে। একজন সমর্থক থেকে শুরু করে তাঁর রেখে যাওয়া সংগঠনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমি তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছি।

উন্নত আমলের অধিকারী মালেক ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি প্রতি মুহূর্তে আমার মনে ভেসে বেড়ায়। তিনি যেন আজও আমাদেরকে সাংগঠনিক কাজ, দায়িত্ব পালন ও নিজের আমল সুন্দর করার জন্য তত্ত্বাবধান করছেন। এ অনুভূতিই আমার মনের মাঝে বারবার জাগ্রত হচ্ছে।

এহসানুল মাহবুব যোবায়ের

শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা একটি স্মরণিকা বের করতে যাচ্ছে শুনে আমি আনন্দ বোধ করছি। শহীদ আবদুল মালেক একটি সংগ্রামের নাম, একটি জীবন্ত ইতিহাসের নাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রতিভাবান ছাত্র শহীদ মালেক অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। ন্যায় ও সত্যের জন্য একজন মেধাবী ছাত্রনেতার আত্মত্যাগ এদেশের মুক্তিকামী ছাত্র জনতার জন্যে এবং বিশেষ করে ছাত্র সমাজের জন্যে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। একজন আদর্শ ছাত্রনেতার সবগুলো বৈশিষ্ট্য শহীদ মালেক ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান ছিল। সাংগঠনিক জীবনে একজন ভারসাম্য ও আদর্শ দায়িত্বশীলের অসাধারণ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শহীদ আবদুল মালেক। মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনায় দেশের সবগুলো জাতীয় দৈনিকে সম্পাদকীয় অথবা উপসম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল।

শহীদ মালেক ভাই ছিলেন এই উপমহাদেশের প্রথম শহীদ ছাত্রনেতা। তাঁর মহান শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের বরেণ্য নেতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেছিলেন, 'শহীদ মালেক এ উপমহাদেশের প্রথম শহীদ ছাত্রনেতা হতে পারেন কিন্তু শেষ নন।' শহীদ মালেক ভাইয়ের রক্ত সিক্ত পথ ধরে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে শত শত ছাত্র-যুবক শাহাদাতের নজরানা পেশ করছেন। শাহাদাতের সেই মিছিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আর শহীদ মালেক হচ্ছেন সেই মিছিলের সঞ্জীবনী শক্তি। আজ শহীদ মালেক ভাইয়ের ন্যায় ঈমানী চেতনায় দীপ্ত অসংখ্য যুবক তরুণের প্রয়োজন। শহীদি কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবির জাতির এ প্রয়োজন পূরণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে- শহীদ মালেক ভাইয়ের শাহাদাত দিবসে এ প্রত্যাশাই করছি।

www.icsbook.info

নিবেদিত কবিতা

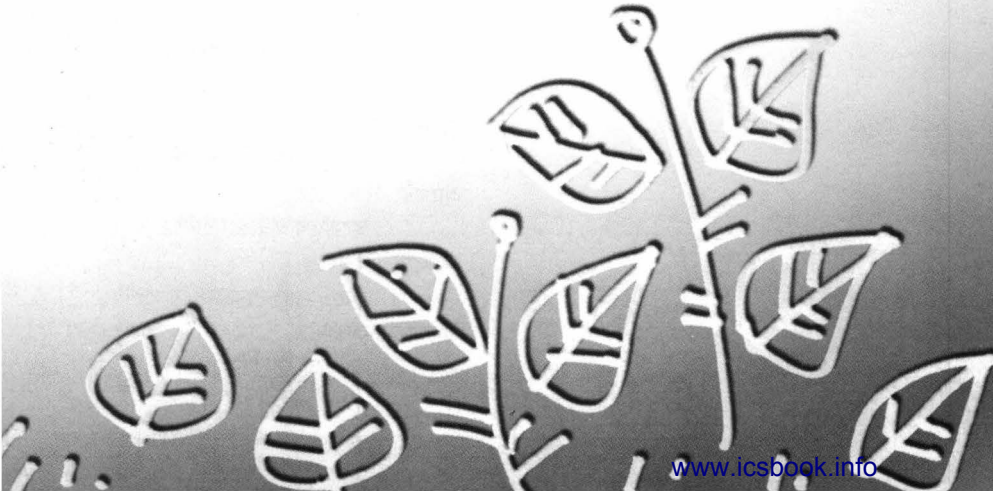

www.icsbook.info

ফররুখ আহমদের দু'টি কবিতা

মৃত্যুহীন প্রাণ

দেখো দেখো শহীদের মুখচ্ছবি উজ্জ্বল অম্লান
সুবে-উম্মীদের দীপ্ত কি প্রশান্ত আফতাব রওশন
(দুই জাহানের মাঝে অনিন্দিত, উৎফুল্ল আনন,
ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে আছে যার পানে জমিন-আসমান)।

পরম সাফল্য আর যে পেয়েছে সত্যের সন্ধান,
দুর্লভ সম্ভ্রম আর সৌভাগ্যের অধিকারী সেই
শহীদের মুখচ্ছবি দেখো (ম্লানিমার চিহ্ন নেই;
মহান ত্যাগের পথে সে আজ উন্নত; মহীয়ান)।

মৃত্যুহীন প্রাণ তার ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বস্তরে
উঠে যায় কী সহজে! কী সহজে জান্নাতের পথ
খুলে যায় একে একে প্রেমপন্থী নবীর উম্মৎ;
আল্লাহর স্মরণে যায় ঊর্ধ্বগতি অনন্ত অম্বরে!
নির্বাক বিস্ময়ে দেখি অকল্পিত শহীদি কিসমৎ
হিংসা হিংস্রতার বাসা পৃথিবীর পথে ও প্রান্তরে।

শহীদ আবদুল মালেক

যে ছিল জীবন তার
কূট চক্রের বাতেল পন্থীর
সত্যের সৈনিক সেই
মৃত্যুহীন সেই বীর দিলীর।
মুখে যার ছিল হাসি
বুকে যার প্রজ্জ্বল ঈমান
তরুণ শহীদ সেই
ছিল তব কামিল ইনসান।

দুঃখে বেদনায় দীপ্ত
সুমধুর তার জিন্দেগানি
আখেরী নবীর পথে
হয়েছিল প্রদীপ্ত নূরানী।
ইবলিসের ষড়যন্ত্রে
নিভে গেল অকালে যে প্রাণ
জান্নাতের ফুল হয়ে
ফুটেছে সে এখন অম্লান।

www.icsbook.info

শহীদ মালেক স্মরণে

আল মাহমুদ

চোখ মুদলেই আমি তোমাকে দেখতে পাই,
মনে হয় মেঘের ভিতর থেকে আলোর বিচ্ছুরিত ফোয়ারা।
মনে হয়,
আমাদেরই এক সহযাত্রী অন্ধকারের বেড়া ভাংতে গিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উনসত্তরের রাত্রির ওপর।
আজ যখন দেখি আমাদের জন্য একটি আলোকিত পথ
উদ্ভাসিত হচ্ছে, তখন আমি একাকী তোমার কথা ভাবি।
আবদুল মালেকেরা প্রকৃতপক্ষে কখনো একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি
দ্যাখো! অসংখ্য আলোকোজ্জ্বল মুখচ্ছবি এসে
তোমার তৈরি করা পথের উপর দাঁড়িয়েছে।
তাদের বুঝি শেষ নেই।
আমি একজন বৃদ্ধ কবি,
আমিও তোমার পথের উপরই হাতড়ে হাতড়ে দাঁড়িয়েছি।
পাখির কলকাকলির মতো অসংখ্য তরুণ কণ্ঠস্বর
আমার চেতনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।
কে জানে আমার বয়স কত?
কে জানে আমি পৌঁছাতে পারব কিনা,
যদি না-ও পারি, তবে এ পথের উপরি আমার অবসান ঘটুক!
এই আমার প্রার্থনা।

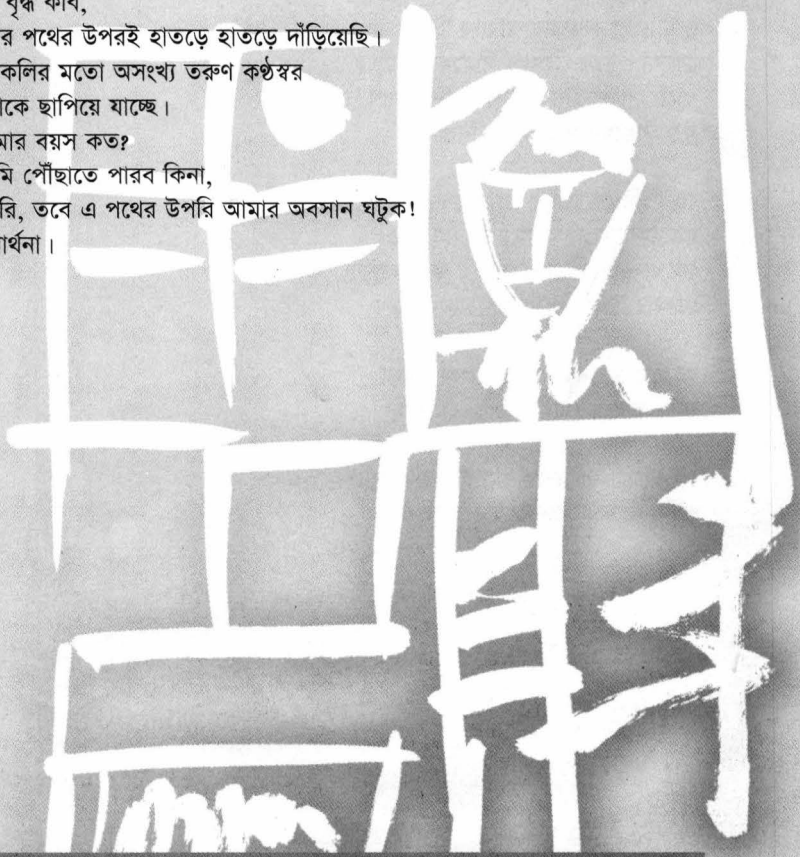

www.icsbook.info

শহীদ মালেক

মোশাররফ হোসেন খান

জীবন যেখানে মুষড়ে পড়েছে আজ
পৃথিবী হয়েছে বেদনায় চার ভাঁজ
চারিদিকে বিভীষিকা, মরুময় গ্রাম
তখন পড়েছে মনে স্বজনের নাম–
শহীদ মালেক। –সে তো নাম নয়;
উত্তাল তরঙ্গ, কেবলই বরাভয়।

দাঁড়িয়ে আছেন সাগরের রূপকার
এবং হাত তুলে ডেকে যান বারবার :

ঘুমায় কে আজ দরোজায় খিল দিয়ে
কে আছো আরুদ্ধ প্রবল প্রশ্বাস নিয়ে
ছুটে চলো রুদ্ধতার আবরণ ছিঁড়ে
ফেলো নোঙর তোমার সাহসের ভিড়ে।
পায়ে পেশো শোক-তাপ দুর্বার কিষাণ
মুক্ত বিহঙ্গের মত ওড়াও নিশান।

কে তিনি কে তিনি? কোন্ সেনাপতি?
রক্তপাথারে কে থামিয়ে দিলেন গতি?
কে বলেন : দাঁড়াও! দাঁড়াও তুফান ফুঁড়ে
তোমার উত্থান হোক মহাকাল জুড়ে।

হাঁকিয়ে চলেন তিনি বাতাসের ঘোড়া
ডানা তার স্বপ্নমাখা তেপান্তর জোড়া।

কে ডাকে, কে ডাকে শঙ্কাহীন কণ্ঠ কার?
শহীদ মালেক! ডেকে যান বারবার।

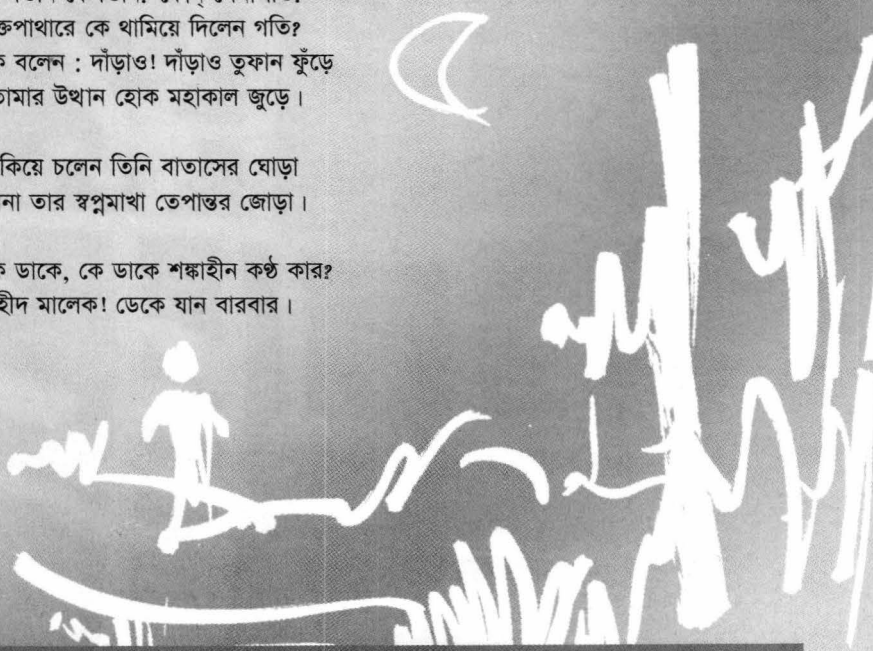

www.icsbook.info

প্রেমময় প্রভূর ডাকে

মজিবুর রহমান মন্‌জু

মালেক তোমার নাম শুনিছি
ভোরের শিশির কালে
প্রভাত আমার তাই রাঙিয়েছি
আলোর মশাল জ্বেলে

কঠিন শপথ কেন নিয়েছিলে
প্রদীপ কেন উঁচু করেছিলে
দ্বিধা, ভয় ছুঁড়ে প্রাণের আলোয়
জাগিয়েছিলে কেন?
সড়ক যখন ক্ষত ছিল নিশিদিন
পথিকের পদ হতো প্রায় রক্তিম
শির উঁচু করি তাকবীর ধ্বনি
ছড়াতেই তুমি এসেছিলে জানি
প্রেমময় প্রভূ স্রষ্টার ডাকে
চলে গেলে তুমি
আমাদের ছেড়ে!

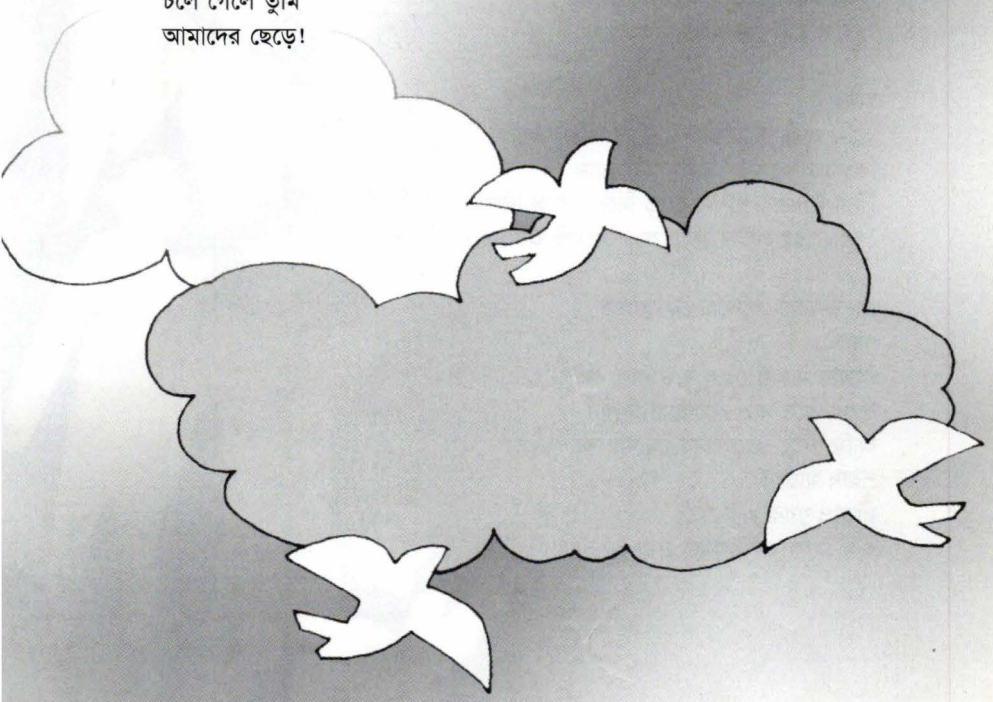

www.icsbook.info

অভিযান

মিয়া মুহাম্মদ তরুণ

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নামাজী ছাত্রদের উপর আওয়ামী আগ্রাসন স্মরণে)

গভীর আঁধার চিরে উচ্চকিত হয় আর্তনাদ
হায়েনার দল কামড়ে চলে, ছিন্ন ভিন্ন করে সব।
আলোর পাখিদের নৃশংস করে যেন-তেন
বলে- শালা, ইসলাম ছাড়বি- না হয় আবাস।
রক্তের দাগ কেটে চলে ওরা-
সামনে রেখে অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

অবশেষে
মহাজনকে ফরিয়াদ করে বলে-
থামাও তান্ডব, ফিরিয়ে দাও আমার অধিকার,
ব্যস্ত কণ্ঠে বলে- সমস্যা দেখা হবে- সবার।

হায়েনার দল ছুটে চলে- এক এক করে ছ'টি স্পটে
একইভাবে বেড়ে চলে রক্তের দাগ,
ভারী হয় নিশ্চুপ মিছিল- অগ্রভাগ।

অথচ
আমি পাড়ি দিয়েছি কত স্রোত কঠিন উদ্দাম
কিংবা প্রখর মরু, সাইমুম অবিরাম
ক্ষিপ্র ঈগলের পাখায় জুড়ে দিয়েছি লাল নিশান
স্বৈরাচারের প্রাচীর ফুঁড়ে কত গেয়েছি জয়গান।

কে রুখলো, বাঁধলো কে আমায়
আজ
আমার মাথায় বেঁধে দাও লাল কাপড়
হাতে তুলে দাও কালেমার নিশান
আমি ফিরে পেতে চাই, আমার ক্যাম্পাসে,
শহীদ মালেক
দাঁড়াও যুবক এক সারে
শুরু হোক তব : আজ শেষ অভিযান।

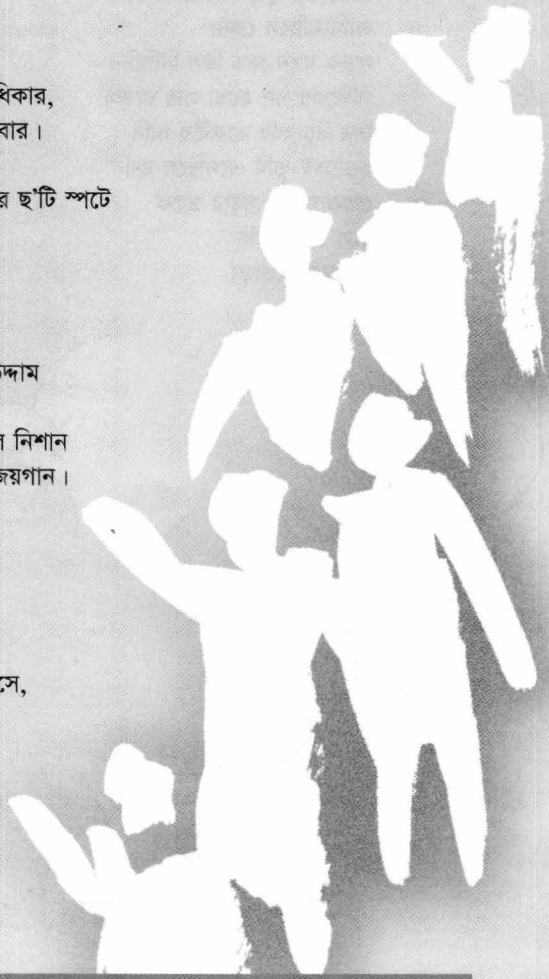

www.icsbook.info

জান্নাতের রাহবার

এম. ইউসুফ আলী

শহীদ মালেক, শহীদ মালেক বিপ্লবী এক নাম,
আল্লাহর পথে শহীদ যারা তুলনাহীন তাঁর দাম।
মৃত্যুকে হায় জয় করতে তিনি এসেছিলেন এই ভবে,
জীবনের গান এমন করে গেয়েছেন কে আর কবে?
মৃত্যুহীন এক সৈনিক তিনি, চির নির্ভীক মুজাহিদ,
আল্লাহর রাহে নিবেদিত, জীবন দিলেন হে শহীদ।
বুঝেছিলেন তিনি, সাম্য-মৈত্রী নিহিত আছে ইসলামে,
ইহ-পর শান্তিধারা, পরিপূর্ণ দ্বীন শুধুই আল-কুরআনে।
ভাবতেন তিনি, ধর্মহীন শিক্ষায় যদি তরুণ মনে ধরে ঘুন,
সে যেন তুষের আগুন জ্বলবে সমাজ, ধ্বংস হবে তমুদ্দুন।
জানতেন উহা শহীদ মালেক, জানতেন বীর ভাল করে,
দৃপ্তকণ্ঠে শহীদি বেশে, ফিরলেন তিনি আপন ঘরে।
ধরার জীবন ক্ষুদ্র ভীষণ, কতটুকু আর মূল্য তার,
শাহাদাতেরই মুকুট শিরে পরলেন ভারি চমৎকার!
আল্লাহর ভয় শুধুই তাঁকে করেছিলেন খোদ খোদাভীরু,
ওমরের মত দিলদরাজ- জায়নামাজে কাঁপতেন দুরুদুরু।
চেয়েছিলেন তিনি আল্লাহর দ্বীন, কুরআনের রাজ মনে প্রাণে,
নাস্তিকতার, খোদাহীনতার, চির পরাজয় সবখানে।
আল্লাহর রাহে রুখতে পারেনি, কোন বাধা কোন পটভূমি,
জেহাদের পথে, শহীদি বেশে পাড়ি দিয়েছেন মরুভূমি।
গেছেন ক্লাশে- গেছেন সংগ্রামে, জেহাদে-ময়দানে সারাবেলা,
আপোষ করেননি আহত হয়েছেন, তবু করেছেন মোকাবেলা।
এভাবে ভবে ক'জনে পারে নিজেকে বিলাতে নিঃশেষে,
আল্লাহর পথে শহীদ হতে দ্বীনের রাহে হেসে হেসে?
কতই স্বপ্ন দেখতেন তিনি- প্রত্যয় দীপ্ত ঐ চোখে,
জেহাদের পথে যায়নি থেমে, দুঃখ বেদনা শোকে।
শহীদ মালেক জানতেন- নেই কেহ এক আল্লাহ ছাড়া,
তাঁর দিদারের তীব্র টানে দমে হরদম পাগলপারা।
বদর, ওহুদ, খন্দক- আরো হবে কত শহীদ বারংবার,
শহীদ মালেক শহীদি মিছিলে জান্নাতের রাহবার।
এমন নসীবের পাগল আমরা, গাই কুরআনের গান,
দাও খোদা দাও আমাদেরও তুমি শাহাদাতেরই প্রাণ।

www.icsbook.info

মালেক, আমার ভাই

মোঃ আবদুল বারী

বাংলাদেশের প্রথম শহীদ, সবার প্রিয় মালেক ভাই,
শাহাদাতের সোনালী পথ ধরে গেলেন তাই।
বুঝেছিলেন মানুষের কল্যাণ আর মুক্তির পথ
মহান ইসলামই একমাত্র পারে দিশা দিতে।

ইসলামী শিক্ষার তাই বিকল্প যে নাই
মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের এই দাবী তাই।
তাঁর জোরালো ভূমিকা ছিল মহা আবেগের সাথে
কিন্তু তা মিশে দেয়া হলো রেসকোর্সের মাটিতে।

মালেকের শহীদি রক্তের কণিকায় কণিকায়,
লক্ষ মালেকের জনম হবে সুনিশ্চয়।
শহীদের রক্ত কভু বৃথা যেতে পারে না,
শহীদরা ইসলামের রত্ন মণি বিজয় নিশানা।

মালেক, তুমি আছো বিশ্ব মুসলিম অন্তরে,
জাগরণী জোয়ার যেন তুমি অথৈ পাথারে।
নির্মম ঘটনায় তুমি বিস্ময়ের এক বিস্ময়,
শাহাদাত পিয়াসী প্রেরণার এক মহাআশ্রয়।

তুমি মুসলিম বিশ্বে এক মহাধূমকেতু,
আঁধারে বাধিয়ে গেলে এক অগ্নি সেতু।
হে দূরদর্শী, তোমারে সইলনা যদিও ওরা
তব সুবাসে দেশ দেশান্তর একদিন হবে মাতয়ারা।
তুমি নিঃসীম আকাশের ধ্রুবতারা হয়ে,
নন্দিত হয়ে থাক দ্বীনিল হক্কের আলো ছড়ায়ে।

লেখক : শহীদের বড়ভাই

www.icsbook.info

লিমেরিক

ইসরাফিল আলম

সত্য কায়েমে যে করিবে পণ
বিপদ পদে পদে আসিবে তখন
অটল থাকিলে
সাহস রাখিলে
বিজয় লভিবে জানিও সুজন।

মালেক স্মৃতি

ওমর আল ফারুক

এক পোশাকের মালিকানায় চলতো সহজ যে জীবন
মালেক ছিলেন সাদাসিধে সে জীবনের এক উদাহরণ
মালেক ছিল তিন হরফের সাধারণ এক যুবকের নাম
কিন্তু,
কর্ম ছিল আকাশ ছোঁয়া, কে দেবে তার অমূল্য দাম?

মালেক ভাইয়ের দীপ্ত জীবন কীর্তি ভরা স্মৃতির পাতা
শিহরিত করে আজো , আলেখ্য তার চিঠির খাতা
মালেক ছিল দ্বীন কায়েমে, অমূল্য এক রত্নপাথর
শত্রু হতো তার পরশে বন্ধু এবং নম্র কাতর।

মালেক ছিলেন অগ্নিকণা, জ্বালিয়ে দিলেন আগুন
বিশুদ্ধ এক সমাজ গড়ার স্বপ্ন সোনার ফাগুন
সে আগুনের হিমেল পরশ
ছড়িয়ে গেলো সবখানে।
শহীদ মালেক জাগিয়ে দিলেন
ঘুমন্তদের একটানে॥

www.icsbook.info

আমি দেখতে চাই

তাসলিম হাসান সাবু

আমি দেখতে চাই তোমাকে
প্রকাশ্য দিবালোকে
ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বরে
অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে।
আমি দেখতে চাই তোমাকে
ঈমানী তলোয়ার হাতে
শ্লোগানমুখর
মিছিলে মিছিলে।
আমি দেখতে চাই তোমাকে
বাতিলের সাথে যুদ্ধরত
খালিদের মত শক্ত হাতে,
হলে হলে আর ক্যাম্পাসে।
আমি দেখতে চাই তোমাকে
ওমরের মত নির্ভয়ে
সত্যের আহ্বান-
চারিদিক ছড়িয়ে দিতে।
আমি দেখতে চাই তোমাকে
মালেকের মত
শহীদের বেশে
আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে।

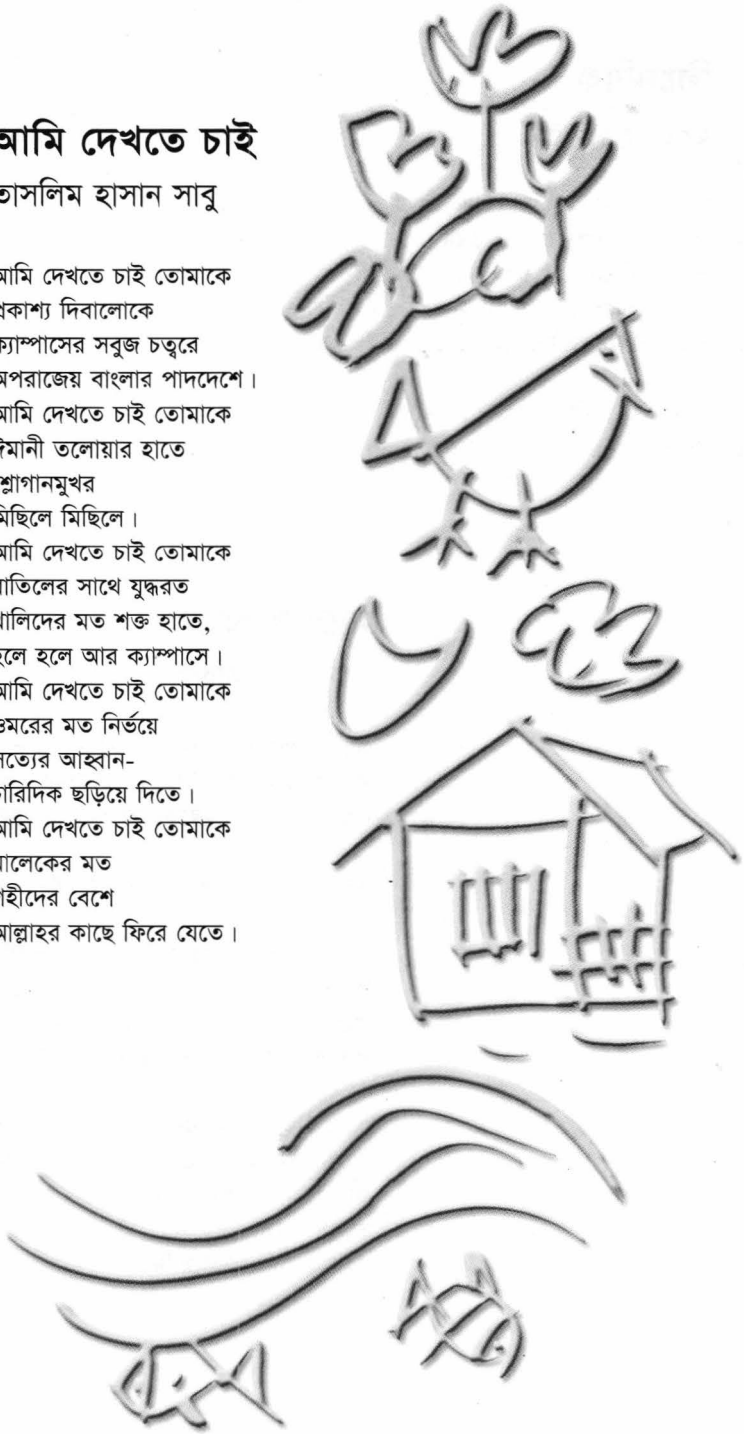

www.icsbook.info

স্বপ্নদ্রষ্টাকে নিবেদিত

আল মাহদী

তাকওয়ার চূড়ান্ত দ্বারে
পৌঁছেই কেবল শুধাতে পারে :
আল্লাহর দরবারে
একজন মুসলিম তার
নিত্য দরকার;
ব্যবহার্য গেঞ্জিখানা তোমার
ছিঁড়ে গেলে নতুন একটা কেনার
আগে বলে নিতে-
প্রিয়তম স্রষ্টার কাছে!
উঠেছিলে কতো উঁচুতে!
ঈমানের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে-
তুমি!
আমি, তোমাকে পারিনে আঁকতে-
দুর্বল, কম্পমান আমার লেখনীতে,
তোমার মেধার দ্বীপ্তি দেখে
ভীতবিহ্বল হয়ে
পড়েছিল হন্তারা।
ষড়যন্ত্র এঁটে তোমাকে
শহীদ করে
দিল আহা!
তবুও গেছো রেখে :
নিত্য 'প্রেরণা' বহমান;
দ্বীন কায়েমের শ্বাশত স্বপ্নের বুনন
বুনে গেছো আমাদের মনন;
সারাটা চেতনায়; মেধার ধূসর চারপাশে।
তুমি! অম্লান হয়ে থাকবে:
ব্যথিত হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে,
তুমি প্রতিদান পেয়ো : 'ফেরদৌস জান্নাত'
এই আমাদের সতত আকুল মুনাজাত।

www.icsbook.info

'Abdul Malek' the Cherished Hemloc

Md. Allama Iqbal

A little drop of Hemloc, just push in
The novel of mine, the core of carnal within.
But my nerve is not bad tonight
Like you, O you the wretched pompous sights.
Socratean hemloc art not thou to
Batter, the ballot of brain or adieu
The hornet on rose, the endless ardour
Who's also the part of supreme Creator.
Not thou art Shakespeare, peep in my mind,
Neoton nor thee in my head, invent jarking blind
O, the enlighten heart on my frozen soul,
Shake me to take
The Land of the greatest Host as thou,
Now His royal guest.

www.icsbook.info

নিবেদিত গান

www.icsbook.info

মালেক ভাইয়ের গান

মতিউর রহমান মল্লিক

শহীদ মালেক আজও আমায় ডাকে
সকল বাধা পেরিয়ে যেতে
সেই দিশারী আড়াল থেকে হাঁকে

ও আমি যখন পিছিয়ে পড়ি
দ্বীনের কাজে হেলা করি
খানিক ভুলের রাস্তা ধরিরে
শহীদ মালেক তখন আমায়
নতুন করে ডাক দিয়ে যায়
তার সে ত্যাগের রক্তমাখা বাঁকে

ও আমি যখন আমার শপথ
যাই ভুলে যাই হারাই হিম্মত
ভুলি দ্বীনের আসল কিমতরে
শহীদ মালেক তখন এসে
তপ্ত তাজা রক্তে ভেসে
আশার আকাশ আমার বুকে আঁকে।

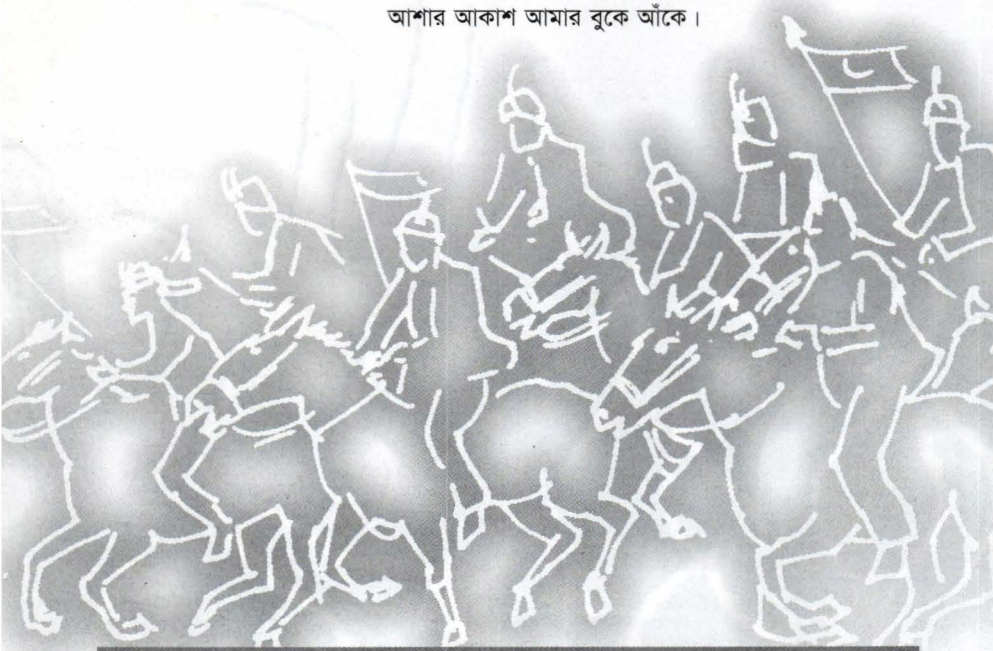

www.icsbook.info

আমাদের বুকে লেখা

জাকির আবু জাফর

আমাদের বুকে লেখা মালেকের নাম
সত্যের পথে বীর যারা লড়ে যায়
ইতিহাস লিখে রাখে কালের খাতায়
সেই বীর সংগ্রামী শহীদ মালেক
যার কাছে প্রিয় ছিল খোদায়ী কালাম
প্রিয় সেই মালেক আজ জান্নাতি ফুল
আল্লাহর প্রেমে আছে হয়ে মশগুল
যার তরে ঢেলে দিল রক্তের বান
তার প্রেমে ঘুচে গেল দুখ তামাম
ঘরে ঘরে জেগে ওঠে কিশোরের দল
মালেকের নামে আঁখি করে ছলছল
চোখে মুখে উচ্ছ্বাসে গভীর শপথ
মালেকের সেই কাজ দেবে আঞ্জাম
পৃথিবীর কোথাও যে আজ মালেক আর নেই
তবু যেন নদী হয়ে বহে অবিরাম
আমাদের বুকে লেখা মালেকের নাম
হৃদয়ের বুকে লেখা মালেকের নাম॥

www.icsbook.info

মালেকের স্বপ্নেরা

সাইম উদ্দিন খন্দকার হাসিব

মালেকের স্বপ্নেরা খেলা করে ঐ
রাতের আঁধার কালিমা চিরে-
শিকারীর বুলেটে আহত পাখি
থামে না তো হায়, উড়ে যায় নীড়ে।

চাঁদের টানে, জোয়ার আসে, নদীর দুকূল ধুয়ে
হাজার প্রাণে মালেক আসে বিপ্লবী সুর ছুঁয়ে।
কালেমার রোশনাই জ্বলে উঠে ঐ
লাখো জনতার সাহসী ভীড়ে॥

চারিদিকে ক্যাম্পাসে, আঁধার আঁধার
মালেকের চেতনাকে জাগাও আবার,

চাই না তো আর পাপের নদী, অন্ধ যুগের গ্লানি-
হাজার মালেক ডাক দিয়ে যায়, গড়তে জীবন খানি।

সুদীপ্ত প্রেরণায় নতুন মাঝি
ছুটে চলে আজ আশার তীরে॥

শহীদি গান

জুলফিকার হায়দার

মালেক তোমার রক্তে ভেজানো
সবুজ এই আঙিনায়
হেরার কাফেলা জাগছে আবার
শপথের পতাকায়॥

মৃত লেলিনের অনুচর হাঁটে চলে
দেয়ালে লিখনে কথায় তর্কে
আঁধারের কথা বলে
ওদের পেছনে তবুও চুপিসারে
পরাজয়ই কথা কয়॥

স্বার্থবাদীরা মাঝে মাঝে দেয় উঁকি
ক্ষমতা ফুরালে পালিয়ে বেড়ায়
জীবন মরণ ঝুঁকি
তবু মৃত্যুকে ভুলে মুজাহিদ চলে
খন্দকে আকাবায়॥

www.icsbook.info

নিবেদিত গলপ

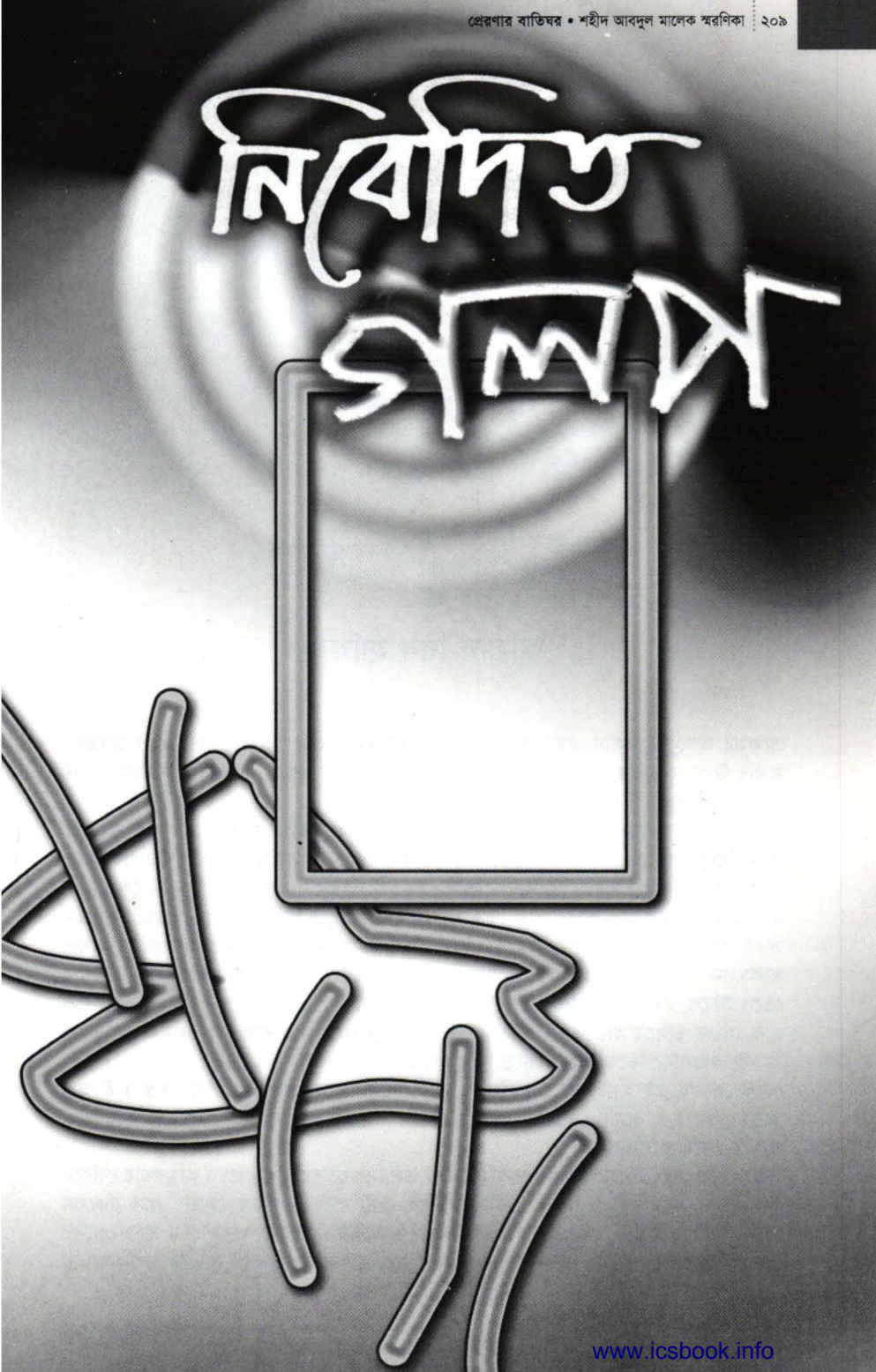

www.icsbook.info

গল্প

পনরই আগস্টের গল্প

আসাদ বিন হাফিজ

প্রফেসর আবদুর রহমান এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের একটা বেঞ্চের উপর বসে আছেন। মাথার উপর কড়া রোদ। শার্টের হাতা গুটানো। চুল উস্কো খুস্কো। অবিন্যস্ত বেশবাস। দৃষ্টি উদাস। চোখের মণি গতরাতের অনিদ্রার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

একভাবে বসে আছেন তিনি বেঞ্চটার উপর। অনেকটা ঝড়ো হাওয়ায় ডানা ভাঙ্গা কাকের মত ক্লান্ত, বিষণ্ন। অথচ এ সময় তার ক্লাশে থাকার কথা। গত রাতের দুঃস্বপ্নটা দেখার পর থেকে কি যে হলো- কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি। উহ! কী ভংঙ্কর দুঃস্বপ্ন। কারা যেন তাকে টানতে টানতে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হাত পা ছুঁড়ে যতই তিনি ছুটতে চেষ্টা করছেন ততই আরো শক্ত করে ধরে রাখছে ওরা। অসহায়ভাবে এ দিক ওদিক সাহায্যের আশায় তাকালেন তিনি। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না। দূরে-বহুদূরে এক ঝলোমলো প্রাসাদে এ সময় ভেসে উঠলো একটা মুখ। মুখে মৃদু হাসি। ঘনকালো চাপ দাঁড়ি তার মুখে। আবদুর রহমানকে ডাক দেয়ার ভঙ্গিতে হাত তুললেন তিনি। কিন্তু আবদুর রহমানকে ধরে রাখা লোকগুলো তাকে ক্রমেই আগুনটার দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

থেকে থেকেই এই স্বপ্নটা তাকে চাবকাচ্ছে যেন। বাসা থেকে বেরুলেও শেষ পর্যন্ত তাই আর ক্লাসে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। রিক্সাটা যখন টি.এস.সি অতিক্রম করছিল তখনই কি মনে করে রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়লেন।

রিক্সা থেকে নেমে প্রথমে একবার ঢুকেছিলেন টি.এস.সির ভেতর। কিন্তু প্রচণ্ড অস্থিরতায় বেরিয়ে এসেছিলেন সাথে সাথেই। তারপর টি.এস.সির ছোট্ট লনটা পেরিয়ে সোজা এসে ঢুকলেন পার্কে। হাঁটতে হাঁটতে এই বেঞ্চটার নিকট এসে থামলেন। বেঞ্চের আশপাশের সবুজ ঘাসের ভেতর কিছু খুঁজলেন খুব নিবিষ্ট মনে। থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দশটা বাজার

www.icsbook.info

পাঁচ মিনিট আগে এসে এই বেঞ্চটায় বসেছেন, সে প্রায় ঘণ্টা দুই হয়ে গেল।

শিশুপার্কের সামান্য দক্ষিণে যে এঁদো পুকুর তারই পাশে বেঞ্চটা। বেঞ্চের পাশ জুড়ে ঝোপঝাড়। কচি ইউক্যালিপ্টাসের চারা মাথা উঁচিয়ে আছে এখানে সেখানে। পায়ের নীচে সবুজ ঘাসের ডগা। পুকুরে তেমন পানি নেই। তলানীতে বৃষ্টির পানি জমে আছে সামান্য। পুকরের উত্তর পশ্চিম কোণে সিমেন্টের ছাতা আছে একটা। অবশ্য সেখানে যাবার চেষ্টা একবারও করেননি আবদুর রহমান। যদিও সেখানে রোদের উত্তাপ থেকে কিছুটা রেহাই পেতেন।

পার্ক এখন ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই চলে। কেবল কড়া রোদ উপেক্ষা করে দু'একটি জুটি নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে এখানে সেখানে, ঝোপের আড়ালে। যদিও এসে অব্দি আবদুর রহমান কারো দিকেই তাকিয়ে দেখেননি। প্রফেসর আবদুর রহমান বেঞ্চটা থেকে সামান্য দূরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দৃষ্টিটা ছেড়ে দিয়ে বসেছেন- এই দু'ঘন্টায় একবারও সেখান থেকে চোখ সরিয়ে নেননি। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় তাঁর দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে এসেছিল। তবু তিনি চোখকে অবসর না দেয়ায় এখন টপটপ নোনা পানি ঝরছে চোখ থেকে। পাশের একটা ঝোপে এ সময় খিল খিল করে হেসে ওঠে একটা মেয়ে। ধ্যান ভেঙ্গে যায় আবদুর রহমানের। এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নেন তিনি। মেজাজটা খিঁচড়ে যায়। হ্যাঁ, এখানেই ছিল মসজিদটা। মনে পড়ে সেদিন আকাশে ছিল আধবাঁকা চাঁদ। তারা ভরা আকাশ হাসছিল মিষ্টি মধুর। সন্ধ্যা উৎরে গেছে অনেক আগে। ব্যস্ত শহর ঢাকার মানুষ তখন গা এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়। ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের দু'চোখ। এসময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল একদল তরুণ। তাদের চোখে ঘুম নেই। আছে শপথের অগ্নিশিখা।

সেদিন এখানে বাগান ছিলনা, ছিলনা নিকুঞ্জবন। এখানে তখন বিরাণ মাঠ। উত্তরে ঢাকা ক্লাব আর দক্ষিণে হাইকোর্টের দেয়াল ছিল সীমানা। টি.এস.সিতে দাঁড়ালে দেখা যেত ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট ভবনের কঠিন পাথর। শত শত তরুণ চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছিল মাঠের বুকে। সন্তর্পনে কয়েকটি ট্রাক নেমে এসেছিল মাঠের ভেতর। ট্রাক বোঝাই ইট, বালু, সিমেন্ট। হাতে হাতে সেগুলো নেমে এলো নীচে। নেমে এলো সিমেন্ট, বালু, ইট। শুরু হলো কাজ। মুখে কারো শব্দ নেই। গভীর রাতের আবছা আলো আঁধারীতে কর্ম ব্যস্ত কতগুলো হাত দ্রুত উঠলো নামলো। রাত বাড়ছে। কাজ চলছে দ্রুত। দেখতে দেখতে ভিত্তিপ্রস্তর গাড়া হয়ে গেল। ইটের সাথে ইট লাগিয়ে শুরু হলো দেয়াল দেয়ার পালা। আধ হাত, একহাত, দুই হাত, তিন হাত- দেখতে দেখতে দেয়াল উঠে গেল আরো উপরে।

আবার হেসে উঠলো মেয়েটি। প্রফেসর আবদুর রহমানের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। তাকিয়ে দেখলেন যেখানে একদিন ছিল মসজিদের ভীত, সেখানেই উঠে দাঁড়িয়েছে অভিসাররত প্রেমিক জুটি। অক্ষম আক্রোশে উঠে দাঁড়ালেন আবদুর রহমানও। উঠতে গিয়েই টের পেলেন ঘামে নেয়ে উঠেছেন তিনি। জামা-কাপড় লেপ্টে গেছে গায়ের সাথে। এবার তিনি সরে এসে পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণের পার্কের বিশাল ছাতাটার নীচে আশ্রয় নিলেন।

বিষণ্ন নির্জন দুপুর। পুকুরের দিকে মুখ করে বসলেন তিনি। দু'একটা গাড়ী এই নির্জনতা ভেদ করে পাশের রাস্তা ধরে তীব্র বেগে ছুটে গেল। সে সব গাড়ীর হুইসেলের বিকট শব্দে একেকবার চমকে ওঠেন প্রফেসর আবদুর রহমান। কাছেই একটা ইউক্যালিপ্টাসের ডালে বসে এক নাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে একটা কাক। আর কোন শব্দ নেই কোথাও। বসে বসে তিনি কাকের বিশ্রি ডাক শুনলেন দীর্ঘক্ষণ। কাকটারও যে কি হয়েছে- সেই কখন থেকে ডাকছে, যাবার নামটি নেই।

সূর্য এ সময় পশ্চিমে হেলে পড়লো। অফিস ফেরত লোকজন কেউ কেউ তাকে পাশ কেটে চলে গেল। হৈ চৈ করতে করতে একদল ছাত্র-ছাত্রী বাড়ি ফিরছিল। তাকে দেখেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সরে পড়লো। কিন্তু কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই আবদুর রহমানের। উদাস দু'চোখ এখন তার সুদূরে নিবদ্ধ। পার্কের সবুজ বৃক্ষ ভেদ করে তার দৃষ্টি টি.এস.সি'র লাল সাদা দেয়ালে ঘুরলো। রোদের উত্তাপে দৃষ্টি পথে লাল হলুদ অসংখ্য ফুল খেলা করলো। আস্তে আস্তে তার

www.icsbook.info

চোখ থেকে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল সবুজ ঘাস, বৃক্ষ, দর, দালান, ভার্সিটি মসজিদের মিনার সব কিছু। তখন প্রফেসরের অবচেতন দৃষ্টিটা খুব প্রখর হয়ে উঠলো। আর সেই অবচেতন দৃষ্টি মেলে তিনি দেখলেন- টি.এস.সি'র ভেতর ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করছে। ধর মার চিৎকার ভেসে আসছে সেখান থেকে। ভেসে আসছে লাঠির ঠুকঠাক শব্দ। একদল ছেলেকে পালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন কেউ। কিন্তু ছেলেরা যেতে রাজি হচ্ছে না। নেতা খুব গম্ভীরভাবে ধমকে উঠলেন এবার। আস্তে আস্তে ছেলেরা মাথা নীচু করে যে যে দিকে পারে দৌড় লাগালো। শেষ দলটির সাথে বেরিয়ে এলেন নেতাও। আবদুর রহমান দেখতে পাচ্ছেন, শেষ দলটা এদিকেই ছুটে আসছে। পেছনে হকিস্টিক, লাঠি, রড হাতে করে ছুটে আসছে ষণ্ডা মার্কা আরেক দল ছেলে। তিনি দেখলেন, ছুটতে ছুটতে ছেলেরা প্রায় তার কাছটিতে চলে এসেছে। মরিয়া হয়ে ছুটছে সবাই। হামলাকারীরা সামনের ছাত্র দলটিকে ধরে ফেললো বলে। তখন আবদুর রহমানের অবচেতন দৃষ্টি অবাক হয়ে দেখলো, সাথীদের পালাবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য একটু একটু করে পেছনে সরে আসছেন নেতা। আবদুর রহমান দেখলেন, তার চোখের সামনেই হামলাকারীদের নাগালের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। নির্মমভাবে তার উপর লাঠি চালালো গুণ্ডারা। একজন তার বুকের উপর পা তুলে দাঁড়ালো। একজন মুখে লাথি চালাতে চালাতে বললো, 'বল, আর ইসলামের নাম নিবি?' নেতা তখন বেহুঁশ। তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সবুজ ঘাস। আর একজন তরুণ নেতার অসাড় অবচেতন দেহটা পেছনে ফেলে তখনও দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রফেসরের শরীর এখন বোধ শক্তিহীন। দৃষ্টি ঝাপসা। মাথায় এলোমেলো চিন্তার ঢেউ। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আমার মত তারও আজ ঘর সংসার থাকতো। থাকতো প্রিয়তমা স্ত্রী। থাকতো সন্তান-সন্ততি। আমাদের চাইতে ভাল চাকরীই করতে পারতেন তিনি।

www.icsbook.info

কারণ, তিনিই ছিলেন আমাদের মধ্যে সেরা ছাত্র। এ সব ভাবতে ভাবতে কি যে হলো তার। বাড়ি যাবার কথা একবারও মনে হলো না। মনে হলো না বাচ্চারা তার পথ চেয়ে বসে থাকবে। মনে হলো না, গভীর উৎকণ্ঠায় তার জন্য অপেক্ষা করবে এক প্রিয় রমণী। শুধু মনে হলো, তার সেই সংগ্রামী নেতা, যিনি বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোর চাইতে সংগঠনের অফিস আমার কাছে অধিক প্রিয়। সেই নেতা আবারও এসে দাঁড়িয়েছেন তার সামনে। তেজোদীপ্ত ভাষায় বলে চলছেন- ভাইয়েরা আমার, মনে রাখবেন, জিহাদী জিন্দেগী ছাড়া মুমীনের মুক্তির আর কোন পথ নেই। সংগ্রামের কঠোর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদের। পথহারা মানুষকে দিতে হবে পথের সন্ধান। তিলে তিলে যারা আজো এগিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে, ফেরাতে হবে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে। হয় আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে আমাদের চেষ্টায়, আর না হয় শাহাদাতের আবে কাওসার পান করে হাসতে হাসতে আমরা পৌঁছে যাব জান্নাতের বাগিচায়। এ-ই আমাদের পথ। এই আমাদের ভাইদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য।

আবদুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। প্রত্যয় দীপ্ত আভা এখন তার চোখে মুখে। ঠিক করলেন, জোহরের নামাজ আদায় করবেন এখানেই- যেখানে একদিন শহীদের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মসজিদ। অজুর জন্য পুকুরের ঢালু বেয়ে নীচে নামতে শুরু করলেন তিনি। ঢালুতে পা দিয়েই টের পেলেন একটা নয়, দু'টো নয় অসংখ্য ইট শুয়ে আছে ঘাসের নীচে। আস্তে আস্তে বসে পড়লেন তিনি। টেনে তুললেন একটা ভাঙ্গা ইট। গভীর আবেগে চেপে ধরলেন বুকে .... আর তখন পাহাড় বিদীর্ণ করে ঝরনার মত হু হু করে কান্নার ঢেউয়ে দুলে উঠলো তার শরীর। তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো দৃপ্ত শপথ, বাতিলের হিংস্র থাবায় ভেঙ্গে যাওয়া মসজিদের পবিত্র ইট ছুঁয়ে শপথ করছি, তোমার স্বপ্ন সফল না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই থামবো না, কিছুতেই না।

সেদিন থেকে প্রতিবছর নতুন ডায়েরী কেনার পর একটি তারিখ লাল কালিতে দাগ দেয়ার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল প্রফেসর আবদুর রহমানের। তারিখটা উনিশ শো উনসত্তরের পনরই আগস্ট।

www.icsbook.info

গল্প

তবে কি রক্তেই সমাধান

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

বাস থেকে শাহবাগ নেমেই ভাবলাম, 'শিনম্যাক' থেকে এককাপ চা খেয়ে যাই। টি.এস.সি আর মধুর ক্যান্টিনের গরম শরবত খেয়ে নাড়িতে একেবারে ছ্যাদলা পড়ে গেছে। যদিও এখানে চায়ের দাম একুট বেশী, তবুও সন্ধ্যায় দু'এক কাপ পেটে গেলে মনটা ঝরঝরে থাকে।

থাকি মহসিন হলে, টিউশনি সেই উত্তরায়। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে। কিন্তু উপায় নেই। বাড়ি থেকে টাকা আসবে মাসে মাসে সে ভাগ্য নিয়ে জন্মিনি। তাই লেখাপড়া নামক গরীবের বিলাসিতাটি চালিয়ে যেতে হলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে। মেজাজটা এমনিই বিগড়ে আছে। দুপুরে পকেটের অবস্থা ছিল গড়ের মাঠ। তাই মধুর ক্যান্টিন থেকে দু'টি সিঙ্গারা আর চার গ্লাস পানি দিয়েই চালিয়ে দিয়েছিলাম। টিউশনির টাকা পেলে ভেবেছিলাম মনিরকে নিয়ে রাতে ভূড়ি ভোজ করা যাবে। কিন্তু আশায় গুড়ে বালি। টাকা পাওয়া গেল না।

'শিনম্যাক' এ ঢুকেই দেখলাম জুয়েল। সাথে এক মেয়ে। চিনিনে। দেখিওনি কোন দিন। বুঝলাম ওর নতুন আবিষ্কার, আমাকে দেখে হাসল। তেমন গায়ে মাখল না। আমিও দূরের একটি টেবিলে বসে পড়লাম। গায়ে পড়ে আলাপ আমার অসহ্য, চা শেষ করে আসার সময় ডাকল জুয়েল। কাছে গেলাম। বলল- কোথায় যাচ্ছিস?

বললাম-ক্যাম্পাসে।

আজকাল তোকে তো টি.এস.সিতে মোটেই দেখা যায় না?

সময় পাইনে- বললাম আমি।

টিওশনি থেকে ফিরতে সন্ধ্যা গড়ায়।

জুয়েল বলল দেখা করিস। কথা আছে।

বললাম-কোথায়?

www.icsbook.info

ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায়, আগামীকাল ১১ টায়।
মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে আসলাম।
পুরনো ঢাকার আশ্চর্য ছেলে এই জুয়েল। বাবার আছে কাড়ি কাড়ি টাকা। চৌদ্দ পুরুষেও কেউ মেট্রিক পাস করতে পারেনি, জুয়েলই ব্যতিক্রম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে সবাই গর্বিত। ছেলের এই কৃতিত্বে বাবা ছেলের জন্য সব করতে রাজী। বাবার আদর আর প্রশ্রয় পেয়ে বখে গেছে জুয়েল। লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। ওর একমাত্র হবি হচ্ছে মেয়েদের সাথে ভাব করা। আজ একটা তো কাল আরেকটা। নানা ঢংয়ের নানা বর্ণের, ইচ্ছে হলেই আবার গুডবাই জানিয়ে দিবে।
চারুকলার সামনে এসেই ভাবলাম রুবেলের সাথে দেখা করে যাই। এসময় পাওয়া যাবে ওকে আড্ডায়। গত সপ্তায় ওর মামা অফিসের কাজে ঢাকায় এসে ওর সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাকে না পেয়ে আমার রুমে এসে বাড়ির খবর দিয়ে গিয়েছিল। সময়ের অভাবে খবরটা দিতে পারিনি। ভাবলাম আজ দেখা হলে দিয়ে যাব। ওপরে নীচে কোথাও পেলাম না তাকে। ভাবলাম নিচেই কোথাও থাকতে পারে। ওদিকে এগুতেই নজর পড়ল ওদের আড্ডায়। কলকে টানছে রুবলে। ধোঁয়ায় সবার মুখ যেন ঢেকে গেছে। গাঁজার গন্ধ টের পেলাম। আর এগুলাম না। ওখান থেকে হাঁটতে শুরু করলাম টি.এস.সির দিকে।
আসাদের সাথে দেখা করা দরকার। সরকারী দলের ক্যাডার। ক্যাম্পাসের রাজকুমার এরা। হলে থাকতে হলে এদের সাথে একটু-আধটু সম্পর্ক রাখতে হয়। না হলে কবে আবার তল্পি তল্পাসহ হল ছাড়তে হবে বলা যায়না। তাই আসাদের মত বন্ধু থাকাও বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে ভাগ্যের ব্যাপার। মাঝে মাঝে দেখা করে সম্পর্কটা ঝালাই করতে হয়। আসাদ আমার ক্লাসমেট। কিন্তু সম্মান করি বড় ভাইয়ের মত। না করে উপায় নেই।
আসাদকে সাধারণত ডাসের পেছনে সবুজ চত্বরটায় পাওয়া যায়। তাছাড়া সে আজ এ মেয়ের সমস্যা কাল ও মেয়ের সমস্যা ইত্যাদি সমাধানে সদা তৎপর। মেয়েদের সমস্যা সমাধানে আসাদের তুলনা হয় না। আমরা বুঝি সবই কিন্তু কিছু বলিনা। আসাদকে আজ পেলামনা কোথাও। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় অডিটোরিয়ামের সামনে চলে এলাম, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ক্যাফেটেরিয়ার সামনে এসে পড়েছি। হঠাৎ নজর পড়ল পাম্প হাউসের সিঁড়ির উপর। আবছা অন্ধকারে আসাদকে দেখে চমকে উঠলাম, সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত বিব্রতকর অবস্থায় লিডার আমাদের-এ আরেক নতুন রূপ দেখলাম। মুখ ভরে থু-থু এল। থু করে সশব্দে ফেলে দিলাম। সেখান থেকে সোজা চলে এলাম হলে। নামাজ পড়েই পড়ার টেবিলে বসার জন্য রুমে রওয়ানা হলাম। কাল ইনকোর্স। দেখলাম রুমের তালা খোলা। দরজার নীচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। মনির আছে নিশ্চয়ই, রুমে ঢুকলাম। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মনির। বুঝলাম মুড-অফ। বালিশের পাশে পড়ে আছে ফররুখের 'সাত-সাগরেরমাঝি'। আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম ও আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, এত সকালে ফিরলি যে?
কাল ইনকোর্স, বললাম আমি।
মনির যেভাবে ছিল সেভাবেই পড়ে রইল। টেনশন বাড়লে বা কোন দুঃখ পেলে মনির ফররুখ পড়ে এক নাগাড়ে। তারপর এভাবে পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
মনির প্রায়ই বলে, ফররুখ আর নজরুল হল আমাদের প্রেরণার উৎস। নজরুল-ফররুখ পড়লে হতাশা থাকে না। মনে হয় সাত-সাগর পাড়ি দিয়েও সবুজ দ্বীপের সন্ধান পাব একদিন। অথচ দেখ, এই ক্যাম্পাসে, যেখানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষিত হয়ে বেরুচ্ছে সেখানে নজরুল নেই, ফররুখ নেই। আছে রবীন্দ্র, সুনীল আর কোথাকার কোন রুদ্র শহীদুল্লাহ। এখানে মার্কস্, হ্যাগেল আর সূর্যসেনের চর্চা হয়। হয়না শুধু তারিক, খালিদ আর শহীদ মালেকের।
এসব দর্শন মার্কা কথা আবার আমার মাথায় ঢুকে না। আমার মাথায় শুধু পরিসংখ্যান আর ক্যালকুলাসের কোন অংক সহজ সূত্রে মিলানো যাবে। আর কোন স্যারকে কি পরিমাণ তৈল দিলে ইনকোর্সে ভাল নাম্বার পাওয়া যাবে, তাই ঘুরপাক খায় রাতদিন।
জামা ছাড়ছি। হঠাৎ মুনির বিছানা ছেড়ে প্যান্ট পরতে শুরু করল। বললাম কোথায় যাচ্ছিস? বাইরে। সংক্ষিপ্ত জবাব মুনিরের। বেরিয়ে গেল রুম থেকে, হাতে ফররুখের 'সাত-সাগরের মাঝি'।
মুনির কোথায় গেল তা আমার অজানা নয়। এখন ও যাবে নজরুলের কাছে। কাজী নজরুলের কবরের পাশে বসে বসে কবির সাথে গোপন কথা বলবে। তারপর যাবে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে

www.icsbook.info

যেখানে শহীদ মালেক লুটিয়ে পড়েছিল হায়েনাদের আঘাতে, যেখানে সেই স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদের সাথীদের নির্মিত মসজিদটিও ভেঙ্গে দিয়েছিল সত্য আর সুন্দরের শত্রুরা। সেখানে গিয়ে ও কিছুক্ষণ কাঁদে, তারপর বিড়বিড় করে শপথের মত কি যেন বলে। আযান হলে সেন্ট্রাল মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে রুমে ফিরবে। কোনদিন ডাইনিং-এ খাবার খায়, আবার কোনদিন না খেয়েই শুয়ে পড়ে। মন খারাপ হলে সাহিত্য আর কাব্যের পোকা মনিরের এটা নিয়মিত অভ্যাস। আজও সেখানে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

একবার ভাবলাম ডাইনিং সেরে এসেই টেবিলে বসি। আবার মনে হল এত তাড়াতাড়ি খেলে বিছানায় যাবার আগেই ক্ষিধে লেগে যাবে। টেবিলে বসে পড়লাম। স্যামুয়েল সনের প্রিন্সিপ্যালস্ অব ইকোনমিক্সটা উল্টাচ্ছিলাম। প্রোডাকশন থিওরিটা কেবল চোখের সামনে মেলে ধরেছি। হৈ-চৈ টা ঠিক তখনই কানে এল। মহসিন হলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থেকেও বুঝতে পারলাম বাইরের অবস্থা। গুলির শব্দও শুনলাম এক-দুই-তিন অনেকগুলো।

এসবে কোন উত্তেজনা বোধ করিনা। ক্যাম্পাসে এসব দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু মনিরের কথা মনে হতেই আঁতকে উঠলাম। এতক্ষণে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস পেরুতে পারেনি। হয়ত যদি কিছু হয়ে যায়। টেবিলে আর বসে থাকতে পারলাম না, বাইরে বেরিয়ে এলাম। গুলি বন্ধ হয়নি তখনও। বারান্দায় পায়চারী করছি। বেরুনোর উপায় নেই। অবশেষে গুলি থামল। হৈ-চৈ বন্ধ হল। প্রায় পনের মিনিট পর দ্রুত ছুটে এলাম গেস্টরুমের সামনে। অন্ধকার, একটু এগুতেই মুশফিকের সাথে দেখা। ছুটতে ছুটতে হলের দিকে আসছে। আমাকে দেখেই কেঁদে জড়িয়ে ধরল। সর্বনাশ হয়ে গেছে।

তার মানে? আশংকায় কেঁপে উঠল বুক। মনিরের বুকে গুলি লেগেছে। শীঘ্রই চল। তোকে ডাকতে এলাম। ওকে ছাড়িয়ে উদভ্রান্তের মত দৌড়াতে লাগলাম। সোজা সূর্যসেনের দিকে।

শুয়ে আছে মনির। কমার্স ফেকাল্টির পশ্চিম রাস্তায়। আহত মনিরকে দু'জনে ধরে এটুকুই আনতে পেরেছিলাম। তারপর আমাদের মনির লাশ হয়ে গেছে।

ছিদ্র হয়ে গেছে ওর বুক। পাল্টে গেছে ওর শার্টের রং। একেবারে টকটকে লাল। ওর আশেপাশে কোথাও 'সাত-সাগরের মাঝি'টা পেলাম না। যেটা ও হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল। তাকালাম মুনিরের দিকে, ওর সারা শরীর থেকেই যেন আবৃত্তির ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে-

'রাত্রি ভর ডাহুকের ডাক
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি। ছলনার
পাশা খেলা আজ পড়ে থাক।
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি
কান পেতে শোন আজ ডাহুকের ডাক।'

চারদিকে তাকালাম আবার। দেখলাম মালেক ভাই- এর ক্যাম্পাসে,
সবাই আছে
সবই আছে।

আনন্দ, প্রেম, কোলাহল, রাজনীতি, সংঘাত, সব। শুধু নেই সত্যের কলকাকলী, দ্রোহের মুষ্টিবদ্ধ হাত, ওমরের স্পর্ধা কিংবা স্বয়ং মালেক ভাই-এর সেই অকুতোভয় সাহস। আরো নেই মুনিরের সেই নজরুল, ফররুখ আর ইকবাল। আমি ব্যাকুল হয়ে লাশ হয়ে যাওয়া সাহস ও শুদ্ধতার গায়ে হাত রাখলাম। কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে ভেসে এল এশার আযান। 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্'-'ছুটে এসো কল্যাণের দিকে।' ঝাপসা চোখে তাকালাম মুশফিকের দিকে। টপ-টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার গাল বেয়ে। আমায় জড়িয়ে ধরে বলল- কবে মুয়াজ্জিনের আহ্বানে জাতির সবচেয়ে মেধাবী এই সন্তানরা সাড়া দিবে, বল মুনিরের এই ত্যাগ কবে স্বার্থক হবে, বল- তুই বল।

আমি তখন বিস্ময় বিহ্বলভাবে আমার হৃদয় থেকে যেন জিহাদের প্রতিধ্বনি হতে শুনলাম-

'মাঝে মাঝে হৃদয়ে যুদ্ধের হাহাকার উঠে,
মনে হয় রক্তই সমাধান, বারুদই অন্তিম তৃপ্তি
আমি তখন স্বপ্নের ভিতর জিহাদ - জিহাদ
বলে জেগে উঠি।'

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

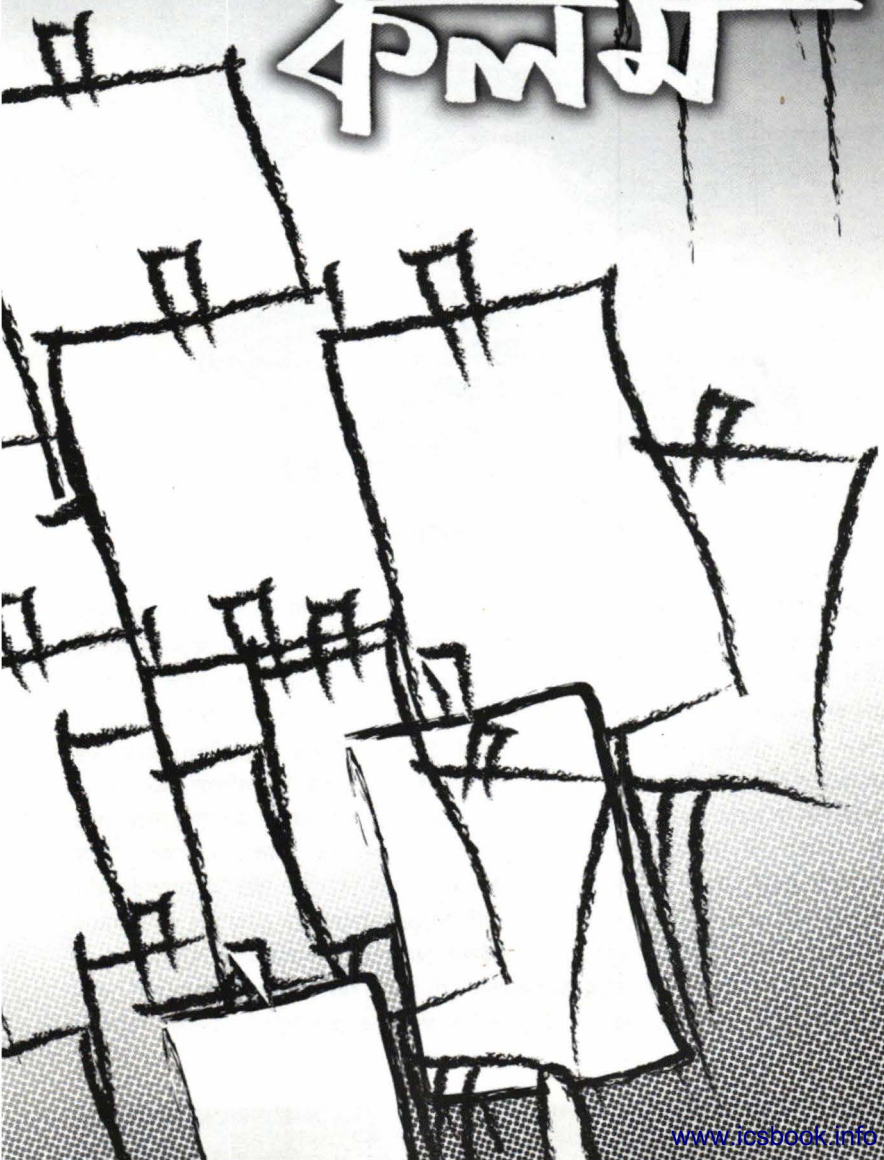

www.iosbook.info

উত্তরসূরীদের কলমে

গন্তব্য থোকসাবাড়ি

মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁইয়া

১৯৮৮ সালের কথা। একটি জাতীয় সাপ্তাহিকে চোখ বুলাতেই একটি শিরোনাম চোখে পড়ল- 'আজ শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত দিবস'। আর ক'টি সংবাদ শিরোনাম দেখে নেয়ার পর শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত দিবস সংক্রান্ত সংবাদটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লাম। মনে হল এ যেন এক প্রস্ফুটিত গোলাপ যার সৌরভে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তর সুরভিত হয়ে উঠছিল। কখনও মনে হচ্ছিল, এমন এক নক্ষত্রের আলোকচ্ছটা বিশ্ববাসী যার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অনাচার ও পাপাচারের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু শকুনীর হিংস্র থাবায় অকালেই ঝরে গেল ফুল, বঞ্চিত হল মানবতা, শংকিত হল ভুবনবাসী। পতন ঘটল একটি নক্ষত্রের। 'কিন্তু গোলাপের যতটুকু সুবাস এই ধূলামলিন পৃথিবী গ্রহণ করতে পেরেছিল তার কিয়দংশেরও যদি সন্ধান পাওয়া যেত তবুও ধন্য হত জীবন।' এই অনুভূতি তাড়া করে বেড়াচ্ছিল প্রতিনিয়ত। সেই থেকে খোঁজা শুরু হল। যখনই মালেক ভাইয়ের কোন লেখা, লেখার অংশ, স্মৃতিচারণ তথা লেশমাত্র পাওয়া যেত তখনই তাকে ছোঁয়ার জন্য ছুটে যাওয়া ছিল আমার উপভোগ্যের বিষয়। তাঁর লেখা চিঠি, প্রকাশিত স্মরণিকা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের বাড়ি, সহপাঠী, সহকর্মী,

www.icsbook.info

সহযোগী এসব খুঁজে বেড়ানো তাদের কাছ থেকে মালেক ভাই সম্পর্কে কিছু জানতে পারা নিজের জন্য বড়ই সৌভাগ্য ও প্রাপ্তির বিষয় বলে মনে হত। প্রতি বৎসর ইসলামী শিক্ষা দিবসে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকী, জার্নাল, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা-গল্প প্রভৃতি দারুণ আগ্রহভরে পড়া বড় একটি অর্জনের বলে মনে হত। তাঁর স্মরণে যতবার স্মরণসভা, আলোচনা সভা, সেমিনার হয়েছে খুব বেশী সমস্যা না হলে সে সভায় যোগ দিতে ভুল হয়নি কখনও।

১৯৯১ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থানকালে বগুড়া, ধূনট, মানিকপটল বা খোকসাবাড়ির কাউকে পেলে যে মালেক ভাই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার বাসনা বা চেষ্টা থাকতো। স্থান, কাল পাত্রভেদে প্রশ্ন করা জানা আর উপভোগ করা হয়েছে অনেকবার। এটা শুধু স্বর্গীয় আবেগ-অনুভূতি আর ভালবাসা উদ্বেলিত হবার কারণেই নয় বরং তাঁর জ্ঞানের উচ্চমাত্রা, সাহসিকতা, সত্যনিষ্ঠা, বলিষ্ঠতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, তাকওয়া, মেধা, যোগ্যতা, ত্যাগ, বুদ্ধিবৃত্তির যে ছাপ লক্ষ্য করা গেছে তাঁর লেখায়, সহপাঠী ও সহকর্মীদের মূল্যায়নে সেটির কিয়দংশও যদি লাভ করে ধন্য করা যায় নিজেকে, সেই প্রচেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা ও লোভ ছিল অদম্য। কিন্তু 'মানুষের সব সাধই সাধ্যের গন্ডিকে জয় করতে পারে না।' একথা ভুলবার নয়। তবুও মানুষ চেষ্টা করে- বার বারে এভারেস্ট, সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করে নব নব দিগন্তের আবিষ্কার ঘটায়। নিজেকে খুব ক্ষুদ্র ভাবলেও সেই সব দুঃসাহসী অভিযানের অভিযাত্রীদের সাথে তুলনা করার অপপ্রয়াস মাঝে মনের মাঝে উঁকিঝুকি মারছিল। মনে হচ্ছিল শহীদ আবদুল মালেককে অনুসন্ধান করতেই হবে, গবেষণার জন্য না হলেও জানার জন্য। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল এহসানুল মাহবুব যোবায়ের ভাইয়ের সফরসংগী হয়ে প্রথম বগুড়া যাওয়ার সুযোগ হলে মনে হচ্ছিল এই বুঝি জীবনের অন্যতম একটি শখ বাস্তবায়নের সুযোগ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। কিন্তু না, সাংগঠনিক ব্যস্ততা আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে বগুড়া থেকে ধূনট যাওয়া হল না। সেক্রেটারী জেনারেলের ব্যস্ততার মাঝেও এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। দুর্গমপথ, সীমিত সময়, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, আওয়ামী জাহেলিয়াতের দুঃশাসন এসব কিছুই সাধ্যের অনুকূলে ছিল না। তাছাড়া এমন কোন সংগীও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না যার ফুরসৎ আছে সময় দেয়ার এবং শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের বাড়ির রাস্তা পরিচিত।

২০০২ সালের ২২ জুন কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক সেলিম রেজা ভাইয়ের বিয়ে। এ অনুষ্ঠান বগুড়া শহরে। দাওয়াত কবুল করার মাধ্যমে মনে হচ্ছিল এ যাত্রায় মরণপণ চেষ্টা করা হবে শহীদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তির যোগ্যতা কামনা করা মহামহিমের কাছে। সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে সামর্থ চাওয়া যেন তার মত হওয়া যায়, শত শত আবদুল মালেক যেন খুঁজে এনে এ আন্দোলনের নিশানবরদার করা যায়। দিশাহারা পথযাত্রী যেন পায় পথের দিশা, ভাতৃত্ব ও ন্যায়ের সৌধের উপর গড়ে ওঠে এক আদর্শ, আধুনিক ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র।

দুপুর ২টায় বগুড়ার উদ্দেশ্যে কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রওনা হওয়ার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে বাস ছাড়তে দেরি হয়। মনে হচ্ছিল কোন ষড়যন্ত্র আবার দানা বেঁধে মালেক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে কিনা। না তেমন কিছু নয়, যান্ত্রিক গোলযোগ। খানিক পরেই বগুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। এক বুক আনন্দ আর আশা; সাথে কিঞ্চিৎ দুরাশা ও ভয়। দুরাশার কারণ ছিল- 'Man proposes Allah disposes' -মানুষ ইচ্ছা করলেও আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। আল্লাহ এই আশা, ইচ্ছা ও বাসনা কবুল করেছেন কিনা সেতো কারোই জানা থাকার কথা নয়।

www.icsbook.info

ভাবতে ভাবতে গাবতলী পেরিয়ে মহাসড়কের দু'ধারে দিগন্ত প্রসারী মাঠ আর মাথার উপরে সাদা মেঘের ভেলা, সূর্য আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলছে।

মনে হল এ আকাশ, এ বাতাস সত্যের মশালের বাহক ও সিপাহসালার শহীদ আবদুল মালেককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আকাশ তার অশ্রু ঢালছিল মালেকের শোকে। বৃষ্টি আরো মুষলধারায় অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলে মনে হচ্ছিল, পাথরও বুঝি ভেদ হতে যাচ্ছে। কিন্তু ঘাতকচক্রের হৃদয় কি তার চেয়েও বেশী কঠোর? একবারও তাদের অন্তর কেঁপে উঠেনি এমন পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী মেধাবী তরুণকে উপর্যুপরি আঘাত করতে?

বগুড়া নেমেই পড়ন্ত বিকেলে আল্লাহর দরবারে সিজদায় মাথা অবনত করতে হল। কারণ সালাতুল আছরের সেটি ছিল শেষ সময়। অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। বগুড়া শহর শাখা শিবিরের অফিসে ফিরেই বিস্তারিত পরিকল্পনা। বাহন, চালক, সঙ্গী, ফিল্ম, ক্যামেরা প্রভৃতি উপকরণের পাশাপাশি পরিপূর্ণ মানসিক পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ঘুমোতে যাওয়া।

দু'টো মোটর সাইকেল নিয়ে ফজর পড়েই বের হওয়া। বগুড়া জেলার তৎকালীন সেক্রেটারী মাহমুদুল হাসান ভাইয়ের সাথে বসে যখন ধূনটের উদ্দেশ্যে রওনা করা তখন বার বার বৃষ্টির কারণে হোঁচট খেতে হচ্ছিল, মোটর সাইকেল থামাতে হচ্ছিল। যাত্রী চারজন, রেইন কোর্ট ৩টি। সে আরেক বিড়ম্বনা। শেরপুর পৌঁছে শহীদের ভাতিজাদ্বয়কে খুঁজে বের করা হল। কারণ তাদের সহায়তা ছাড়া রাস্তা চেনা যেমন দুঃসাধ্য, বাড়ি চেনা আরও দুঃসাধ্য। অবশেষে শহীদের ভাতিজা সংগঠনের জেলা সভাপতি ফজলুল হক ভাইকে সাথে নিয়ে ধূনটের পথে রওনা হতে হল। ২ কিলোমিটার দূরে গিয়েই আর এগুচ্ছিল না মোটর সাইকেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়ার কারণে চালক চোখ খুলতে পারছিলেন না। শেষে এক দোকানের পাশে বিরতি দিতে হল, কিন্তু বৃষ্টি তেমন কমছিল না।

আবার বেশী সাহস যুগিয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট করা। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে ছুটে চলা শহীদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। ধূনটের প্রতিটি মানুষকে দেখা মাত্রই মনে এই বুঝি আবদুল মালেক 'না সে তো জান্নাতবাসী, সে তো ধূলিধরায় নেই।'- আবার সম্বিত ফিরে আসে। আকাশের অশ্রু বর্ষণ মনে হচ্ছিল আল্লাহর দরবার কবুল হবেই। মালেক ফিরবেই। এক মালেক শহীদ হলেও সহস্র মালেক এই উর্বর জমিনে জন্ম নেবে, সত্যের সংগ্রামে ফুল ফুটবেই। ধূনট পেরিয়ে খোকসাবাড়ির পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তায় নামতে হল মোটার সাইকেল নিয়ে। তখন বাহ্যত মোটর সাইকেল আরোহণ ভয়ানক মনে হলেও ১৯৬৯ এর ১২ই আগষ্টের ভয়াবহতার সাথে তুলনা করতে অযুতাংশের চেয়েও কম বোধ করেই সাহস করে এগিয়ে যাওয়া। খোকসাবাড়ি পেরিয়ে মানিকপটল- শহীদের কবর যে বাড়িতে সেখানে পৌঁছতে কিছুটা জটিলতা দেখা গেলেও মনের সকল ভয়, শংকা আর দুরাশা কেটে গেল।

মনে হচ্ছিল আর যাই হোক শহীদ আবদুল মালেকের বাড়ি পৌঁছা গেল। জীবনের এক বড় প্রাপ্তি। শহীদের বাড়িতে পৌঁছামাত্র আত্মীয়-স্বজন সবাই আতিথেয়তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শহীদের সান্নিধ্যই আমাদের মুখ্য বিষয় ছিল, তাই ছুটে চলা শহীদের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে।

শহীদের মাজার যিয়ারত করতেই জান্নাতী আবেশে মনে হচ্ছিল কুরআনের সেই আয়াত- 'আল্লাহর পথে যারা শহীদ তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। বরং তারা আল্লাহর কাছে রিযিক প্রাপ্ত হয়।'

শহীদের গোরস্থানের পাশেই একটি ইসলামী শিক্ষার পাদপীঠ। সেখান থেকে একজন মুরুব্বী ও শিক্ষক বেরিয়ে আসলেন। হু হু করে কাঁদলেন। পরে বললেন তার স্বপ্নের কথা, 'ক'দিন আগে জান্নাত থেকে সুঘ্রাণ সমেত দু'টো বই/কিতাব হাতে নিয়ে আবদুল মালেক এসে তাকে উপদেশ

www.icsbook.info

দিলেন, সত্য-সুন্দর কথা শুনালেন এবং কিছুক্ষণ পরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।' এ সময় ঘুম ভাঙল এবং তিনি উঠে অজু করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লেন।

শহীদের বড় ভাই আবদুল বারী মুন্সী। আতিথেয়তা, আপ্যায়ন, ঔদার্য্য, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে যখন তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখন সতত মনে পড়ল কেন তার এ ব্যস্ততা, ত্রস্ততা। মনের অজান্তেই সে প্রশ্নের জবাব বেরিয়ে পড়ল তার মুখ থেকে। চোখ ছলছল, হৃদয়ে আবেগ, কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন- 'আপনারা যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন মালেকও তো সেখান থেকেই এ বাড়িতে আসত। আজ তেত্রিশ বছর পর মনে হচ্ছে- আমার ভাই আবদুল মালেক এসেছে তাই আজ আমার অন্য দিনের চেয়ে ভিন্ন অনুভূতি।'

কথা বলতে বলতেই কান্নায় বুক ভেঙে আসে সাক্ষাৎকারদাতা শহীদের ভাই আবদুল বারীর। তাঁর এস.এস.সি পরীক্ষার সময় পিতার ইন্তেকাল হলেও পিতার নিষেধাজ্ঞার কারণে পরীক্ষায় মনোনিবেশে যেন বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য ছোট ভাই মালেককে খবর দেয়া হয়নি। এ কথাও জানালেন আবদুল বারী ভাই।

শহীদের অসংখ্য গুনগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ী যখন প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করা শুরু করল তখন তা লিপিবদ্ধ করা বা মনে রাখা বেশ কষ্টকর মনে হলেও রামকৃষ্ণপুরের মাস্টার আবদুল জলিলের কথা ভুলাবার মত নয়। পুরো ধূনটে এই ভদ্রলোক জলিল পন্ডিত নামে খ্যাত। এই পন্ডিতের ভাষায় 'মালেক ছিল আমার জীবনের সেরা ছাত্র, বাড়ন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়। আমি তখনই বলেছিলাম এ ছেলে একদিন দুনিয়া জোড়া নাম কুড়াবে। তাই আমি তার পরীক্ষার খাতাগুলো সংরক্ষণ করে রাখতাম, অন্য ছাত্রদের দেখাতাম আর উপদেশ দিতাম এ ধরনের ছাত্র হওয়ার জন্য। আজও যখন মালেকের কথা মনে পড়ে আমার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম থমকে দাঁড়ায়। মনে পড়ে সেই মুখ যার অবর্তমানে আমি সর্বহারা। সেইসব শকুনীদের মাথা চিবুতে ইচ্ছে করে যারা চিনতে পারেনি মালেককে- হত্যা করেছে মালেককে।'

শহীদের আরেকজন বড় ভাই ডাঃ আবদুল খালেকের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে খোকসাবাড়ি অনাথভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সেইসব বৃক্ষরাজি, পুকুর, ঘর-বাড়ি যেখানে জন্ম হয়েছিল এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের। স্মৃতির পাতায় বন্দী রাখার জন্য শহীদের আবাসস্থল, অধ্যয়নস্থল সহ শহীদ পরিবারের ক'জন সদস্যকে ক্যামেরাবন্দী করার চেষ্টা করা হয়।

খোকসাবাড়ি থেকে শহীদের ছোট বোনের স্বামী ছাবেদ আলী মাস্টারের বাড়ি তথা নিউ সারিয়াকান্দির মরিচতলা গ্রামে হাজিরা দিয়ে কিছু স্মৃতির উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।

এরপর আবার শহীদের বাড়িতে ফেরা। সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে ছুটতে হল বগুড়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মন যেন কিছুতেই সরতে চাচ্ছিল না। তবুও সময় স্বল্পতার কারণে বিদায় নিতে হল শহীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে।

পথিমধ্যে শহীদের প্রিয় সাথী কামরুল ও বেলালের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন শহীদের ভাতিজা বগুড়া জেলা সভাপতি ফজলুল হক ভাই। যে কামরুল ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখতেন। তখন তিনি ছিলেন ঢাকা মেডিক্যালের ছাত্র। মালেক ভাই তাকে বিজ্ঞান শিক্ষায় যেমনি শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে সফল করতে চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন ইসলামী শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে তুলতে। তাই দাওয়াতী চিঠি লিখতেন; এমনকি করাচী যাওয়ার পথে বিমানে বসেও দাওয়াতী কলম কাজ চালিয়ে যেতেন। সেই কামরুল ভাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত হওয়া যেন এক জীবন্ত মালেককে খুঁজে পাওয়া। বাড়িটি খুব বেশী ঘনবসতিপূর্ণ নয়। দু'জন পুরুষ মানুষ পাওয়া গেল। উভয়েই মালেক ভাইকে আবেগ ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে লাগল। মনে হচ্ছিল গতকালও তারা মালেক ভাইয়ের সাথে ওঠাবসা করেছে এবং একজন জগৎশ্রেষ্ঠ মানুষের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছে।

www.icsbook.info

এরপর গোসাইবাড়ি বাজারে গিয়ে ডাক্তার কামরুলের ভাই নান্টু সাহেবের সাথে কথা বলা এবং সালাতুল আছর পড়ে মহীউদ্দিন সাহেব তথা যার বাড়িতে লজিং থেকে গোসাইবাড়ি স্কুলে পড়েছেন তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহীউদ্দিন সাহেবের ছেলের নামই বেলাল। যার কাছে শহীদ আবদুল মালেক অনেকবার দাওয়াতী চিঠি লিখেছেন। জোড়খালী শাহী বাড়ির এই মহীউদ্দিন সাহেবের শহীদ আবদুল মালেক ভাই সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসামূলক স্বীকৃতি শুনে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাঁর উক্তি-

'বড়ই নেক ছেলে ছিল, তাহাজ্জুদ পড়ত, পড়াশুনায় মনযোগ ছিল খুব বেশী, নম্র-ভদ্র এবং পরোপকারে তার জুড়ি ছিল না। তবে শুধু পড়ুয়া ছেলেদের মত একমুখী নয় বরং বহুমুখী প্রতিভাবান ছেলে ছিল। মানুষের সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বিষাদে নির্লিপ্ত থাকত না। এমনকি যখন আমরা টঙ্গী এজতেমায় যেতাম তখন ভার্সিটি থেকে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করে যেত। তার মত ভাল ছেলে আমি আর দেখিনি। একজন ইংরেজি শিক্ষিত ছেলে এত নেক হয় এটা এখনও কল্পনাতীত।'

এসব কথা শুনে হৃদয় যখন মালেক স্মরণ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন পড়ন্ত বিকেল। ধূনট ছেড়ে শেরপুর পৌঁছেই মাগরিবের সালাত আদায় করে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। এদিকে বার বার ঢাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি জাহিদ ভাইয়ের ফোন- কখন ফেরা হচ্ছে ঢাকায় এ তথ্য জানতে চেয়ে। রাতের টিকেট পূর্বেই কেটে রেখেছিলেন বগুড়া শহর সভাপতি জুয়েল ভাই। জুয়েল ভাইয়ের উষ্ণ আতিথেয়তায় ও বিদায় সম্ভাষণের মধ্য দিয়ে শহীদের জন্মস্থান বগুড়া ছেড়ে শহীদের কর্মস্থল ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা।

১৩ বছরের সাংগঠনিক জীবনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তি ছিল শহীদ আবদুল মালেকের জন্মস্থান ও কবরস্থান যিয়ারত।

আবদুল মালেকের 'প্রত্যয়ের আলোকে আমাদের জীবন' শীর্ষক লেখনীর ভাসা ভাসা যে অংশটুকু মনে আসছিল তা থেকেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ভেসে উঠছিল হৃদয়ে। সংশয়, হতাশা আর দোদুল্যমানতা ত্যাগ করে একমাত্র -

'আমার জীবন, আমার মরণ, আমার নামাজ, আমার কুরবানী আল্লাহর জন্য।'- এ বাণী স্মরণ হচ্ছিল। স্মরণ হচ্ছিল- 'নিশ্চয়ই আমি সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার মুখ ফিরালাম যিনি আসমান-জমীন সৃষ্টি করেছেন, আমি মুশরেকদের অন্তর্ভূক্ত নই।'

ব্যক্তি আবদুল মালেকের আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রেখে শপথ করলাম-আমরা নীরব হবনা, নিথর হবনা, নিস্তব্ধ হবনা যতদিন না আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে এ জমীনে প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

শহীদ আবদুল মালেক

আনোয়ার সাদাত

মানুষ পৃথিবীর সবকিছুকে নিজের মত করে পেতে চায়। কিন্তু প্রত্যাশার শতভাগ প্রাপ্তি কখনও কি সম্ভব? না কখনই সম্ভব নয়। তবুও মানুষ তার প্রত্যাশাগুলিকে তাড়া করে ফেরে। কেউবা আবেগের তাড়নায় আবার কেউ বিবেকের গতিধারায়। এ ক্ষেত্রে সবসময়ই কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। যারা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে বিবেকের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সফলতাকে ছিনিয়ে আনে। এরাই হল অনুকরণীয়-অনুসরণীয় চরিত্র। অন্যদের প্রেরণার উৎস। শহীদ আবদুল মালেক! এমনই এক অনুকরণীয়-অনুসরণীয় চরিত্র। এক ধ্রুব তারা এক প্রতিধ্বনি। যার অনুসরণে তমসাচ্ছন্ন তিমির রাত্রীতেও পথ চলা যায় নির্বিঘ্নে।

আবদুল মালেক জীবনযুদ্ধের অগ্রসেনানী। যার ছিল অসংখ্য প্রত্যাশা এবং লক্ষ্য। তিনি তাঁর লক্ষ্যপানে এগিয়ে গেছেন ঠিকই, কিন্তু বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু কখনও বিন্দুমাত্রও পিছু হটেননি। কোনও হতাশা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। মহান প্রভুর প্রতি ভরসা করে প্রতিটি বাধাকে অতিক্রম করেছেন আবদুল মালেক। ব্যক্তি চরিত্রে ছিলেন সুদৃঢ় এবং খুব জেদী। সকল সিদ্ধান্তে থাকতেন অটল। তাঁর বড় ভাই ডাঃ আবদুল খালেক বললেন- 'ও খুব জেদী ছিল। ওর জেদ পূরণ না হলে আত্মদহনে পুড়ে মরত কিন্তু কাউকে কষ্ট দিত না। ও তখন গোসাইবাড়ি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেছে। সকল শিক্ষকের স্নেহের পাত্র। হঠাৎ করে একাই সিদ্ধান্ত নিল, বগুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি হবে। একদিন কাউকে কিছু না বলে বগুড়া জেলা স্কুলে গিয়ে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করে। ততক্ষণে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। কিন্তু মালেক! দমবার পাত্র নয়। সে প্রধান শিক্ষকের নিকট তার পরীক্ষা নেবার জন্য বারবার অনুরোধ

www.icsbook.info

করে। তিনি প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও বারবার অনুরোধে কৌতূহলী হয়ে মালেকের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করেন।

মালেকের ফলাফলে প্রধান শিক্ষক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। এ কোন মেধা! যা গত কয়েক বৎসরের ভর্তি পরীক্ষায় দেখা যায়নি। অতি দ্রুত তিনি তাকে পূর্ববর্তী স্কুল থেকে বদলী সনদপত্র এনে ভর্তি হতে বলেন এবং সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আবার বাধার পালা। মালেক যে স্কুলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, সেই গোসাইবাড়ি স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে বদলী সনদপত্র দিতে নারাজ। শত অনুরোধেও চিড়ে ভিজছে না। মালেক তার জেদের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নিল সে জেলা স্কুলেই পড়বে, নয়তো পড়ালেখা বাদ দিবে। দু'পক্ষই অনড়। এক পর্যায়ে বগুড়া জেলা স্কুলে ভর্তির নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যায়। মালেক সেখানে চিঠি লেখে-

'স্যার, বদলী সনদপত্র পাচ্ছিনা তাই লেখাপড়া করা সম্ভব হবে না। আপনি যদি এমনিতে ভর্তি করেন তবে আসতে পারি।'

দু'দিন পরে জবাব চলে আসে-'মালেক তুমি চলে এসো। তোমাকে ভর্তি করা হবে।'

মেধাবী আবদুল মালেক! রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। দু'চোখে তার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন। তাঁর ইচ্ছা 'প্রাণ-রসায়নে' সম্মান পড়া। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়টি নেই। ভাবছেন কি করা যায়। বড় ভাই আবদুল বারীকে সাথে নিয়ে ছুটলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। পৌছলেন ঠিকই, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ভর্তির ক্ষেত্রে আবার সেই বাধা। কারণ, সেদিনই ১টা পর্যন্ত ছিল ভর্তি ফরম উঠানোর শেষ সময়। দু'চোখে তাঁর অশ্রু টলমল করছে। মুখটি বিমর্ষ। কিন্তু দমলেন না। করোনিককে একটি ফরম দেবার জন্যে বার বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু পেলেন না।

ভিতর থেকে এক স্যারের ডাক পড়ল। তিনি মালেককে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি জন্য বারবার অনুরোধ করছিলে? মালেক স্যারকে বিষয়টি খুলে বললে তিনি তার নম্বরপত্র দেখতে চাইলেন। নম্বরপত্র দেখেতো মহাখুশি। এমন ছাত্রকে কি হাতছাড়া করা যায়? কখনও না। এ নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন হবে। সাথে সাথে তিনি ফরম দেবার নির্দেশ দেন। হ্যাঁ, মালেক তাঁর স্যারের মনের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। হতে পেরেছিলেন তাঁর বিভাগের সেরা ছাত্র। তার প্রমাণ মেলে ৩৫ বৎসর পর আজ পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আরেক স্যারের মন্তব্য- 'তোমরা আর কি ছাত্র, আমি এক বিস্ময়কর ছাত্রকে পড়িয়েছি। যার নাম ছিল আবদুল মালেক।'

স্কুল জীবনেও মালেক ছিলেন অনন্য। তাঁর স্কুল জীবনের বেঁচে থাকা একমাত্র শিক্ষক আবদুল মালেকের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন, 'ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রই শিক্ষকের স্নেহের পাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু দু'এক জনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। মালেকের প্রতি আমার সেটি ছিল।'

সে সময় শহীদ মালেকের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁর বড় ভাই ডাঃ আবদুল খালেক প্রশ্নের জবাবে বললেন-'মালেকের পড়ালেখার ব্যয়ভারের উৎস ছিল তার বৃত্তির টাকা। ও স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরেই বৃত্তি পেয়েছিল।'

এ হল অনন্য চরিত্রের আবদুল মালেক। আর আমরা! প্রতি পদে তো দূরের কথা দু'একবার হোঁচট খেয়েই আছড়ে পড়ি। উঠে দাঁড়াবার শক্তিটিও হারিয়ে ফেলি। কিন্তু না, আর নয়। এখন শহীদ মালেকের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে।

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে

এস.এম. নূর-ই-ইলাহী

দেয়াল লিখনটি এখনও রয়েছে। অস্পষ্ট তবে ভাল ভাবে খেয়াল করলেই বুঝা যায়। প্রতিদিন আসা-যাওয়ার পথে অন্তত ৮/১০ বার চোখ চলে যায় লেখার দিকে 'সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন চাই।' মন চলে যায় দৃশ্যপটে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে দৃশ্যগুলো; মালেক ভাই তেজোদীপ্ত ভাষায় ইসলামী শিক্ষার কথা বলছেন। শয়তানগুলো ফুঁসতে থাকে। 'ধর ধর' করে ধাওয়া করে মালেক ভাইকে। ধরে ফেলে ওরা মালেক ভাইকে, ঘিরে ধরে মারতে থাকে। দৃশ্য থেমে যায়- মন সে দৃশ্য কল্পনা করতে চায় না। ঘটনা এমন ভাবেই ঘটেছিল তাও আমি নিশ্চিত নই। প্রিয় স্যার নাসির উদ্দিন (প্রাক্তন বগুড়া জেলা সভাপতি) শহীদ আবদুল মালেকের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কবর যিয়ারত করেছিলাম। কি বলেছিলাম মনে নেই- তাঁর জন্য কোন দোয়া করিনি- আমার দোয়া না হলেও চলবে, তবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মনে মনে শত্রু হননের ইচ্ছা করেছিলাম। কিছুদিন পরই মালেক ভাইয়ের শাহাদাতস্থল দেখার সৌভাগ্য হয়। এখন আমি প্রতিদিন সে জায়গা দেখি, নতুন ভাবে, নতুন চেতনায়, নতুন মন্ত্রে, নতুন আক্রোশে। প্রতিদিন '১১২' সংখ্যাটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফজলুল হক হলে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখ যায় ১১২- এর দিকে। এই রুমেরই বাসিন্দা ছিলেন তিনি। জ্ঞানের প্রদীপটি এই এখানেই ছিলেন। রাত অনেক হলে পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াই- জনশক্তির সাথে কথা বলি। কেউ না থাকলেই মনে হয় মালেক ভাই এখানেই বসে থাকতেন, এখানে বসেই দ্বীনের নতুন নতুন শপথ নিতেন। যে কেউ একান্তে ১১২ নং রুমের পেছনের পুকুর পাড়ে বসুক, শহীদ মালেক ঘিরে ধরবে তাকে। মমতায় ভরা মুখখানা জানতে চাইবে অনেক কিছু। যার কোনটারই উত্তর আমার কাছে নেই। মাঝে মাঝে দীর্ঘক্ষণ প্রোগ্রাম করতে করতে মন খারাপ হয়ে যায়। চিরকুট দিয়েও যখন

www.icsbook.info

টিউশনির জন্য ছুটি পাওয়া যায় না- অথচ ছাত্রের পরীক্ষা- টিউশনি চলে যেতে পারে অজানা শংকায় মন বিদ্রোহী হতে চায়। মনে মনে ফুঁসতে ফুঁসতে চুপ করে প্রোগ্রামে বসে থাকি। শেষ কথায় যখন সভাপতি বলেন 'মালেক ভাই এমন ছিলেন যে-' আর বলতে হয় না। নিমিষেই সব দুঃখ ভুলে যাই। টিউশনি অনুশোচনায় দগ্ধ হই বারংবার, নিজেকে ছোট মনে হয়, খুবই ছোট মনে হয়। পরাজিত হই আমি, পরাজিত হয় আমার বিদ্রোহী মন। প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট আসে। মাইকের অসহ্য আওয়াজ বিদ্রোহী করে আমায়। মনে হয় তোফাজ্জল, রাজ্জাক, জসিম, সেলিম, রবদের কথা। খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে ওদের। মনের অজান্তে মন ছুটে যায় ১৫ আগস্ট ১৯৬৯।

টি.এস.সিতে খুব বেশী আড্ডা দেবার সুযোগ হয়নি। দীর্ঘ ৩টি বছরে ৪/৫ বার মাত্র কিছু সময় কাটিয়েছি। নবীন বরণে বক্তব্য দেবার সুযোগ হয়েছিলো- মালেক ভাইয়ের কথাগুলো চোরের মত কৌশলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিলাম। নিজেকে বড্ড বেশী অপরাধী মনে হয়েছিল। আসলেই আমরা অনেক বেশী ভীরু। বিপদ আসার আগেই ভড়কে যাই, নিজেকে গুটিয়ে নেই বর্ণচোরার মতো হাওয়ার তালে আমাদের বর্ণে ভেসে ওঠে না তেজোদীপ্ত মালেকের ছায়া, ভেসে ওঠে না তারিক বিন জিয়াদের ছবি, কখনোই শুনিনা, শুনতে চাই না মরুঝড় পাল্টে দেয়া মুজাহিদের ঘোড়ার খুরের ধ্বনি- বারবার কল্পিত নানা ভয়ে শিউরে উঠি লক্ষণ সেনের মতো। আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু আসে আবেগে তাড়নায়, সিদ্ধান্তে নয়, নতুন শপথে। অথচ মালেক ভাই জানতেন পরদিন তিনি আক্রান্ত হতে পারেন- তবু আপোষহীন সাহসী পথ চলা- যে পথে চলেছেন আল্লাহর রাসূলের (স) প্রিয় সাহাবী বেলাল, খাব্বাব প্রমুখ।

বারবার শত বার পরাজিত হয়েছি আবেগের কাছে এই অনেক শক্ত কঠোর ছেলে আমি কখনোই মালেক ভাইয়ের আবেগের কাছে জিততে পারিনি। শুধু আমি নই, এখানকার কোন জনশক্তিই জিততে পারে না এই একটি বিষয়ে। ক্যাম্পাসে প্রতি মুহূর্তে মালেকের স্বপ্নগুলো আহত হয়, মালেকের সাথীরা আহত হয়, প্রতিটি প্রোগ্রামে মালেক আসেন জনশক্তি নতুন স্বপ্ন দেখেন। প্রতি সেশনে সাথী সমাবেশে, সদস্য বৈঠকে- সাথীরা, সদস্যরা নতুন করে শপথ নেন। শপথের সময় ভেসে ওঠে মালেক ভাইয়ের চেহারা- নিজের একটি পাঞ্জাবী পরিষ্কার করছেন, শিক্ষাশিবিরে নিজ হাতে বাথরুম পরিষ্কার করছেন। আবারও পরাজিত হই। অথর্ব মনে হয় নিজেকে। চোখের সামনে অনেক ভাইয়ের ছাত্রজীবন শেষ হলো- বিদায় বেলায় তাদের শেষ কথা- 'পারলাম না মালেক ভাইয়ের ক্যাম্পাসকে জাগাতে- তোমরা চেষ্টা করো।'

বুঝতে পারি প্রতিটি জনশক্তির অন্তরে অলিখিত এক শক্তি জেগে উঠবে- শত শত শহীদের স্বপ্ন নিয়ে নতুন করে জাগবে, আমরা আমাদের দীপ্ত আমাদের সাহসী পথচলায়, মেধা নির্ভর পথ চলায় একদিন না না একদিন নয়, যথাসময়েই জেগে উঠবো আমরা। আমাদের কেউই রুখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। কেন না আমাদের প্রতিটি সমর্থক, প্রতিটি কর্মী, প্রতিটি সাথী, প্রতিটি সদস্য প্রতিনিয়ত মনের অজান্তেই গেয়ে ওঠে- 'শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে।'

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

হৃদয়ে লেখা যার নাম

শরীফ ইবনে মান্নান

কালো আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী, অমাবশ্যার রাত তিমির অন্ধকার অমানীশার ঘোর এক ভয়ংকর অবস্থা পৃথিবী নামক গ্রহ ভীত-সন্ত্রস্ত ঠিক সেই ক্ষণে সকল আঁধার পেরিয়ে সুবহে সাদিকের আগমনবার্তা নিয়ে আগমন করলেন এক ধ্রুব নক্ষত্র যার অবিস্মরণীয় নাম- শহীদ আবদুল মালেক।

হাজার যুবকের প্রেরণার উৎস হিসেবে মর্তের পৃথিবীতে ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে যিনি মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের আত্মার অনুরণন শহীদ আবদুল মালেক ভাই। মালেক ভাইয়ের নাম শুনেনি, ইসলামী আন্দোলনের তেমন কর্মী বাংলার মাটিতে নেই বলেই মনে হয়।

১৯৯২ সাল ১৫ আগস্ট নরসিংদীর তৎকালীন জেলা সভাপতির বক্তৃতার মাধ্যমে শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের পরিচিতি জানতে পারি। ১৯৬৯ সালের ১৫ আগস্ট ইসলামী শিক্ষার পক্ষে কথা বলার অপরাধে বাতিলের হাতে শাহাদাত বরণ করেন আবদুল মালেক ভাই। আমার হৃদয়ের অন্তঃকরণে দোলা দেয় মালেক ভাইয়ের কর্মমুখর উজ্জ্বল জীবন। তখন থেকেই হৃদয়ের গহীন কোণে লালন করতে থাকি শহীদ মালেক ভাইয়ের স্মৃতি বিজড়িত ক্যাম্পাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে ভর্তি হতে হবে। বিচরণ করতে হবে কালেমার পতাকা নিয়ে খুনঝরা ক্যাম্পাসে। শত বাতিলের মুখে মালেক ভাইয়ের পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মাঞ্জিলে মাকসুদে।

www.icsbook.info

দুরু দুরু বুকে হাজারো আবেগ নিয়ে লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে শামিল হয়ে যাই শহীদ মালেক ভাইয়ের স্মৃতিময় ক্যাম্পাসের একজন ছাত্র হিসেবে। মালেক ভাইয়ের রেখে যাওয়া কাজকে সামনে নিয়ে যাওয়া, কাফেলায় শরীক হই। কিন্তু বাতিলের চতুর্মুখি হামলা, কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের রক্তচক্ষু, সিট হারানোর ভয়ে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সামনে এগুবার সাহস হারিয়ে ফেলি, লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি, ভুলে যাই আমার আসল কর্তব্য। মালেকের প্রেরণা তখনই আবার আমায় পিছু ডাকে।

মালেক সেতো এক চেতনার নাম, এক বিপ্লবের নাম, এক বিস্ময়ের নাম। বাতিলের শত ষড়যন্ত্রের মুখে যখন থমকে দাঁড়াই, পারিবারিক বন্ধনে যখন ব্যাকুল হয়ে পড়ি, কায়েমী স্বার্থ যখন মনমগজে বাসা বাঁধে, শহীদ মালেক তখন সকল বাধাকে উপড়ে ফেলে মহা সত্যের পিছনে ছুটে চলার প্রেরণা যোগান। ব্যর্থতার গ্লানি, আশাহতের বেদনা, আলেয়ার কুহেলিকা যখন পার্থিব পৃথিবীকে রাঙিয়ে তুলে ক্ষণিকের আরাম আয়েশ যখন মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে, শহীদ মালেক তখন অলক্ষ্যে এসে দাঁড়ান মহান রবের সন্তুষ্টির দিকে ছুটে চলার সাহস যোগান। শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের কর্মজীবন যতই অধ্যয়ন করি ততই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। খণ্ডকালীন জীবনে ইসলামী আন্দোলনে বিরাট অনুসরণীয় বিষয় রেখে গেছেন তিনি।

১৯৬৯ সালের সোনালী দিনের সোনা ঝরা সকালে মনোরম পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপা ভবনে শিক্ষাব্যবস্থায় কি হবে সে বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ধ্বজাধারীরা, বস্তুবাদী, ভোগবাদী, ব্রাহ্মণবাদী ও শিরক মিশ্রিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। কিন্তু শহীদ মালেক ভাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিনির্ভর বলিষ্ঠ বক্তব্যের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। এবং ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য জনমত গড়ে ওঠে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কূটকৌশল বানচাল হতে দেখে মালেক ভাইয়ের ওপর তাদের সকল আক্রোশ পতিত হয়; মালেক ভাইকে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের একমাত্র বাধা মনে করে। যার ফলশ্রুতিতে হায়েনাদের মরণ ছোবলে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন আমাদের প্রিয় মালেক ভাই। হিংস্র হায়েনাদের কালো থাবায় মালেক ভাই কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যান অসীমের দিকে, মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে।

মালেক! মালেক সেতো কোন ব্যক্তির নাম নয়, একটি আন্দোলনের নাম। যে নাম ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর হৃদয়ের মণিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা। যে নাম বিপ্লবী সুর সৃষ্টি করে, স্পন্দন জাগায় হৃদয়ে হৃদয়ে, স্বপ্ন জাগায় হাজরো যুবকের মনে। মালেক আজ পৃথিবীতে নেই উদ্ভাসিত হয়ে আছেন হাজারো নক্ষত্রের মাঝে।

কালের পরিক্রমায় আজও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতে সভা-সমাবেশ, সেমিনার হয়, কিন্তু শহীদ মালেক ভাইয়ের সেই খুরধার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শোনা যায় না। ভীত কম্পিত হয়ে ওঠেনা বাতিলের রাজপ্রাসাদ, আর খুন ঝরেনা কোন মালেকের।

মালেক ভাইয়ের স্বপ্ন আজ স্বপ্নই রয়ে গেল। মালেক ভাইয়ের রেখে যাওয়া স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন একদল সিংহদিল সাহসী মুজাহিদের, একদল মর্দেমুমিন, যারা মালেকের মত জীবন দিয়ে কাজ করে যাবে। যারা তারেক, মূসা, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মত অসীম সাহসী, যারা ঝড়ের গতিকে পরিবর্তন করে দেবে, যারা পাহাড়সম শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম- একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব সকল ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে মালেক ভাইয়ের স্বপ্নের সেই ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করা।

অবশেষে মহান রবের দরবারে মনের আকুতি, আবদুল মালেক ভাই সহ সকল শহীদ ভাইদেরকে কবুল করে নাও প্রভু! আমাদেরকেও সেই পথে চলার তৌফিক দাও।

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

শহীদ আবদুল মালেক আমাদের পূর্বসূরী

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান

শহীদ আবদুল মালেকের রক্ত জাগিয়েছে আজকের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের। শহীদ আবদুল মালেকের রক্তমাখা আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবুজ শ্যামল বাংলার ছেলেরা আজ ইসলামী আন্দোলনের সুশীতল পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। বিভ্রান্তির উপত্যকায় ঘুরে ফিরে হয়রান, শত তাজা প্রাণ যুবক আজ আলোকিত জীবন পথে চলতে প্রদীপ্ত শপথ নিয়েছে। উদ্দেশ্যহীন জীবন, বিপথে চলার গতি পরিবর্তিত হয়েছে, পেয়েছে নির্ভুল সরল সোজা পথ। শহীদ আবদুল মালেককে না দেখা, তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর জীবন স্টাডী করে পায় অনুপ্রেরণা, সাহস, উদ্দীপনা।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে শহীদ আবদুল মালেকের জীবন একটি শিক্ষা, একটি আদর্শ, একটি আলোকবর্তিকা। এ যুগের আন্দোলনের কর্মীদের যতগুণ থাকা দরকার শহীদ আবদুল মালেকের জীবনে তার কোনটারই অভাব ছিল না। জীবনের শুরু থেকে অফুরন্ত ইচ্ছা, নিষ্ঠা, প্রতিভার মহাসমারোহ ঘটেছে তার প্রস্ফুটিত জীবনে। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের এ অগ্রপথিক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করেছিলেন। পায়ে হেঁটে দূরের স্কুলে ক্লাস করতেন। দীর্ঘপথ, বৃষ্টি, কাদা, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা কোন কিছুই তাকে পিছু হটাতে পারেনি। অন্যের বাড়িতে লজিং থেকে লেখাপড়া চালাতেন। ভাল ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যবাদিতা, বিনয় সহজেই অন্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করত। পড়াশুনার প্রতি প্রবল আগ্রহ, বড় হওয়ার দুরন্ত আশা তাকে অল্প বয়সে বাড়ির মায়া ছাড়তে হয়েছিল। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি উন্নত জীবন গঠনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শহরের স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে এসে তিনি লিখেছিলেন 'বাড়ির কথা ভাবি না, আমার শুধু এক উদ্দেশ্য খোদা যেন আমার উদ্দেশ্য সফল করেন। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং কঠোর সংগ্রামে, দোয়া করবেন খোদা যেন সহায় হোন। আমি ধন-সম্পদ কিছুই চাইনা, শুধুমাত্র যেন প্রকৃত মানুষরূপে জগতের বুকে বেঁচে থাকতে পারি।' সদ্য নিম্নমাধ্যমিক পাস করা একজন ছাত্রের এ কথাগুলো কতখানি প্রত্যয়দীপ্ত, কতখানি বলিষ্ঠ তা ভাবতেও অবাক লাগে। আজকের শিক্ষার্থী ভাইদের জন্যে কথাগুলো মণিমুক্তার মত মূল্যবান। ছোটবেলা থেকেই তাঁর চরিত্র, প্রতিভা, চালচলন উন্নত ছিল। সাত বছর বয়স থেকেই নিয়মিত নামাজ আদায় ও রোজা পালন করতেন। সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান পেতে তার নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। ভাল ছাত্ররাই ইসলামী আন্দোলন দ্রুত বুঝতে পারে। মালেক ভাই ছিলেন তার প্রমাণ। ইসলামী ছাত্রসংঘের বিপ্লবী আহ্বান তাঁকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে অনুরণিত করেছিল। সত্যের আলোকে জানার এবং ধারণ করার সীমাহীন ব্যাকুলতা থেকে অতি দ্রুত ছাত্রসংঘের চূড়ান্ত মানে উন্নীত হয়েছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হতে ঢিলেমির যে কোন অবকাশ নেই সে কথাই শহীদ মালেক তার নিজের কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন ছিল আবদুল মালেকের। যেমনটি রসূল (সা) বলেছেন, 'সাদাসিধে জীবন একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।' শীতকালেও গায়ে তার খুব একটা শীতবস্ত্র দেখা যেত না। নিজ হাতে কাপড় পরিষ্কার

www.icsbook.info

করে পরতেন। শাহাদাতের পরে তার ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে বের হল একটি দামী কাপড়। অবাক হল সকলে। পরে জানা গেল তার এক পরিচিত বন্ধু এই কাপড়টি উপহার দিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ-ছয় মাস আগে কিন্তু এত দামী কাপড়ের পাঞ্জাবী তিনি পরবেন না। তাই এমনভাবে ফেলে রেখেছিলেন। এ ছিল বিলাসিতা আর লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ বিংশ শতাব্দীরই এক মুসলিম যুবকের বিলাসহীন জীবন চরিত্র। বস্তুবাদী জীবনের চমক যাদেরকে বিভ্রান্ত করে আন্দোলনের পথ থেকে বিচ্যুত করে তাদের জন্যে মালেক ভাইয়ের জীবনের এ অধ্যায়টি একটি উদাহরণ। একজন দা'য়ী কখনো চাকচিক্যময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে না- একথাই আমাদের অনুসরণীয় পূর্বসূরী মালেক ভাই সারা বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার উত্তরসূরীদের কাছে পেশ করেছেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় তিনি আন্দোলনের কর্মীদের বুঝাতেন। 'সববাধাকে তুচ্ছ করে গাঢ় তমসার বুক চিরে যেদিন আমরা পথ করে নিতে পারব সেদিন আমরা পৌঁছব এ দুর্গম পথের শেষ মঞ্জিলে। আর সেদিনই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেদিন আমাদের চরিত্র হবে হযরত ইউসুফের মত সেই দিনই আসবে সাফল্য'।

তিনি চলে গেছেন কিন্তু তাঁর এ দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের ধমনী, শিরায় বহমান। সাফল্য পাওয়ার তাঁর চিন্তাপ্রসূত শর্তের নিরিখে আমরা আমাদের নিজ নিজ চরিত্রকে নির্মল করতে প্রয়াস পাই। ইসলামী আন্দোলনের কাজকে তিনি বেশি ভালবাসতেন। কর্মীদের তিনি ছিলেন অকৃত্রিম ভাই, তাদের দুঃখ ও বেদনায় তিনি সমানভাবে ভাগী হতেন। মেহমানদারীর যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য তাগিদ হিসেবে কাজ করবে। মেহমান হিসেবে আগত কর্মীদের বিছানা ছেড়ে দিয়ে তিনি মেঝেতে ঘুমাতেন ডান হাতকে করে বালিশ।

দায়িত্বশীল হয়ে কর্মীদের পোষ্টার লাগানোর নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হতে পারতেন না তিনি। নিজেই আসতেন পোষ্টার লাগাতে। কর্মীরা ইতস্তত করলে বলতেন 'পোষ্টার লাগাতে বলার চাইতে পোষ্টার লাগানোর মধ্যে সওয়াব বেশী তাই আসলাম'। তিনি নিজেকে কখনো বিশিষ্ট করে রাখতেন না। কর্মী শিক্ষাশিবিরে মালেক ভাই নিজ হাতে থালা-বাটি পরিষ্কার করতেন। হাসিমাখা মুখ নিয়ে কর্মীদের হাত ধুইয়ে দিতেন, যত্নের সাথে ঘুম পাড়িয়ে দিতন।

কতখানি গোছানো জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি তা শুধুই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আন্দোলন জীবনের যত বক্তৃতা শুনেছেন সুন্দরভাবে নোট করে রাখতেন, যত বক্তৃতা দিয়েছেন অত্যন্ত গোছালোভাবে লিখে রাখতেন। যতগুলো শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার প্রতিটি কর্মসূচী অত্যন্ত নিপুণভাবে লিখে রাখতেন। প্রতিটি কর্মী সম্পর্কে তিনি নোট রাখতেন। তার এ কাজগুলো আজ আমাদের জন্য উপদেশ যেন কন্টাক্ট করে কোন দায়িত্বশীল পরামর্শ দিচ্ছেন। ইসলামী আন্দোলনের পথ কোন কালেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। দুর্বল ঈমানদাররা কখনোই এ পথে টিকে থাকতে পারেনি। সর্বকালেই ইসলামের দুশমনেরা ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু খাঁটি মুমিনদের কখনো দমিয়ে দিতে পারে না- বাধা যত কঠিন হোক না কেন, তারা তত বেশী তেজোদ্দীপ্ত হয় তত বেশী ঈমানী শক্তি লাভ করে। মজবুত ঈমানের অধিকারী মালেক ভাই লিখলেন, 'জানি আমার দুঃসংবাদ পেলে মা কাঁদবেন, কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিল উৎখাত করে সত্য প্রতিষ্ঠা করব নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রাণভরে দোয়া করুন, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী যাতাকলের নিষ্পেষণ, ফাঁসির মঞ্চ যেন আমাকে ভড়কে দিতে না পারে'। শহীদের এ কথাগুলো আজকের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বক্ষে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়, স্পন্দন জাগায়।

ওহীভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে ওঠা অসম্ভব- একথার দাবীদার মালেক ভাইকে মগজ ধোলাই করা পিশাচরা সহ্য করতে পারেনি। তাকে পৃথিবীর আলো থেকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্মমভাবে। কিন্তু এক মালেকের আত্মদান হাজার মালেককে একই কাতারে এনে শামিল করেছে। তারা ইসলামী আন্দোলনকেই জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। শহীদ মালেকের জীবন চরিত্র হৃদয়ে ধারণ করে। শহীদের জানাযায় আওলাদে রাসূল, মাওলানা সৈয়দ মোস্তফা আল মাদানী যেমন বলেছিলেন, 'হায় আমি যদি আজ আবদুল মালেক হতাম, আল্লাহর দরবারে শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম, তাহলে আমার জীবন সার্থক হত'।

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

এক নজরে শহীদ আবদুল মালেক

আল্লাহর পথে লড়াই করার যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন তাঁরা যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। আর যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন তাঁরা বিজয়ী হোন অথবা নিহত; উভয় অবস্থায়ই আমরা তাদের প্রচুর পরিমাণ পুরস্কার দান করবো। - আল কুরআন

- নাম : আবদুল মালেক
- পিতা : মৃত মৌলভী মুন্সী মোহাম্মদ আলী।
- মাতা : মৃত মোছাম্মত ছাবিরুন নেছা।
- জন্মস্থান : গ্রাম-খোক্সাবাড়ি (স্থানীয় নাম বগা), থানা-ধূনট, জেলা-বগুড়া।
- জন্ম তারিখ : মে, ১৯৪৭ ইং।
- পারিবারিক পরিচিতি : ৫ ভাই ১ বোন। ভাইদের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ, বোনটি ছোট। ভাইয়েরা হলেন- মৃত ক্বারী মোঃ আবদুল রশিদ, মুন্সী মোঃ আবদুল কাদের, ডাঃ মোঃ আবদুল খালেক, মাষ্টার আবদুল বারী মুন্সী, বোন আয়েশা খাতুন।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ : প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত গ্রামের পাঠশালা (খোক্সাবাড়ি স্কুল)। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত গোসাইবাড়ি হাইস্কুলে, যা বাড়ি থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। পরবর্তীতে বগুড়া জেলা গভঃ হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি, রাজশাহী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যয়ন : বই খুলে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যেতেন, মা বইগুলো গুছিয়ে রাখতেন। ঘন্টাখানেক পর ঘুম থেকে জেগে আবার পড়তেন।

বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্ব : ১৯৬০ সালে জুনিয়র স্কলারশীপ বৃত্তি, ১৯৬৩ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় অংক ও রসায়নে লেটারসহ রাজশাহী বোর্ডে একাদশ স্থান অর্জন করেন।(এ সময় তাঁর

www.icsbook.info

পিতা মৌলভী মোহাম্মদ আলী ইন্তেকাল করেন)। ১৯৬৫ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় দুই বিষয়ে লেটারসহ মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

শহীদ আবদুল মালেকের বংশলতিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন বিভাগে ভর্তি : (Bio-chemistry) উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ কামাল হোসেন মালেককে তাঁর রুমে নিয়ে যান। মালেক নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের একটু পরে ভর্তি হতে আসেন। প্রথমত জিন্নাহ্ হলে (বর্তমান পরিবর্তিত সূর্যসেন হল) প্রভোস্টের কাছে যান। প্রভোস্ট বলেন তিন মাস পরে সীট হবে। তখন বায়ো-কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যান ডঃ কামালের সাথে দেখা করলে তিনি ফজলুল হক হলে ভর্তির পরামর্শ দেন। পূর্বের ফরম ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন হলে ভর্তি হন। প্রভোস্ট আগ্রহ করে তাকে নিয়ে যান। ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ১১২ নং কক্ষে তিনি অবস্থান করতেন।

বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের সাথে জড়িত হন। প্রথমে মুসলিম লীগ করতেন। জেলা স্কুলে পড়ার সময়ে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত হন, পরে রাজশাহী কলেজে ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েন।

ছাত্রসংঘে যোগদান : অনার্স প্রথম বর্ষে থাকা অবস্থায় ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগদান করেন।

দায়িত্ব পালন : কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং যোগ্যতার সাথে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১৯৬৬-৬৭ সালে তিনি ঢাকা শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে জুলাই মাসে শহর শাখার সভাপতি এবং ১৯৬৮ সালে নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হন।

তাঁর শিক্ষক : মায়ের কাছে প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ, হাজী দারেস আলী-খোক্সাবাড়ি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, মাষ্টার আবদুল জলিল, মৌলভী আবু বকর, ডঃ কামাল হোসেন-তৎকালীন ঢা.বি'র বায়ো-কেমিষ্ট্রির চেয়ারম্যান, শামসুদ্দিন-সহঃ হেডমাষ্টার বগুড়া জেলা স্কুল, দারেস আলী মাষ্টার ও নাজির হোসেন-গোসাইবাড়ি স্কুলের হেডমাষ্টার।

তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ : সংশয়ের আবর্তে আমাদের জীবন, আধুনিক বিশ্ব, প্রত্যয়ের আলোকে আমাদের জীবন, ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা। এছাড়াও তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

অবসর মুহূর্তে : বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিকদের জীবনী পড়তেন। খাবার সময় ছাড়া তাকে পড়ার টেবিলে পাওয়া যেত।

তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)

www.icsbook.info

শখ : টাকা জমিয়ে বই কেনা, পত্রিকা পড়া।

পোশাক : সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী।

শাহাদাতের পূর্ব ঘটনা : ২ আগস্ট ১৯৬৯ সালে ঢাকার নিপায় (NIPA) শিক্ষানীতির উপর আলোচনার জন্য ছাত্রদের আহ্বান করা হয়। সেদিন শহীদ আবদুল মালেকের ক্ষুরধার যুক্তি ও বলিষ্ঠ বক্তব্য মিলনায়তনের সবাইকে মুগ্ধ করলো। শ্রোতারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষেই মত প্রকাশ করল। সেদিন তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ফুটে উঠেছিল। তাঁর সে কণ্ঠস্বর ছিল বলিষ্ঠ, ছিল দ্বিধাহীন। কিন্তু ইসলামবিরোধী চক্র ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষে প্রস্তাব পাস করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ১২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ইসলামী শিক্ষার পক্ষে আলোচনা করার জন্য শহীদ আবদুল মালেক ও তাঁর সাথীরা দাবী জানায়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের এটা সহ্য হলো না। তারা শহীদ আবদুল মালেক সহ ইসলামপন্থী ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তরা লাঠি, লোহার রড প্রভৃতি দিয়ে আক্রমণ করে মালেক ভাইকে গুরুতর আহত করে। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় দুর্বৃত্তরা তাদেরকে সেখানে রেখে চলে গেলে আশে পাশের লোকেরা তাদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

শাহাদাতের তারিখ : ১২ আগস্ট রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) আহত হন। ১৫ আগস্ট ১৯৬৯ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন। (আল্লাহ পাক তাঁকে কবুল করুন)।

জানাযার স্থান : প্রথম বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় বার কমলাপুর রেল স্টেশনে তৃতীয় বার ধূনটে।

জানাযায় ইমামতি করেন আওলাদে রাসূল মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী। জানাযার পূর্বে মাওলানা আবদুর রহীম বক্তব্য রাখেন।

কবর স্থান : খোক্‌সাবাড়ি, বগুড়া।

স্মরণীয় উক্তি : 'কঠিন শপথ নিয়ে আমার সংগ্রামের পথে আমি চলতে চাই। আশীর্বাদ করেন, সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি উৎসর্গ করে দিতে পারি।'

গ্রন্থনায় : ওমর আল ফারুক

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

Abdul Malek
A Luminous Star

Md. Mofidul Alam

Islam is a complete code of life. The Quran is the book of guidance. This guidance is for the whole mankind and covers all activities of human life. The Quran deals with all principles embedded in it. Muslims mean complete devotion to Allah and the rules of Mohammad (sm). The Quran is the Constitution of the Muslim Ummah. The Muslims are the preachers of Islam. In Quranic verse-

"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good , Enjoying what is right". (Al-Imran-104)

In fact This is the foremost duty of all Muslims. And The duty of the prophets (sm) was stated in Quran like this- 'Our Lord! Send amongst them a Messenger their own, who shall recite unto them your Verses and instruct them in the Book and Al-Hikmah, and purify them'. (Al-Bakarah : 129)

The statements mentioned above are the real spirit of Islam. Abdul Makel- a name of truth bore this real spirit. He was born in Bogura district at Khokshabari under Dhunata thana in 1947 in a muslim Family. His father Mohammad Ali was pious. Their Financial condition was not so satisfactory. Abdul Malek passed his S.S.C and H.S.C in 1963 and 1965 securing 11th and 4th position in Rajshahi Board respectively. Then he got admitted into Dhaka University during 1966 in Bio-chemistry. He did not confine his life mere in the field of institutional education. He took part in various activities of Islamic movement for the shake of being a perfect Muslim. He had shown

www.icsbook.info

it by possessing the post of president of Dhaka City of Islamic Movement. Truth never stay with false. Conflict between truth and false is perpetual. Abdul Malek- a name of truth can never stay with false. What was the guilt of Abdul Malek? Why he died? These are the queries of young Muslim generation.

In 12th August 1969. A discussion was held on 'Education system of Pakistan suggested by Mr. Noor Khan' in Dhaka University T.S.C auditorium. Abdul Malek participated the program and disagreed with the then speakers. He opined - 'Pakistan must aim at ideological unity, not at ideological vaccum, it must impart a unique and integrated system of education which can impart a common set of cultural values based on the precepts of Islam' Abdul Malek then suggested to integrate the whole education system in the light of Islam. He urged 'Our age must achieve spiritual senewal. A new renaissance must come- The renaissance in which mankind discovered that ethical action is the supreme truth and the supreme utilitari anism by which mankind will be liberated.'

The antagonist opposed the view of Malek. The opponents attached him nercolessly on that day and eventually he died in 15th August 1969.

What Abdul Malek wanted to perform. He declared himself as a perfect Muslim and wanted to perform the work of the prophet (sm). The antagonists thought that the voice in favor of Islamic ideology would stopped by killing Abdul Malek. But Allah said-

"Their intention is to extinguish Allah's light (by blowing) with their mouths. But Allah will complete his light, even though the unbelievers may detest (it)." (Suff-8)

Abdul Malek had a dream to materialize the Islamic education system. We the thousands of follower of Abdul Malek should not stop the work of Abdul Malek. His departed soul will remain in peace and happiness if we continue his work. We should raise our voice infavour of Islamic education until it materialize. Let us make a promise today and raise a slogan-

"We the Muslim Ummah
We the Bangladeshi
We the Islam as ideology."

Writer : Lecturer, Dept. of Accounting
Sk. Burhanuddin Post Graduate College, Dhaka.

 www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

A TRIBUTE to SAHEED MALEK

Belal Rashid Chowdhury

The history of conflict between true and false rooted to dim and distant past on this planet with a sublime beauty created by the almighty Allah.

The believers had always been trying to raise the truth to the pinnacle. On the contrary the disbelievers kept on their efforts to annihilate and extinguish the sparkle of all pervading gleam of truth.

But the history witnesses that, they never succeed. Truth could not be extinguished rather it diffuses deformities all directions and reaches to a boundless extent.

The conflict between light & darkness never come to an end. Rather the Jihad of Ibrahim (A.S.) against Namrud, Musa (A.S.) against Farao, Mohammad (SM) against Abu Zahel is continuing in the same pace till today.

The instances of martyrdom of saheed Hasan al Banna, Abdul Qader Awdah, Saheed Kutubb are the testimony of this truth.

And also that of Saheed Abdul Malek, Sabbir, Hamid, Safiq, Anwer, Afaz, Salauddin, Zahangir and more than one hundred martyres further consolidates this truth.

Saheed Malek sacrificed his life for the establishment of the system of Islamic Education.

He succumbed to his severe injuries on 15 August at DMCH which was caused by a barbarous attack made on Him on 12 August at the Racecourse Maidan in 1969.

The enemies of Allah could not endure the slogan of Islamic Revolution and they killed Abdul Malek the then president of Dhaka City Unit, one of the leading champions of Islamic Education Movement in a very brutal and hideous manner. They wanted to exterminate the Islamic movement by killing Abdul Malek, but his fellow brothers foiled that hatred conspiracy. The blood stream of the matters for the sake of the Islamic social system has accelerated its speed.

Saheed Malek is not only a name but also an Era. He is the most pronounced name and a symbol of inspiration among the people who love Islam. Though no monument had been built on his memory, yet he is ever alive in the hearts of thousands of believers. Allah, the Almighty preserves the memory of martyrs for ever in this way. All the conspiracies have to face the same fate like this one. Because, the rela-

www.icsbook.info

tion between the history of the establishment of Islamic movement and martyrs is inextricable. The hypocrites can do a little in this respect. As the Qur'an says:
The more the Islamic Movement soaring high and high the more the curiosity of knowing Saheed Malek increasing among the Mujahids of the camp of believers. A strong affinity of fellow feelings and inspirations are making ground evolving him. This feelings of affinity is prevalent not only in our country but also through out the world wherever the movement is on function. Through the passage of time the name of Saheed Malek is being spoken off with the same importance along with the names of Saheed Hasan-al-Banna and Saheed Kutub. It is an usual demand of l'maan to the believers to remain curious about the martyrs who showed us the pavement of this movement. This tendency cannot be stifled to do so is nothing but a suicidal effort.
Saheed Malek was used to lead a very simple and plain life. He was never pretentious. He was a man of great humility. Whoever came to his association, got benefited in either of the ways. There are alive persons till today who were closely acquainted with Saheed Malek and through discussions with them many things can be known about him which can act as a huge source of inspiration for us. This is why it is very much wise and beneficial to maintain a communication with the honorable contemporaries of Shaheed Malek.
Shaheed Malek was an embodiment of many qualities. He was an endowed with many divine gifts. Whoever commemorates him, gives emphasis on this aspect of his life. Precisely for his character he had assumed a great threat to the enemies of Allah.
He was man of profound insight and could easily read the thoughts of the enemies which enabled him to tackle all the problems in a smooth way. Shaheed Malek sacrificed his life not out of any craving for name or fame but to give the Islamic movement a 'go ahead' impetus. He inspired us to follow him to the noble act of martyrdom. The study of his life reveals the following salient features of his character that is worthy of imitation.

- He was very assiduous and introspective.
- Modest, polite, sympathetic and sweet- tongued.
- Very much generous and perspicacious in the acceptance of truth.
- Very much wise in discriminating true and false.
- He was never insincere to his words and work. There was no contradiction between his promises and work.
- Tireless in the acquisition of knowledge.
- He was ever steady and constant in his determination to establish the truth of Allah on his earth.
- A glaring example of love and sacrifice.

Out of many qualities only a few we have been mentioned here. The more we shall analyze his life the more we will be benefited. This tendency of knowing the great souls will be an ever growing one. The martyrdom of Saheed Malek is no isolated phenomenon. Rather it is a name which has been added with a long and glorious process of enumeration. The effort of analysis and knowing of Saheed Malek and the other martyrs will be meaningful only when we shall be able to establish a formidable and unconquerable stronghold on the way to establishment of the rules of Allah in the world.

www.icsbook.info

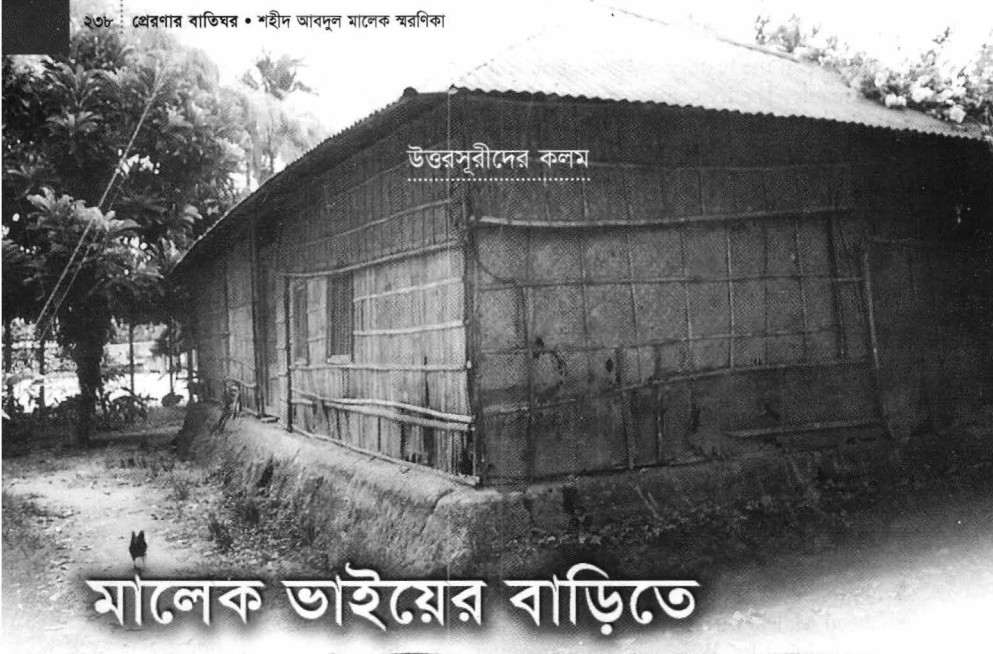

উত্তরসূরীদের কলম

মালেক ভাইয়ের বাড়িতে যেভাবে যাবেন

মুহাম্মদ আবু রায়হান

শহীদ আবদুল মালেক এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর হৃদয়ের মণিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একটি নাম। আবদুল মালেক একটি চেতনা, একটি প্রত্যয়। যে নাম বিপ্লবী সুর সৃষ্টি করে, স্পন্দন জাগায় আন্দোলনের সিপাহসালাদের। নতুন প্রজন্ম যারা মালেক ভাইকে দেখেনি কিন্তু মালেকের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, মালেক ভাই তাদের প্রেরণার উৎস।

উপমহাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবদুল মালেকের কবর যিয়ারতের জন্য, মালেক ভাইয়ের কবর একনজর দেখার জন্য অনেকেই প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। বিশেষ করে আগস্ট মাস আসলেই মালেক ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে অনেকেই উদগ্রীব হয়ে পড়েন। আমি বগুড়ার স্থানীয় ছেলে হিসেবে মালেক ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার সহজপথটি উপস্থাপন করছি।

শহীদ আবদুল মালেকের ঠিকানা :
গ্রাম : মানিকপটল
ইউনিয়ন : গোসাইবাড়ি
থানা : ধুনট।

www.icsbook.info

জেলা : বগুড়া।

মালেক ভাইয়ের জেলা (বগুড়ায়) যাবেন কিভাবে

রাজধানী শহর ঢাকা থেকে মাত্র ৩.৩০ মিনিটে (তিন ঘন্টা ত্রিশ মিনিট) বগুড়ায় যাওয়া যায়। গাবতলী, মহাখালী অথবা কল্যাণপুর থেকে- এস.আর, শ্যামলী, কেয়া, একতা, খালেক প্রভৃতি পরিবহনে যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে এসি এবং ননএসি উভয় ধরনের বাস চালু আছে।

আর আপনি যদি দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল থেকে তথা চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া যেতে চান, তবে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি বগুড়ার বাসে যেতে হবে। অথবা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসার পর বাস পরিবর্তন করে বগুড়ায় যেতে পারেন। তবে চট্টগ্রাম টু বগুড়া বাসে যাওয়াই ভালো। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল তথা- যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা ইত্যাদি জেলা থেকে এবং উত্তরাঞ্চলের যে কোন জেলা থেকে সরাসরি বাসযোগে বগুড়ায় যাওয়া যায়।

বগুড়া যাওয়ার জন্য কোন বিমান সার্ভিস নেই। আর যতটুকু রেল সার্ভিস আছে তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

কোথায় গিয়ে নামবেন?

ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে বগুড়াগামী বাসে সরাসরি বগুড়া শহরে না গিয়ে তার আগেই শেরপুর থানা সদরে নামবেন। আর যারা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল জেলা বা উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলো থেকে আসবেন তারা বগুড়া শহরের বাসস্ট্যান্ডে নামবেন।

মালেক ভাইয়ের থানা ধুনটে যাবেন কিভাবে?

শেরপুর থানা সদর থেকে অথবা বগুড়া শহর থেকে ধুনট গোসাইবাড়ি যাওয়ার মিনিবাস আছে। এ মিনিবাসে করেই আপনি যাবেন ধুনট থানায়।

মালেক ভাইয়ের গ্রামের পথে

গোসাইবাড়ি যাওয়ার পথে 'বড়বিলা' নামক একটি বাসস্টপে নামতে হবে। অতঃপর বড়বিলা থেকে রিক্সা অথবা ভ্যানে করে শহীদ মালেকের কবরস্থান- মানিকপটল গ্রামে যেতে হবে। এখানেই মানিকপটল দাখিল মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শহীদ আবদুল মালেক ভাই।

মালেক ভাইয়ের গ্রামে গিয়ে কি কি করতে পারেন?

১. মালেক ভাইয়ের কবর যিয়ারত করা।
২. শহীদ মালেকের বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করা।
৩. গ্রামের মুরুব্বীদের কাছ থেকে বিশেষ করে যারা আবদুল মালেক ভাইয়ের সমসাময়িক, তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জানতে পারেন।
৪. সেখানে আবদুল মালেক ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করে মতবিনিময় করতে পারেন।

যদি বগুড়ায় থাকতে চান

মালেক ভাইয়ের কবর যিয়ারত শেষে যদি কেউ বগুড়ায় থাকতে চান তাহলে আপনাকে আবার ফিরে যেতে হবে বগুড়া শহরে অথবা শেরপুরেও থাকতে পারেন। এখানে আকবরিয়া, শ্যামলী, ম্যান্ডেলিন, সুপার সাউদিয়া নামের অভিজাত আবাসিক হোটেল আছে।

পরিশেষে

মালেক ভাইয়ের কবর যিয়ারত বা দেখার মাধ্যমেই কাজ শেষ নয়। বরং মালেকের মত আদর্শ মানুষ হয়ে ইসলামী আন্দোলনকে আরও বেগবান করবেন। এক মালেকের শাহাদাতে আমাদের মধ্য থেকে লক্ষ মালেক তৈরি হোক, এই হোক আমাদের একান্ত কামনা।

www.icsbook.info

উত্তরসূরীদের কলম

শহীদ আবদুল মালেক

এক আলোর দিশারী

মাহমুদা বিনতে মুত্তালিব (মুক্তা)

তোমাকে যে কি বলে সম্ভাষণ জানাব তার কোনো সঠিক ভাষা নির্বাচন করা সত্যিই আমার সাধ্যের বাইরে। তবে এটুকু বলব যে, হযরত হাসান, হুসাইন (রা) এর শহীদ হওয়ার কাহিনী শুনে আমার হৃদয় যতটুকু ব্যথিত হয়েছিল, তোমার শাহাদাত বরণ এবং তোমাকে জেনেও ঠিক একই রকম ব্যথা অনুভব করছি। একজন মুসলিম নারী হিসেবে আমার পবিত্র জ্ঞানা থেকে বলছি, আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাকে জানি না। যতটুকু জেনেছি তার মাঝে বিন্দুমাত্র নকলের গন্ধ পাইনি। তোমাকে যখনই ভাবি তখনই হৃদয়ের আঙিনায় শুধু এই চরণগুলো ভেসে উঠে।

'হে হীন পৃথিবী!
পিছন থেকে যতই ডাক আমাকে
ফিরে যাবনা আমি তার
মিথ্যে অশ্লীলতার পথে।
পেয়েছি পথ সত্যের সন্ধান
শহীদ মালেকের মাঝে।'

রাজনীতি কি? তা আমি জানিনা বা বুঝিনা। আর তা জানতে বা বুঝতেও চাইনা। তবে ইসলাম কিংবা সত্যের জন্য যদি তোমার মত জীবন দিতে হয়, তার জন্যে আমি সদা প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ।

আমাদের জানা উচিৎ যে, ইসলামের মাধ্যমেই প্রথম রাজনীতির আবির্ভাব হয়। আর সেই ইসলামেই যদি রাজনীতি না থাকে তবে রাজনীতি থাকবে কোথায়? তাই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে হলে সকল মুসলমান ভাই- বোনদের একই পতাকাতলে সমবেত হওয়া একান্ত জরুরি। কেননা পবিত্র কুরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা (মানবজাতি) আল্লাহর রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তা থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"

ফলে যারা তাঁর বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই মানবজাতির একান্ত কর্তব্য। তাই ইসলামের দাওয়াতই যখন দেব তখন তো আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথাই জানাতে হবে।

যারা আজ আমার, আমাদের এবং সবার প্রাণপ্রিয় শহীদ আবদুল মালেকের নিষ্ঠুর হত্যাকারী, যার অপরাধ ছিল কেবল সৎ ও ন্যায়ের পক্ষে চলা আর বাংলাদেশ তথা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূ-খন্ডে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতি চালু করার কথা বলা আজ তাদের দুষ্টচক্রের রাজনীতি ধ্বংস হোক। আল্লাহ তাদের উপর হেদায়েত দান করুন এবং তার সাথে সাথে আমাদের সবাইকে শহীদ আবদুল মালেকের উত্তরসূরী হবার তৌফিক দান করুন। আমীন।

www.icsbook.info

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা
আয়োজিত
ইসলামী শিক্ষা দিবস ও
শহীদ আবদুল মালেকের
শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে

সেমিনার

৪ সেপ্টেম্বর ২০০২
বিকাল ৩.৩০

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট
মিলনায়তন

www.icsbook.info

প্রতিবেদন

৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তন। ঘড়ির কাটায় তখন ৩.৩০। লাউড স্পীকারে ভেসে এলো পবিত্র কালামের সুললিত কণ্ঠ। মিলনায়তনের ভিতরে তিল পরিমাণ ঠাঁই নাই, বাইরেও উপচেপড়া ভীড়। চারিদিকে নতুন দিনের উচ্চকিত প্রত্যাশা, নতুন চেতনায় উজ্জীবিত দর্শক শ্রোতা।

এমনি এক পরিবেশে গত ৪ আগস্ট বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও শহীদ আবদুল মালেক' শীর্ষক এক প্রাণবন্ত জাতীয় শিক্ষা সেমিনার। মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূইয়ার পরিচালনায় সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমীরে জামায়াত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। সেমিনারে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। 'ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও শহীদ আবদুল মালেক' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম-এর ছাত্র উপদেষ্টা জনাব আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ এবং 'Islamization in Higher Education : An Integrated Approach' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক থ্যট (BIIT) এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এম. জহুরুল ইসলাম এফ.সি.এ। সেমিনারে প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল, বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল কাদের মোল্লা, জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য জনাব শাহ রুহুল কুদ্দুস এম.পি, শহীদ আবদুল মালেকের অগ্রজ জনাব আবদুল

www.icsbook.info

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

বারী, শহীদের সাথী গাজী ইদ্রিস, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মতিউর রহমান আকন্দ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদের ডীন অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব এম. মুজাহিদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক জনাব আবদুল লতিফ মাসুম প্রমুখ।

আবদুল বারী: শহীদ মালেকের বড়ভাই। নিজের একান্ত অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি

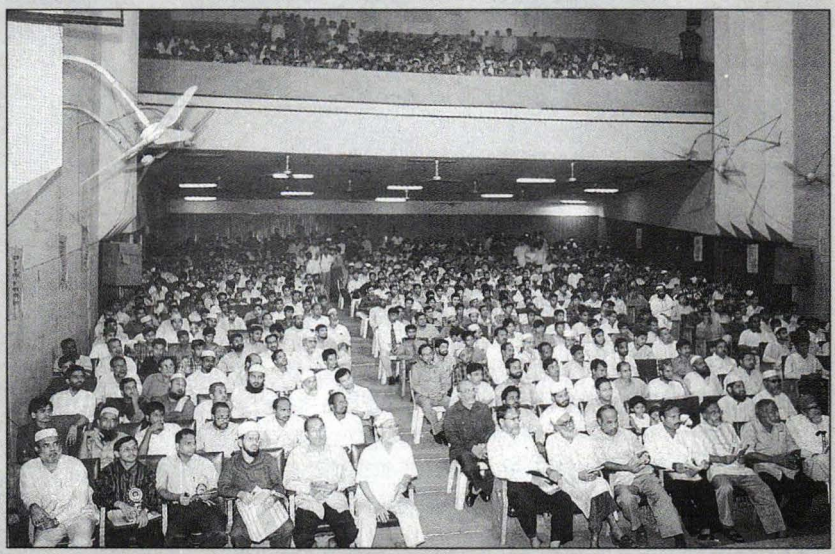

শিক্ষা সেমিনারে উপস্থিত সুধীবৃন্দ

www.icsbook.info

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা

বলেন-শহীদ আবদুল মালেক আমাদের সর্বকনিষ্ঠ। এজন্যই তাঁর প্রতি আমাদের সবার ভালোবাসাও ছিল অন্তহীন। শহীদ আবদুল মালেককে আমি তিনবার স্বপ্ন দেখেছি। তৃতীয়বারের স্বপ্নটি হলো-সুবহে সাদিকের সময় আমি দেখি একটি সুদৃপ্ত বাহিনী চলছে, ঘোষণা দিয়ে জানানো হল মালেকের অজেয় বাহিনী আসছে। ঘুম ভাঙ্গার পর আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

আলোচনায় অংশ নেন অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস এমপি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: এর ইভিপি মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ফার্মেসী অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান

গাজী ইদ্রিস: জিন্দা শহীদ। (সেদিন দুর্বৃত্তদের হামলায় মালেক ভাইয়ের সাথে তিনিও আহত হন মারাত্মকভাবে।) তিনি বলেন সেদিন মালেক ভাই ইচ্ছা করলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সরে যেতে পারতেন। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল হিসেবে কর্মীদের সবাইকে নিরাপদে চলে যাবার তত্ত্বাবধান করে তিনি নিজে একাকী রয়ে গেলেন। শহীদ আবদুল মালেকের এই আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণায়ই আজকে গড়ে উঠেছে অজেয় এক শহীদি কাফেলা- ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.icsbook.info

অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম: শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ইসলামীকরণের জন্য আমাদের অনেক কাজ করার আছে। Public Finance কে ইসলামীকরণ করলে ট্যাক্স এর ব্যাপারে কথা আসবে। সরকার এখন যেমন ইচ্ছামত ট্যাক্স বসিয়ে গরিব লোকের সমস্যা করছে- এটা ইসলাম সম্মত নয়। রাসূল (স) এর রাষ্ট্র ছিল ট্যাক্সমুক্ত রাষ্ট্র। ইসলাম ট্যাক্স আদায় করে ধনীদের কাছ থেকে যেমন-যাকাত। পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে ট্যাক্স বসাতে হলেও তা কখনো সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সহনীয় পর্যায়ের বাইরে যাবে না। তারপর, সরকারের ব্যয় কতটা হবে, এটার

আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এম. মুজাহিদুল ইসলাম, প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ, এম. জহুরুল ইসলাম, এফসিএ

সীমা পরিসীমা কতটুকু- এব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য আছে। পণ্যের গুনাগুণ লুকিয়ে মডেলিং-এর মাধ্যমে তাকে আকর্ষণীয় করার বর্তমান যে পদ্ধতি এটা ইসলামী নয়। এ ব্যাপারে ইসলাম পরিবর্তন আনবে।

আবদুল লতিফ মাসুম: কোন কিছুর আগে ইসলাম লাগিয়ে দিলেই Islamization হয় না। কোন বিষয়কে Islamize করতে হলে Justice, goodness, wisdom, welfare, purity, piousness, development-এই স্বাভাবিক গুণাবলীগুলোকে আশ্রয় করার শিক্ষাই

আলোচনা করছেন শহীদ আবদুল মালেকের বড় ভাই আবদুল বারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল মজিবুর রহমান মন্জু, শহীদের সাথে মারাত্মকভাবে আহত মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী (গাজী ইদ্রিস)

www.icsbook.info

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান, শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি আখতার হোসেন মজুমদার, অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারী মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভুইয়া

দিতে হবে। আজকে এরিস্টোটল বা প্লেটোর বই যেভাবে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হচ্ছে, সেইভাবে ইবনে খালদুন কিংবা ইমাম গাজ্জালীর লেখাকেও পড়তে হবে।

ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান: একটি সরকার পুরোপুরি ইসলামী না হলে আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তত যেন নৈতিক মান সম্পন্ন হয়। আমরা দু'বার স্বাধীন হবার পরও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের উপযোগী হয়নি এখনো। এক্ষেত্রে সরকারী পদক্ষেপ প্রয়োজন।

নূরুল ইসলাম: আজকের ছাত্ররাজনীতি এই যে সন্ত্রাস, অরাজকতা এর উৎস '৬৯-এর ১৫ আগস্ট। সেদিন ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা আবদুল মালেক শহীদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য এর বিপরীতে পেশীশক্তির প্রদর্শন রাজনৈতিক সহনশীলতার, যুক্তির চর্চার কালচারের অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু তাঁরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলামপন্থী সম্মানিত শিক্ষকরা যদি সম্মিলিতভাবে ছাত্রদের ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রদর্শন করেন তাহলে তাদের নেতৃত্বেই ইসলামী শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

আবদুল কাদের মোল্লা: আমরা ইতিহাস ভুলে যাই বলে প্রায়শই নিজেদের পরিচয় ভুলে যাই। যার ফলে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতেও অনেকে লজ্জাবোধ করেন। ইতিহাসের সুষ্ঠু চর্চা হলে এরকম হত না। এই সেমিনারের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চার পথ সুগম হচ্ছে। আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া মানুষ তৈরি করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আমাদের সংবিধান আল্লাহর নামে শুরু, আল্লাহর উপর বিশ্বাসই মূল চেতনা, কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এই মূল ইসলামী চেতনার প্রতিফলন সময়ের দাবী। বর্তমানে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার উচ্চশিক্ষার Islamization -এর ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: মহাবিশ্বে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ লাগবে। মহাবিশ্বে এত পরিমাণ গ্যালক্সি আছে যে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তাদের প্রত্যেককে একটি করে গ্যালাক্সি দিলেও তা ফুরাবে না। সৃষ্টির বিশালত্ব সম্পর্কে এই ধারণা যখন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, মানুষ তাকে আজগুবি মনে করছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মহাবিশ্বের গোটা আলোচনার সাথে এই স্বীকৃতিটুকু যোগ করে দিলেই তো Islamization হয়ে গেলো।

www.icsbook.info

শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস: আজকের পৃথিবীতে ইসলামী রেনেসাঁর যে গতিপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে তার ধারাবাহিকতায় হাজারো শহীদ আবদুল মালেক প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ছাত্ররা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যদি সেক্যুলার হতে পারে, চীন-রাশিয়ায় ছাত্ররা যদি কম্যুনিস্ট হতে পারে তাহলে মুসলিম বিশ্বের ছাত্ররা কেন মুসলিম হতে পারবে না?

নূরুল ইসলাম বুলবুল: অনুপম আদর্শ জীবনের অধিকারী শহীদ আবদুল মালেককে কেন জীবন দিতে হল? কারণ তাঁর প্রস্তাবিত ইসলামী শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিক্যবাদের কবর রচিত হবে। যারা মালেক ভাইকে হত্যা করেছিল তারা এর মাধ্যমে ইসলামকে, ইসলামী আন্দোলনকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের আশা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। আবদুল মালেকের শাহাদাতের অনুপ্রেরণা লালন করার জন্য লক্ষ-কোটি শিবির কর্মী প্রস্তুত রয়েছে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী: শিক্ষা আন্দোলন একটি মৌলিক বিষয়, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার বিষয়। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা সীমিত, যেমন সীমিত ইসলাম সম্পর্কে। Religion is a private relation between man and Allah-এই অর্থে ইসলাম ধর্ম নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এই সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে জানার ও বোঝার মাধ্যম হলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা তাই যা জ্ঞানের সকল শাখার Guiding force হিসেবে ইসলামী আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করে ; যা প্রথমতঃ স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং তাদের আত্মসম্পর্কের সুষ্ঠু ধারণা দেয়। উপনিবেশ আমলে শিক্ষাকে দু'ভাগ করা হয়েছে। দ্বীনি শিক্ষা দুনিয়াবর্জিত হয়েছে আর সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা আখেরাতবর্জিত হয়েছে - এটি ইসলামী ভাবধারা বর্জিত। এ ধারার বিলোপ করে, দুটোর সমন্বয় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ সমাজকে, এদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

বিচারপতি আবদুর রউফ: মানুষ গবেষণামূলক চেষ্টা দ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্যের অবগুণ্ঠিত পর্দা যত উন্মোচন করবে ততই সে অনুধাবন করতে সমর্থ হবে যে আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা- এই উপলব্ধিই তাকে আরো নিষ্ঠাবান মুমিন বানাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রথম ওহীতেই আল্লাহ শিক্ষার কথা বলেছেন। মূলতঃ জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ। এই উৎসের সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যে System টি গড়ে উঠবে তাই Islamization of knowledge.

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, এই সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে।

দীর্ঘ বিরতির পর শহীদ মালেকের ক্যাম্পাসে, মালেকের নবীন সাথীরা তাকে স্মরণ করলো, নতুন আঙ্গিকে। বিশ্ব রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন লবির ষড়যন্ত্রে দিকে দিকে মুসলিম জনতার উপর যে নির্যাতনের স্টীম রোলার চলছে, তা আজ নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে, মালেকের খুনীরা আর এই ষড়যন্ত্রকারীরা একই সুতোয় গাঁথা। লাখো প্রাণে প্রত্যয় দীপ্ত প্রেরণার মশাল জ্বালিয়ে প্রতিহত করতে হবে এই দেশীয় ও বৈদেশিক হায়েনাদের। আর এই প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে অহর্নিশ আমাদের হৃদয় আকাশে আলোকবর্তিকার মত কাজ করবে, শহীদ মালেক ও তাঁর কর্মময় আদর্শবাদী জীবন।

www.icsbook.info

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও শহীদ আবদুল মালেক

আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ

শিক্ষা কি?

শাব্দিক অর্থের দিক থেকে শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি Education. Education শব্দটি E, Ex, এবং Due শব্দগুলো থেকে এসেছে। শাব্দিক ভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় "Pack the information in draw the talents out" মূলতঃ এর অর্থ অবগতি বা জ্ঞান প্রদান এবং জ্ঞেয় বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। বস্তুতঃ মানুষকে মানুষ করার আয়োজনই শিক্ষা।

মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় এজন্য তাদেরকে কোন অতিরিক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। অথচ মানুষকে জ্ঞানসমৃদ্ধ হওয়ার জন্য একটি পরিকল্পিত কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। মূলতঃ মানুষই হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংঘবদ্ধজীব, এজন্যই তার এতো আয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। ইহজগতের অন্যান্য শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়, তার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও পরিবেশ ইত্যাদি তাকে হিতাহিত জ্ঞানের বিকাশে সাহায্য করে তাকে মানুষ ও পশুর মধ্যকার

www.icsbook.info

পার্থক্যগুলো শিখায়। শিক্ষাই মানুষকে ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়।

প্রত্যেক মানুষই তিনটি সত্তার সমন্বয়। দেহ, মন ও আত্মা এই তিনটি সত্তার সমন্বয়ে এক একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে, নানা সামাজিক প্রক্রিয়ায় তার মন বেড়ে ওঠে আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতার পরিগঠনের উপর। এজন্যই কবি মিল্টন বলেছেন- Education is the harmonious development of body, mind & soul. দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথও মিল্টনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।" সক্রেটিস কিংবা তার শিষ্য প্লেটোর মতে, 'নিজকে জানার নামই শিক্ষা'। কোন জাতির সন্তানগণকে সে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এক হবে না। কারণ প্রতিটি জাতির প্রয়োজন এক নয়, সংস্কৃতি এক নয়, আধ্যাত্ম চিন্তা এক নয়, সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচার এক নয়, বরং তা ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং শিক্ষা একটি সামগ্রিক বিষয়।

ইসলামী শিক্ষা কি?

মিশরীয় দার্শনিক Professor Muhammad Kutub তাঁর "The Concept of Islsmic Education" প্রবন্ধে বলেছেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচী যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।"

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত বিকাশের ফলে শিক্ষাকে নানা রকম বিভাজনের শিকার হতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারপরও শিক্ষা তার অখন্ডতা ও অবিভাজ্যতার ধর্ম পরিহার করেনি- সারা দুনিয়া আজ তার সাক্ষী।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কাঠামো

প্রায়শই এ দুটো কথাকে এক করে দেখা হয় এবং এটা একটা মস্তবড় ত্রুটি। যেকোন কাজের জন্য প্রথমে প্রয়োজন নীতির তারপরই আসবে তার কাঠামো বা ব্যবস্থা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকের দুনিয়া নীতি ও কাঠামোর তারতম্য যেমন ভুলে আছে তেমনি ভুলে আছে এ দুটোর প্রয়োগ। বাংলাদেশের কথাই যদি ধরে নিই তাহলে দেখা যাবে এখানে একটা স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। দেশে কয়েকটি শিক্ষা কমিশনও এজন্য হলো (কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, মজিদ খান শিক্ষা কমিশন ইত্যাদি)। কিন্তু সবশেষে কি হলো? শিক্ষানীতির ব্যাপারে কারোই বক্তব্য পরিষ্কার হলো না। সবাই শুধু শিক্ষা কাঠামো নিয়ে কথা বললেন, নীতি নিয়ে নয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি কাঠামোগত বিষয়ে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের মধ্যে শিক্ষার গুণ-মান কমতে বাড়তে পারে এর মৌলিক উদ্দেশ্যের কোন গতিবৃদ্ধি নেই। তেমনি জাতীয় উন্মুক্ত, আনুষ্ঠানিক, উপ বা আধা বা অনানুষ্ঠানিক যেকোন ধরনের কাঠামোতেই আপনি যান না কেন এতে শিক্ষার মূলগত তারতম্য নেই। এসব কাঠামোগত পরিবর্তন কেবলমাত্র পাস-ফেল ও ড্রপ-আউটের হার কমাতে বাড়াতে সহযোগিতা করতে পারে, মানুষের বাইরে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাতে পারে, কিন্তু ভিতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না। সারাটা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে অথচ পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দূরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সংকট (Crisis)

www.icsbook.info

মুকাবিলা করছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তসারশূন্য আয়োজন সেখানে ডিগ্রীর পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় নামী দামী ডিগ্রীর অভাব হচ্ছে না, ভৌতিক উন্নতির (Physical development) ঘাটতি হচ্ছে না, অর্থ-বিত্তের অভাব হচ্ছে না- অভাব হচ্ছে চিত্তের, মেধা ও মননের, মানবতাবোধ ও কল্যাণকামীতার, আস্থা ও নির্ভরতার। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এটা ছিল না। "Education does not necessaryly mean mere acquisition of Degrees and Diplomas. It emphasises the need for acquisition of knowledge to live a worthy life." অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্মানজনক জীবন যাপনের জ্ঞান অর্জন।

বৃটিশরা আড়াইশত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলিম দেশ শাসন করেছিল। তার আগে কমবেশী প্রায় সারাটা পৃথিবী মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। দুই আড়াইশ বছরের শাসনামলে ইংরেজদের সবচেয়ে বড় সাফল্য তাদের রেখে যাওয়া 'শিক্ষা ব্যবস্থা'। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শাসিত জনপদের মানুষের সাথে শাসক গোষ্ঠীর যোগাযোগ সুরক্ষার জন্য একদল কেরাণী, আমলা বা বেনিয়ান তৈরি। এর দ্বিতীয় ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল যদি কখনও এসব উপনিবেশ ছেড়ে যেতে হয় তাহলে তাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য এমন একদল লোক রেখে যাওয়া 'যারা নামে-ধর্মে যাই হোক না কেন আচার আচরণ ও সংস্কৃতিতে হবে ইংরেজ'- হয়েছেও তাই। বিষয়টি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত মুসলিম শাসক সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইংরেজদের রেখে যাওয়া ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘঁষে-মেজে চালিয়ে যাচ্ছেন, স্বাধীন দেশ ও জাতি সর্বোপরি মুসলিম জাতি সত্ত্বার উপযোগী কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেননি।

বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে কথাবার্তা হতে হতে একপর্যায়ে মুসলিম দেশসমূহের চৈতন্যে আঘাত লাগে এবং ১৯৭৭ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সম্মেলন হয় পাকিস্তানের রাজধানী শহর ইসলামাবাদে ১৯৮০ সালে, তৃতীয় সম্মেলন হয় ঢাকা মহানগরীতে ১৯৮১ সালে এবং ১৯৮৩ সালে চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতায়। উক্ত সম্মেলন সমূহে গৃহীত প্রস্তাবনাবলীর মাঝে দুটি প্রধান বিষয় হচ্ছে :

ক. বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করতঃ একটি মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তণ করতে হবে।

খ. বিভিন্ন ময়দানে বিশেষজ্ঞ তৈরির সুযোগ সম্বলিত এ অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে চরিত্রগতভাবে ইসলামী তথা এ ব্যবস্থা হবে ইসলামী চরিত্রের অধিকারী।

বিগত প্রায় শত বৎসর ধরে উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা কতিপয় সংকট অতিক্রম করছে যা নিম্নরূপ :

১. আদর্শিক সংকট। শিক্ষা ব্যবস্থার কোন আদর্শিক ভিত্তি স্থাপন না হওয়ায় একটি তথাকথিত সেক্যুলার শিক্ষা চালু আছে যা মূলত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্মহীন ও ধর্মবিদ্বেষী রূপে গড়ে তুলেছে।

২. এ শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে আল্লাহমুখী না করে এ বিষয়ে উদাসীন করে তুলছে।

৩. এ শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে পরস্পরের দুশমন হিসেবে পেশ করে। ইসলাম যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে সে ইতিহাস না শিখিয়ে শেখায়- ইসলাম বর্বরযুগের আইন, বিজ্ঞান ও প্রগতির অন্তরায়, সমাজ ও সভ্যতার পথে প্রতিবন্ধক- যা আদৌ সঠিক নয়।

৪. মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে সৃষ্টিজগতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক পরিচয় তুলে ধরে না। এটি ইহপারলৌকিক দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা সম্পর্কে মানুষকে বেখেয়াল করে দেয়।

৫. এর অপর বড় সংকট ইউরোকেন্দ্রীকতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস সবকিছুকে বিকৃতির হাতে সঁপে দেয়।

www.icsbook.info

৬. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন নৈতিক বন্ধন মানুষকে শিখায় না বরং নৈতিকতার বলগামুক্ত শিক্ষার দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার করে দেয়।
৭. এ শিক্ষা ব্যবস্থার অপর বড় সংকট কাঙ্ক্ষিত শিক্ষক সংকট।
৮. এছাড়াও রয়েছে শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ সংকট এবং সন্ত্রাসের দাপট। এসব সংকট থেকে মুক্ত একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের আন্দোলন চলছে বহু বৎসর ধরে। এই আন্দোলনকে আমরা এক কথায় ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন বলি।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস হাজার বৎসরের ইতিহাস। উপমহাদেশে একসময় মুসলিম শাসকগণ একটি ইসলামী শিক্ষা কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পরাজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে, শুরু হয় ইংরেজ শাসনের। ইংরেজ শাসনের সূচনার পর পরই নতুন করে আরেকটি আন্দোলনের সূচনা করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ)। তারই পথ ধরে ১৯৩৩ সালে মাওলানা মওদূদী (রহ) শুরু করেন বিংশ শতাব্দীর নতুন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন।

এই শিক্ষা আন্দোলনের পথ ধরেই বিগত প্রায় ৬০ বৎসর যে তাত্ত্বিক ও সামগ্রিক শিক্ষা সংগ্রাম তারই এক গোলামী অধ্যায় ১৯৬৯ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত। শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত এই আন্দোলনের নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে। তাঁর শাহাদাতের ৩৩ বৎসর পর তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে যে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে তা যেমন সময়োপযোগী তেমনি তাৎপর্যময়। বিশেষ করে শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাসে হত্যা ও সন্ত্রাসের যে কলঙ্কযুক্ত অধ্যায়ের সূচনা হয় তা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে আজ আবার আবদুল মালেকের কথা স্মরণ করা অতীব গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে।

১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট যারা আবদুল মালেককে নির্মমভাবে আহত করেছিল, তারাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে কলুষতা ও বিষবাষ্প ছড়িয়ে আমাদের অতীতকে কালিমা-লিপ্ত করেছে। তারা আজও শকুনীর মতো শিকার ধরে বসে আছে

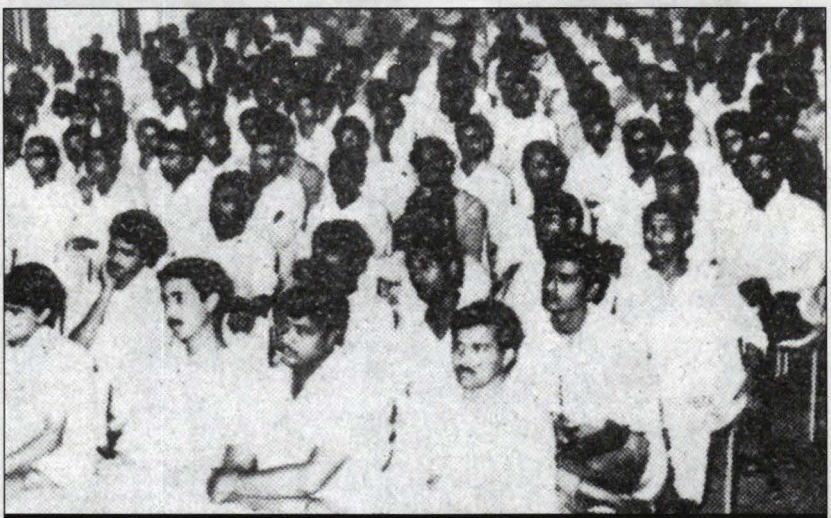

১২ আগস্ট ১৯৬৯ ডাকসু মিলনায়নে নয়া শিক্ষানীতির উপর আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। এখানেই শহীদ আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষানীতির উপর জোরালো বক্তব্য পেশ করেন

ছবি : পাকিস্তান অবজারভার ১৩ আগস্ট ১৯৬৯

www.icsbook.info

বাংলাদেশের আকাশে মেঘের ঘনঘটা সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্যে। এই প্রেক্ষাপটে বারবার মনে হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন ছাড়া আমাদের সামনে কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। যেন সেই শাশ্বত আদর্শের দিকে আহ্বান জানিয়ে আমরা আবার ওদের বলতে পারি- আবার তোরা মানুষ হ! সত্যি, মানুষের বড় অভাব চারিদিকে, বিশেষ করে আবদুল মালেকের মতো সুন্দর মানুষের অভাব তীব্র ও প্রকট।

বৃটিশগণ দীর্ঘদিন উপমহাদেশে শাসন জারী রাখার জন্য সর্বত্র সর্বাবস্থায় 'ভাগ করো শাসন করো' (Divide and rule) নীতি প্রয়োগ করে। বিভিন্ন জাতিগত বিরোধকে কাজে লাগিয়ে জাতিগত বিভাজন ছাড়াও ইংরেজগণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের মাঝেও একটি বড় ধরনের বিভাজনের আয়োজন করে। এই আয়োজনের সূচনা তারা করে একটি দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মধ্য দিয়ে। ইংরেজ প্রবর্তিত দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার বহুবিধ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১৮৩৫ সালে শিক্ষা নীতির মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে লর্ড ম্যাকলে লেখেন, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern : a class of persons Indians in blood and color but English in teste, in opinions, in morals and in intellect."

অপরদিকে শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান W.W. Hunter ইংরেজদের নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে The Indian Muslmans গ্রন্থে লেখেন, "আমাদের শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান ছেলের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।" 'এভাবে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুহাম্মদী যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের ধর্মে কোন রকম

১২ আগস্ট ১৯৬৯'র সেই নির্মম দৃশ্য। শহীদ আবদুল মালেকের ইসলামী শিক্ষানীতির উপর বক্তৃতার যুক্তিযুক্ত মোকাবেলা করতে না পেরে ইসলামের শত্রু ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের ঘাতকচক্র নৃশংসভাবে আহত করে, তিনি অচেতন হয়ে পড়ে আছেন সোহরাওয়ার্দী পার্কের মাঝে, এরপর তাঁর চেতনা আর ফিরে আসেনি।

ছবি : পাকিস্তান অবজারভার ১৩ আগস্ট ১৯৬৯

www.icsbook.info

হস্তক্ষেপ না করেই এবং তাদেরকে ধর্মীয় দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দিতে দিতেই ধর্মের প্রতি কম আন্তরিকতাপূর্ণ, কম গোঁড়া করে ফেলতে হবে।'

সহজ কথায় ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

১. এমন একদল লোক তৈরি করা যারা হবে মূলতঃ দোভাষী। ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য ও শাসন কার্যে স্থানীয় জনগণ ও তাদের মাঝে বুঝাপড়ার কাজটি এরা আঞ্জাম দেবে।

২. এমন একদল লোক তৈরি করা যারা নামে, রংয়ে হবে ভারতীয় কিন্তু সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক ও মূল্যবোধে হবে ইংরেজ। এরা হবে ইংরেজদের স্থানীয় প্রতিনিধি, মানসপুত্র, ইংরেজ চলে গেলেও যাতে তাদের মতই দেশ ও সমাজ পরিচালিত হয়।

৩. ঘরে ঘরে বিভক্তি আনয়ন। একদিকে একদল ইংরেজি শিক্ষিত সাহেব তৈরি করা যারা ধর্মীয় বিষয়ে থাকবে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অপরদিকে একদল ধর্মীয় শিক্ষিত লোক তৈরি করা যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক বিষয়ে অজ্ঞ থাকবে। এজন্য মাদ্রাসা ও টোল শিক্ষার ব্যবস্থাও চালু রাখে।

ইংরেজের গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী তাদের (ইংরেজদের) মানসিক গোলাম রয়ে যেতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীনতার পর (১৯৪৭) স্বাধীন দেশের উপযোগী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের দাবী উঠতে থাকে। এরই সাথে সাথে দাবী ওঠে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার। মূলত পাকিস্তানের মতো একটি মুসলিম দেশ ও এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও প্রয়োজনের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবী ছিল অপরিহার্য। এই দাবী আদায় হওয়ার আগেই সময়ের দাবী অনুযায়ী পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩১ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখানকার মানুষ পায়নি তাদের উপযোগী কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সন্ধান। সেই শিক্ষাব্যবস্থার দাবীতে আজও সোচ্চার এইদেশ, এই জনতা।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম পর্ব

রাসূলুল্লাহ (স) এর নবুওয়তের সূচনাই হয় শিক্ষা সংক্রান্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রতি প্রেরিত কুরআনের প্রথম অংশ হচ্ছে 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে। পড়, অতি দয়ালু তোমার রব যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না।'

আর রাসূল (স) হাদীসে বার বার তাকিদ দিয়েছেন শিক্ষার প্রতি। বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ।'

নবুওয়তের সূচনা থেকেই নবী (স) তাঁর সাথীদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদেশী ভাষা ইত্যাদির প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। দ্বীনের যে সমস্ত জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আসতো (আল-কুরআন), যা তাঁর প্রতি ইলহাম হতো (আল হাদীস) এবং যে সমস্ত জ্ঞান সমসাময়িক কালে উৎকর্ষ লাভ করেছিল- এর সব কিছুই যাতে করে সাহাবীগণ শিখেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি। বিশেষ করে মাদানী জিন্দেগীর সূচনা থেকে তা প্রাতিষ্ঠানিকরূপ গ্রহণ করে।

আল্লাহর নবীর প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সুফ্ফা' যা মসজিদে নববীর একটি অংশ। এখানে সাহাবীগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন, নবী করীম (স) ছিলেন এর অধ্যক্ষ, যায়েদ ইবনে সাবেত, উবাই ইবনে কা'ব আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ, উবাদা ইবনে সামেত (রা) প্রমুখ ছিলেন এর শিক্ষকমন্ডলী।

www.icsbook.info

মূলতঃ রাসূলের জমানায় মসজিদ কেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনানো, আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ, কিতাবের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রদান, তারা যা জানতো না তা জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

রাসূল (স) এর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও (৬৩২-৬৬২ খৃস্টাব্দ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল মূলতঃ মসজিদ কেন্দ্রিক। স্বয়ং খলিফাগণ ছিলেন জ্ঞানের প্রচার প্রসারে আত্ম নিয়োজিত। খলিফাগণ বায়তুলমাল থেকে শিক্ষকদের জন্য ভাতা চালু করেন।

মসজিদকেন্দ্রিক এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূলতঃ কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, ব্যকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ে পাঠদান করা হতো। এখানে তত্ত্ব ও আমল বিষয়ে সবিশেষ যত্ন গ্রহণ করা হতো।

দ্বিতীয় পর্ব

শিক্ষা ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মসলমানদের ব্যাপক উন্নতি ঘটে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের যুগে। উমাইয়া শাসনামলে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে মসজিদের পাশাপাশি মক্তব গড়ে উঠে। এসব মসজিদ ও মক্তবের শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বীনি জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন জাগতিক বিষয়েও শিক্ষাদান করতেন। এ সময়ে ধীরে ধীরে গ্রীক, কপটিক প্রভৃতি ভাষায় রচিত রসায়ন, চিকিৎসা,

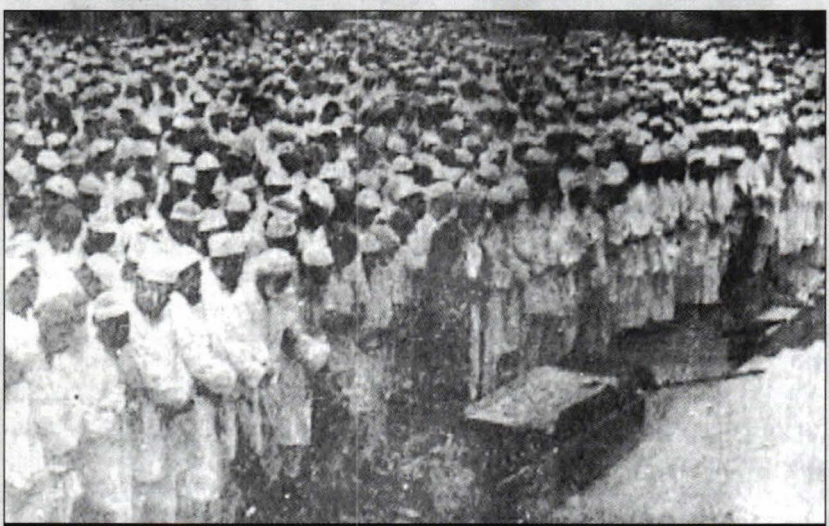

হাসপাতালে তৎকালীন পাকিস্তানের সেরা ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টার পরও শহীদ আবদুল মালেক তার অগণিত সাথীদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন পরম প্রভুর কাছে। তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় প্রিয় ক্যাম্পাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে

ছবি : দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ আগস্ট ১৯৬৯

ফলিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বই সমূহ আরবী ভাষায় অনুদিত হতে থাকে। মুসলিম শাসনামলের মাঝে আব্বসীয় শাসনের (৭৫০-১২৫৮ খৃস্টাব্দ) সময়েই শিক্ষাব্যবস্থা একটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ সময়ে শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল- শিক্ষা কাঠামো দাঁড় করানো, সিলেবাস বা কারিকুলাম তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটানো ইত্যাদি। এ সময়ে দু'স্তরের শিক্ষা চালু ছিল। প্রাথমিক স্তর যা প্রধানত মসজিদ মক্তব ও ধনী লোকদের ঘর কেন্দ্রীক ছিল- তাতে পঠন, লিখন, ব্যকরণ, কুরআন-হাদীস, প্রাথমিক গণিত, ভাবমূলক কবিতা ইত্যাদি পড়ানো হতো। এক্ষেত্রে মুখস্তের ওপর জোর দেয়া হতো।

www.icsbook.info

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কুরআনের ব্যাখ্যা, গবেষণামূলক পাঠ, হাদীসের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা, আইনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতির্শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যা অধ্যয়ন করা হতো।

সব পর্যায়ের লোকেরাই এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণ করতে পারতো। কারণ ছাত্রদের জন্য এসব ছিল অবৈতনিক বরং ছাত্ররা একটি বৃত্তি পেত। অপরদিকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ মুয়াল্লিম, মুয়াদ্দিব ও অধ্যাপক এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বেতন-ভাতা নির্ধারিত ছিল।

এ পর্বে মুসলমানদের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান মনীষার জন্ম লাভ হয়। আব্বাসীয় খলীফা আল মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন যাকে মধ্যযুগ ও আধুনিক বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বলা যেতে পারে। বায়তুল হিকমা সংশ্লিষ্ট বিশাল গ্রন্থাগারের গ্রন্থগারিক ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আল-খারিযমী।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের সময়ে কর্ডোভায় (৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়, মিশরে আল আজহার এবং বাগদাদে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোপ, আফ্রিকার হাজার হাজার ছাত্র ডিগ্রি লাভ করে আলোকিত হয়।

উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা

৭১২ খৃষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশেম সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করে উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান এলাকায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

৭১২ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় একহাজার বছরের ইতিহাসে মুলতান থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত মুসলিম শাসন ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলমানদের ঐতিহ্য অনুসারে যেখানেই তাদের পা পড়ে সেখানেই প্রথম গড়ে উঠে মসজিদ, মক্তব ও শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ। শিক্ষাক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদ (১০০১-১০৩০) এর অবদান বিরল। তিনি রাজধানী গজনীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশাল কেন্দ্রে পরিণত করেন। পরবর্তী শাসকদের মাঝে প্রত্যেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে আগ্রহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিশেষ করে কুতুবুদ্দিন আইবেক, সুলতান ইলতুতমিশ, জালালুদ্দিন খিলজী, গিয়াস উদ্দিন তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ্ তুঘলক, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, শেরশাহ্, সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাট শাহ জাহান, সম্রাট আওরঙ্গজেবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসময় মসজিদ, মক্তব, খানকা, মাদ্রাসা এ সবই ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। শাসকগণ নিজেদের সন্তান-সন্ততিকেও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন অপরদিকে সাধারণ দেশবাসীর জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে ভাতাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতেন।

মক্তব সমূহ ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য। এখানে কুরআন পাঠ ও ফারসী শিক্ষা দেয়া হতো। ফারসী ছিল দরবারের ভাষা। কুরআন শিক্ষা ও চরিত্রগঠন মূলক ফারসী বই, নামাজ আদায়ের নিয়মকানুন এ সবই ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিলেবাস। এ ছাড়া ছিল ফারসী ও আরবী মাদ্রাসাসমূহ সেখানে উচ্চতর বিষয় সমূহে পাঠদান করা হতো। এসব মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী নিয়ে লোকেরা শিক্ষকতায় যোগদান করতো এবং শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতো।

ইংরেজ শাসন শুরুর আগে উপমহাদেশে মুসলিম শাসকগণের নেতৃত্বে অসংখ্য মাদ্রাসা ও শিক্ষালয় গড়ে ওঠে। Sir Adam প্রণীত রিপোর্ট অনুযায়ী তখন বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্কুল ছিল। প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি স্কুল ছিল। তাঁর মতে উপমহাদেশে তখন ৮ রকম বিদ্যালয় ছিল যেমন- আরবি নতুন-পুরাতন, ফারসি মাদ্রাসা, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী, সংস্কৃতি ও বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি।

www.icsbook.info

ইংরেজদের হাতে ইসলামী শিক্ষার ধ্বংসলীলা

১৭৫৭ সালে ইংরেজগণ বণিকেরবেশ ছেড়ে শাসকের বেশ ধারণ করার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করে। জমিদারী কেড়ে নেয়ার পাশাপাশি সরকারী চাকুরী থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদের পরিবর্তে হিন্দুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মক্তব, মাদ্রাসা ও স্কুল পরিচালনার সাথে যুক্ত মুসলিম ধনী ব্যক্তিগণ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় ক্রমে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজ শাসনের প্রথম একশত বৎসর কালে মুসলমানগণ একদিকে শিক্ষাদীক্ষায় ইংরেজদের বৈষম্যের শিকার হয় অপর দিকে হিন্দু জমিদারদের অর্থানুকুল্যে গড়ে উঠা ইংরেজি স্কুলগুলোতে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের যাওয়ার পথও একরকম রুদ্ধ ছিল।

ইংরেজরা এসে দেখতে পায় ভারতের কোর্টের ভাষা ফারসী। প্রথমে ইংরেজগণ ১৭৮১ সালে ফারসি মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজনবোধ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একদল কর্মচারী তৈরি। এ উদ্দেশ্যে এ সময়ে 'কলকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন করা হয়। ১৮২৬ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি চালু করা হয়। অনুরূপ ৩টি মাদ্রাসা ১৮৭৩ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে স্থাপন করা হয়। এসব মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে সেক্যুলার শিক্ষা চালু করা হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ-সংশয় বৃদ্ধি পায়। তারা মাদ্রাসা সমূহ বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সরকারী কাজে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ফলে একদিকে মুসলিমগণ চাকুরীর আশায় সরকারী ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্তে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে অপরদিকে নতুন মাদ্রাসা তৈরির কাজ স্তিমিত হয়ে আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা আন্দোলন

প্রথম ধারা

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে মুসলিম শাসনের পরাজয়ের পরই শুরু হয় মুসলমানদের নবতর প্রতিরোধও স্বাধীনতার লড়াই। এই লড়াইয়ের প্রধান পথিকৃত পুরুষ ছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী (রহ)। মুজাদ্দেদে আলফেসানীর আন্দোলন থেকে মূলমন্ত্র গ্রহণ করে তিনি একদল চরিত্রবান, ত্যাগী ও কোরবানীর মানসিকতা সম্পন্ন লোক তৈরির জন্য দিল্লীতে একটি বড় মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

এ মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসেন উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাঈল শহীদ, বাংলার শহীদ তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখ প্রায় একশত বছর ধরে সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ইংরেজের ভীত কাঁপিয়ে তোলেন।

১৮৫৮ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর পরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং উপমহাদেশে সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাকামী জনতার উপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টীম রোলার। ফলে ১৮৭০ সালের দিকে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। এ কঠিন ও জটিল সময়ে আল্লামা কাশেম নানুতুবী শাহ ওয়ালি উল্লাহর শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী পূনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়াপত্তন করেন। পর্যায়ক্রমে সাহারানপুর, শাহী মুরাদাবাদ ও মীরাটে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।

এসব মাদ্রাসার ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তারপরও বলতে হবে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে

www.icsbook.info

এদের অবদান অনেক বড়। গ্রামে-গঞ্জে এদের মন্ত্রে দীক্ষিত হাজার হাজার আলেম উলামা দ্বীনি শিক্ষা ও জযবা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। এ ধারার শিক্ষা আন্দোলনের সাথে জড়িতগণের একটি বিরাট অংশ জিহাদের পথ পরিহার করেন, পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করেন যা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। পূর্বসূরীদের পথ থেকে তারা অনেক দূর সরে আসেন।

দ্বিতীয় ধারা

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমানদের মাঝে নতুন চিন্তাচেতনার জন্মলাভ করে। সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জাতিগঠন, অধিকার ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমানদের এগিয়ে নেয়া ও নতুন ধারার আজাদী আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৮৬৩ সালে বাংলার নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' গঠন করা হয়। সিপাহী বিপ্লবোত্তর এটিই মুসলমানদের নিজস্ব প্রথম সংগঠন। হিন্দুদের একচেটিয়া ইংরেজ প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের প্রেক্ষপটে এই সোসাইটি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ইংরেজদের আনুকূল্য লাভের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সময়েই মহসিন ফান্ডের টাকায় হুগলি কলেজকে সরকারীকরণ, কলকাতা মাদ্রাসার উন্নয়ন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন ও মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

একই সময়ে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসেন সৈয়দ আমীর আলী যিনি ১৮৭৮ সালে রাজনৈতিক সংগঠন 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ শুরু করেন ঐতিহাসিক আলীগড় আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে এগিয়ে নেয়া। ১৮৭৫ সালে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ডের অনুকরণে 'আলীগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করেন যা পরবর্তীতে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এসব আন্দোলন মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি, নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ও দেশের নতুন আইন কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে অন্য জাতি থেকে পিছিয়ে না পড়ার চেতনা জাগিয়ে তোলে যদিও এর মাধ্যমে যতটা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিকৃতি এসেছে দ্বীনের ব্যাপারে।

এ পর্যায়ে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গড়ে উঠে কওমী মাদ্রাসা, পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনা ও ইংরেজিকে ধারণ করে গড়ে ওঠে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে বৃটিশের চালু করা সরকারী মাদ্রাসা। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা যা পার্থিব জগতে নেতৃত্ব দেয়ার মতো একদল দ্বীনি যোগ্যতা সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করবে তা চালু করার কাজ হারিয়ে যায় ইতিহাসের অন্তরালে।

ফলে ইংরেজদের 'ভাগ করো শাসন করো' নীতি বরাবরই বহাল থাকলো। একদিকে একদল 'সাহেব' অপরদিকে একদল 'হুজুর' তৈরির কাজ অব্যাহত থাকলো।

তৃতীয় ধারা

এ ধারাটি জন্ম দেন উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃত বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী (রহ)। ১৯৩৩ সালে তিনি তাঁর সম্পাদিত 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকায় আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ পরিক্রমা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সত্যিকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব ও পরামর্শ পেশ করেন।

www.icsbook.info

১৯৪০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচী হলে 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংসদ' আয়োজিত ছাত্র সভায় বক্তব্য প্রদানকালে মাওলানা মওদূদী বলেছিলেন- যে ধরনের গাছ লাগানো হবে সে ধরনের ফল পাওয়া যাবে। তাঁর দাবী ছিল আগামী প্রজন্মকে দেশের চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের উপর। ১৯৪১ সালের ৫ জানুয়ারি দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা, লাখনৌর ছাত্র সমিতির অধিবেশনে মাওলানা মওদূদী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন সেখানে তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করেন।

এ ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালে ভারতের পাঠানকোটে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত শিক্ষা সংস্কার কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। পরবর্তীতে একই বছরে কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মওদূদী কর্তৃক প্রস্তাবিত 'পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা' বাস্তবায়নের সুযোগ স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই দিনগুলোতে না থাকলেও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক স্বাধীন দেশের অস্তিত্বের সাথে সাথে তার সম্ভাব্যতা দেখা দেয়। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগণ সেদিকে নজর না দেয়ায় জাতি তাদের কাছ থেকে তার কিছুই পায়নি, পেয়েছে কেবল বঞ্চনা, হতাশা ও অবিমৃষ্যতা।

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও তার ফলাফল

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হয় এবং ১৯৪৯ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ মাওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিটি গঠন হয় যা ১৯৫১ সালে রিপোর্ট পেশ করে। এভাবে ১৯৫৪ সালে আতাউর রহমান খান কমিশন, ১৯৫৮ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৬ সালে বিচারপতি হামদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৩ সালে ডঃ এস. হোসাইনের নেতৃত্বে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, ১৯৬৯ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে 'নতুন শিক্ষানীতি' নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটি বিভিন্ন রকম প্রস্তাবনা পেশ করেন যার অধিকাংশই শিক্ষা কাঠামো সংক্রান্ত কিছু কিছু প্রস্তাবনায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গলদ তুলে ধরা হয় ও ইসলামিয়াত চালু, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় চালুর প্রস্তাব করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রস্তাব প্রস্তাবই রয়ে যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই সরকার ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশন ১৯৭৪ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। এ কমিশন একটি ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সুপারিশ করে। আল্লাহর অশেষ রহমতে ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তনের ফলে দেশের মানুষ এই জঘন্য সুপারিশমালার বিষফল থেকে রক্ষা পায়।

১৯৭৬ সালে জিয়ার শাসনামলে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যভূক্ত করে। মাদ্রাসা শিক্ষায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে 'শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদ একটি অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি তৈরি করে যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়।

১৯৮৩ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'মজিদ খান কমিটি'। এটিও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ তুলে ধরে। এতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও

www.icsbook.info

ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় যা ১৯৮৮ সালে রিপোর্ট পেশ করে।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালে সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হলো 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২' প্রণয়ন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যক্রম জোরদার করা যার ফলে বই পুস্তকে ইসলামী ভাবধারার লেখা কমে যায়।

১৯৯৭ সালে সরকার প্রফেসর এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে যারা ডঃ কুদরত-ই-খুদা প্রণীত ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামান্য পরিবর্তন পরিমার্জন করে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। এ সুপারিশ বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বেই সরকার পরিবর্তিত হয়।

দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই সুপারিশ বাস্তবায়ন না করে সরকারকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে।

নূর খান শিক্ষা কমিশন : ছাত্র ইসলামী আন্দোলন

পাকিস্তান আমলের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় অবসর প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে। নূর খান শিক্ষা কমিশন অতীতের শিক্ষা কমিশন সমূহের রিপোর্ট, তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা, ঐ সমস্ত রিপোর্টের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থায় আনীত পরিবর্তনসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। এই কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি নিয়েও মতবিনিময়, জনমত জরিপ ইত্যাদি পরিকল্পনা করে।

তৎকালীন ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের বলিষ্ঠ সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘ' ইতিপূর্বে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, তাদের ব্যর্থতা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেশ ও জাতির জন্য উপযুক্ত একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি দীর্ঘ

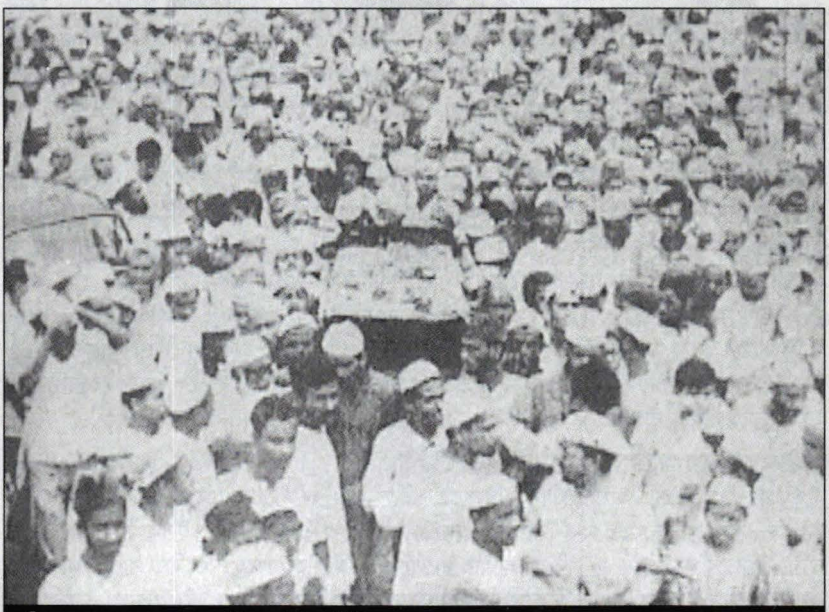

শহীদ আবদুল মালেকের লাশ নিয়ে সাথীদের মিছিল

ছবি : দৈনিক আজাদ ১৬ আগস্ট ১৯৬৯

www.icsbook.info

পর্যালোচনার পর পাকিস্তানের জন্য উপযুক্ত একটি শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার খসড়া প্রণয়ন করে।

১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে নুর খান শিক্ষা কমিশনকে সামনে রেখে ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রতিনিধি দল কমিশনের সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করে, কমিশনের উদ্যোগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার খসড়া পেশ করে।

২ আগস্ট ১৯৬৯ সালে National Institute of Public Administration (NIPA) জনমত সংগঠনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 'শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তৎকালীন বামপন্থী ও ইসলাম বিদ্বেষী সংগঠন সমূহ বরাবরই নুর খান শিক্ষা কমিশন-এর বিরোধিতা করে আসছিল। তারা বুঝতে পারছিলো যে এই কমিশনস্থ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তান যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে অর্জিত হয়েছিল দেশ সে আদর্শের দিকে ধাবিত হবে, আগামী প্রজন্ম ইসলামী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে প্রস্তুতি নিবে। সেজন্য তারা ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করে এ প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তব্য রাখে। ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎকালীন ঢাকা মহানগরী সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রির সেরা ছাত্র আবদুল মালেক। আবদুল মালেক তাঁর কর্মীদের সহ NIPA-র আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করতে যান। মাত্র পাঁচ মিনিট তিনি সে আলোচনা সভায় কথা বলার সুযোগ পান।

ইতোপূর্বে যারা বক্তব্য রেখেছিলেন আবদুল মালেকের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তাদের সকলের যুক্তিকে হার মানিয়ে দেয়। আলোচনা সভার চেহারা মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে বামপন্থীদের মাথা ঘুরে যায়। যুক্তির কাছে হেরে তারা শক্তি প্রয়োগে উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে ডাকসু কর্তৃক ১২ আগস্ট ১৯৬৯ সালে আরো একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বামপন্থী ছাত্র-শিক্ষকগণ এই সভার আয়োজন করে। তারা এ সভায় আবদুল মালেক এবং তাঁর সাথীদের কোন রকম অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবদুল মালেকও ছেড়ে দেয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে T.S.C-তে যান। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে তৎকালীন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে ঘিরে ফেলে। আবদুল মালেক সঙ্গীদেরকে T.S.C-থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সবাই একে একে চলে গেলে ইসলাম বিরোধী শক্তি তাঁর ওপর হামলা চালায়।

আবদুল মালেককে তারা পার্শ্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তখন রেসকোর্স ময়দান নামে পরিচিত ছিল) নিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে। এক পর্যায়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে রড ও ইট দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে তাঁকে জর্জরিত করা হয়। এ অবস্থায় হায়েনারা সটকে পড়ে। বাতাসের গতিতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকায়। মালেক ভাইয়ের সাথীরা ছুটে এসে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। ১২ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের সেরা ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার হুঁশ ফিরে আসেনি। ১৫ আগস্ট সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে চলে যান। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

শহীদ আবদুল মালেক : আমাদের বাতিঘর

উপমহাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে শহীদ আবদুল মালেক একাই একটি চির ভাস্বর অধ্যায়। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হলো এদেশের ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে। তাঁর শাহাদাত ঘরে ঘরে জন্ম দিলো হাজার মালেকের। আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ অকুতোভয় সৈনিক শহীদ মালেক নীরবে নিভৃতে যে সাধনাময় জীবন গড়ে ছিলেন তাঁর পরশে এসেছিলেন খুব লোকই। তাঁর শাহাদাতের ফলে সারাদেশের ইসলামপ্রিয় তরুণদের সামনে উজ্জীবিত হলো

www.icsbook.info

এক নতুন জীবন। এক প্রেরণাময় তরুণের কর্মময় জীবনের অজানা অধ্যায়।

১৯৪৭ সালে বগুড়া শহরের অদূরবর্তী থানা ধুনটের খোকসাবাড়িতে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের ৫ ছেলের সর্বকনিষ্ঠজন আবদুল মালেক জন্মলাভ করেন। আশৈশব বিদ্যানুরাগী আবদুল মালেক খোকসাবাড়ি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর মেধা সকলকে মোহিত করে। কৃতিত্বের সাথে গ্রামের স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণী পাশ করে তিনি গোসাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গোসাইবাড়ি স্কুলে পড়ার সময় তিনি মৌলভী মহিউদ্দিন সাহেবের ছেলের সাথে থেকে পড়ালেখা করতেন। তাঁর জীবনে মহিউদ্দিন সাহেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার মহিউদ্দিন সাহেবের ছেলে বেলাল ছিল তাঁর প্রিয় সাথী। অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে আবদুল মালেক বগুড়া জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ স্কুল থেকে তিনি ১৩তম স্থান অধিকার করে এস.এস.সি উত্তীর্ণ হন। ইন্টারমিডিয়েট তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করে পাস করেন।

রাজশাহী থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে আবদুল মালেক দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণরসায়ন বিষয়ে ভর্তি হন। এখানকার প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করেন। ১ম স্থান অধিকার করেন। শাহাদাতের সময় তিনি ছিলেন অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র।

স্কুল জীবনে মৌলভী মহিউদ্দিন সাহেবের সংস্পর্শে এসে আবদুল মালেক ছাত্র সংঘ সম্পর্কে অবহিত হন। রাজশাহী কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি সংগঠনের খুব বেশী অগ্রসর কর্মী ছিলেন না। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তিনি দ্রুত সংগঠনে এগিয়ে আসেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি সংগঠনের সদস্য হন। ঢাকা মহানগরীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শাখার সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন এবং নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য নির্বাচিত হন।

আবদুল মালেক শাহাদাত বরণ করার আগে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের প্রবাহ ছিল এক রকম আর তাঁর শাহাদাত সে প্রবাহকে করেছে সমুদ্রের উর্মিমালার মতো বেগবান। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ছিল একদল বিবেকবান তরুণের উপলব্ধির প্রত্যয়দৃপ্ত আন্দোলন কিন্তু তাঁর শাহাদাতের সাথে সাথে সেই আন্দোলন রূপ নেয় বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখো তরুণের হৃদয়াবেগের আন্দোলনে। পত্র-পত্রিকায় তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষিত তরুণ এই বলে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'একজন ইংরেজ শিক্ষিত আধুনিক তরুণ যদি ইসলামী শিক্ষার জন্য জীবন দিতে পারে, আমি কেন পারবো না?'

শহীদ আবদুল মালেকের নেতা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আবদুল মালেকের স্মৃতিচারণে এভাবেই বলেছেন, "তুমি পরে এসে আগে চলে গেছো, আল্লাহর দরবারে অনেক বড় মর্যাদায় ভূষিত হয়েছো। তাই তোমাকে বড় ঈর্ষা হয়। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বস্ত সাথী হিসেবে, একনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর দরবারে তোমার শাহাদাত কবুলের মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে নেতা মেনেছি। তোমার কর্ম তৎপরতা, আত্মগঠনে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, সাংগঠনিক শৃংখলা ও আনুগত্যের প্রশ্নে সতর্কতা ও ন্যায় নিষ্ঠার যে উদাহরণ তোমার জীবন থেকে আমি পেয়েছি তা সাধ্যমত নিজে অনুসরণ করা ও অন্যকে অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করাকে আমার নৈতিক দায়িত্ব মনে করেছি।"

তাঁর অপর এক প্রিয় সাথী অধ্যাপক এ.এন.এম.এ. জাহের আবদুল মালেক সম্বন্ধে লেখেন, "শহীদ আবদুল মালেক এখন শহীদের মিছিলের 'নাজমুস সাকিব'।"

১৯৬৯ সালে আবদুল মালেক শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে আরো অনেক ভাই তাঁর পথ

www.icsbook.info

ধরে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছেন। মহান আল্লাহই ভালো জানেন শহীদদের কাকে তিনি কিভাবে পুরস্কৃত করবেন। তবুও আমরা আমাদের চোখ ও মন দিয়ে ঘটনা প্রবাহের ব্যাপারে কিছু উপলব্ধি করি। সেই ক্ষুদ্র উপলব্ধিতে শহীদ আবদুল মালেক বিগত ৩৩টি বছর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনের আকাশে 'সত্যিকারের এক নাজমুস সাকিব'। বার বার তাঁর কথাই উচ্চারিত হয়, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। এভাবেই তিনি ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে যে নেতৃত্ব T.S.C. থেকে শুরু করেছিলেন তা আজও অব্যাহত রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের বর্তমান কর্মীদের জন্য আবদুল মালেকের আদর্শ

আমরা যারা বর্তমানে শহীদ আবদুল মালেকের উত্তরসূরী হিসেবে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে ব্যাপৃত ও ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে আগ্রহী তাঁর ছাত্রজীবন ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক জীবনের যেটুকু পরিচয় তাঁর রচনায় প্রকাশিত, ব্যক্তিগত পত্রাবলী, দায়িত্বশীল ও সঙ্গীদের লেখায় পাওয়া যায় তার আলোকে যে সব কাজ আমরা করতে পারি সে বিষয়ে আমার প্রস্তাবনা নিম্নরূপ :

১. ব্যাপক অধ্যয়ন, জ্ঞান অর্জন

শহীদ আবদুল মালেক কুরআন, হাদীস ইসলামী সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্যের গভীর সমুদ্র মন্থন করে নিজেকে জ্ঞানের বর্মে সাজিয়ে ছিলেন। যার কারণে বেলাল বা মহিউদ্দিন সাহেবকে লেখা তাঁর চিঠি, পৃথিবীতে লেখা তাঁর প্রবন্ধ, শিক্ষাশিবির বা পাঠচক্রে দেয়া তাঁর বক্তব্য, এমনকি NIPA-য় দেয়া পাঁচ মিনিটের বক্তব্য প্রতিটি বিষয়ই ছিল জ্ঞানগর্ভ, প্রভাব বিস্তারকারী। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত এই-ই হচ্ছে একদল 'মানুষ' তৈরির অনানুষ্ঠানিক কার্যকরী আয়োজন।

শহীদ আবদুল মালেক সাধারণ পোশাক পরতেন, ছেঁড়া সেন্ডেল পায়ে পথ চলতেন, অথচ পথের মাঝে কোথাও একটি ভালো বই পেলে তা নিতে বিলম্ব করতেন না।

ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের এক সময়কার সিপাহসালার মীর কাশেম আলী সাহেবের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে নসিহত করেছিলেন এই ভাষায়, "এ আন্দোলনের সদস্য যদি হতে হয় তবে জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে যাতে করে সার্বিক চেতনা ও অনুভূতি নিয়ে এ আন্দোলনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যায়।" শহীদ আবদুল মালেক অনেক কম বয়সেই সেই অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছিলেন।

২. ক্লান্তিহীন পরিশ্রম

আবদুল মালেক ছিলেন একদিকে একজন অসাধারণ মেধাবী ও ভাল ছাত্র, অপরদিকে একজন দরদী ও পরিশ্রমী দায়িত্বশীল নেতা। তিনি যত না কাজ করাতেন তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ নিজে করতেন। সারাদিন সংগঠনের কাজ শেষে নিজের কাপড় কাঁচতেন, হলে এসে রুম পরিষ্কার করতেন, গভীর রাত পর্যন্ত পড়তেন, মেহমানদের বিছানায় রেখে পত্রিকা বিছিয়ে ইট মাথায় দিয়ে ঘুমাতেন, আবার ফজরের আজান হলে সবাইকে ঘুম থেকে জাগাতেন। এই ক্লান্তিহীন পরিশ্রম ব্যতিরেকে অন্যদের সামনে নিজেকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। সংগ্রামের চেতনায় শহীদ আবদুল মালেক কতটুকু শাণিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বেলালকে লেখা চিঠিতে :

"বেলাল, তোমরা ছোট, এখনও অনেক কিছুই অজানা। আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। তাই আমাদের বুকটা টনটন করে ওঠে। আমার বুকের ব্যথাটা যদি তোমাদেরকে জানাতে পারতাম! ভাই, জিন্দেগীর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা। তোমাদের মালেক ভাই।"

আজ মালেকের উত্তরসূরীদের মাঝে এই বুকচেরা আর্তনাদ খুঁজে পাওয়া যায় কি? T.S.C.-এর সভাস্থলে আহত হওয়ার পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন কাজ পাগল এক মানুষ।

www.icsbook.info

৩. ইসলামী জীবনাদর্শের উজ্জ্বল প্রতীক

আবদুল মালেক শাহাদাতের আগে থেকেই ছিলেন আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাদের একজন। একজন বেটে খাটো কালো রংয়ের মানুষ, পোশাকে-আশাকে নিতান্তই সহজ-সরল জৌলুসহীন, কিন্তু কথায়, কাজে আচরণে তিনি ছিলেন এক সোনার মানুষ।

তাঁর কথায় প্রাণের ছোঁয়া, ঈমানের ছোঁয়া পাওয়া যেতো, তাঁর বক্তৃতায় অন্তরের দরজা খুলে যেতো। তিনি বৃষ্টিধোয়া রাতের আঁধারে কর্মীদের জন্য নির্মিত বাঁশের পায়খানা আপন হাতে ঠিক করতেন, বন্যার্ত মানুষের ঘরের চাল নিজ হাতে মেরামত করতেন- এসবই ছিল তাঁর ঢাক-ঢোল বিহীন নীরব কর্মতৎপরতা। এজন্য তিনি তাঁর কর্মীদের জন্য ইসলামী জীবনাদর্শের এক উজ্জ্বল প্রতীক। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের এমন একদল মানুষ দরকার যারা তাদের জীবনে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব নমুনা তুলে ধরবেন।

৪. ১৫ আগস্ট : একটি দিন একটি ইতিহাস

১৯৬৯ সালের ১৫ আগষ্টে শহীদ আবদুল মালেক শাহাদাত বরণ করে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। সমগ্রদেশবাসী জেনেছে- মানুষ তার মতামত চাপিয়ে দেয়ার জন্য কত নিষ্ঠুর হতে পারে। তারা এও জেনেছে- সত্যের সংগ্রামে বিজয়ী বীররা কিভাবে হেসে হেসে জীবন দিতে পারে। আবদুল মালেকের শাহাদাতের পর বিষয়টি জাতীয় ইস্যুতে রূপ নিয়েছে। তার আগে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী এত জনপ্রিয় কোন দাবীতে পরিণত হয়নি। পাকিস্তানের প্রতিটি পত্রিকা আবদুল মালেকের শাহাদাতের খবর গুরুত্বের সাথে ছাপে এবং সম্পাদকীয়তে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে :

"আবদুল মালেক বাহিরের কোন গুন্ডার আক্রমণে প্রাণ হারান নাই। হারাইয়াছেন তাঁহারই মত ছাত্রের হয়তো বা সহপাঠীর নিষ্ঠুর হস্তের নির্মম আক্রমণে। ছাত্র তরুণের শুভবৃত্তি এই কি বিকাশ? ------ এই প্রসঙ্গের ছাত্র সমাজকে আজ আত্মানুসন্ধান করিয়া অশান্তি ও হানাহানির সর্বনাশা পথ পরিহার করিতে এবং সর্ব প্রথমে শিক্ষায়তনের অ্যাকাডেমিক পরিবেশ রক্ষা করিতে অনুরোধ জানাই।" দৈনিক আযাদ।

"আবদুল মালেককে শুধু এ অপরাধেই শহীদ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী। তিনি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থনে আওয়াজ তুলেছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব ইসলামেরই অবদান, এখানে অন্য কোন আদর্শ কিংবা জীবন দর্শনের ঢোল পিটানো খোদ পাকিস্তানের মূলেই কুঠারাঘাতের সমতুল্য। পাকিস্তানে ১০ কোটি আবদুল মালেক বাস করে। এর ক'জনকে শহীদ করা সম্ভব হবে?" দৈনিক মাশরিক-করাচী।

এ ধরনের আরো বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। আবদুল মালেকের শাহাদাত এই ভাবেই ১৫ আগস্টকে এক গুরুত্বপূর্ণ দিবসে পরিণত করে। বিগত ৩৩ বৎসর ধরে প্রতিটি ১৫ আগস্ট দেশের অগণিত মানুষ আবদুল মালেকের জন্য দোয়া করে, শিক্ষা দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, স্মারক প্রকাশিত হয়- নতুন করে শপথে বলীয়ান হয়।

৫. কেবল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই পারে ঘরে ঘরে আবদুল মালেকের জন্ম দিতে

বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার কাছে শহীদ আবদুল মালেক একটি অতি প্রিয় নাম, একটি জীবন্ত আদর্শ। সবাই স্বপ্ন দেখে নিজের আদরের সন্তানকে শহীদ আবদুল মালেকের আদর্শের ছাঁচে তৈরি করতে। তাঁর মতো মেধা ও মননে, চরিত্রে ও আমলে অনন্য রূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু সে স্বপ্ন এমনি এমনিই সফল করা সম্ভব নয়। সে জন্য চাই দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।

অতীত থেকে চলে আসা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পঙ্গু ও ভঙ্গুর দশা থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বীন ও দুনিয়ার এক জগাখিচুড়ী মিশ্রণ দিয়ে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও আমরা একরকম

www.icsbook.info

মিশ্র চরিত্রের মানুষে পরিণত করছি। তারা নামাজও পড়ে, রোজাও রাখে আবার সুদও খায়, ঘুষও দেয়, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজীর আশ্রয়ও নেয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে আবদুল মালেকের কাঙ্ক্ষিত সমাজ কায়েম সম্ভব নয়।

এ জন্যই চাই এক চূড়ান্ত আদর্শিক বিপ্লব। সেই বিপ্লব যা বাংলাদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্ম দেবে, যে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিককে ইসলামের সৌন্দর্যে তৈরি করার জন্য ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করবে।

উপসংহার

শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের পর Young Pakistan-এর সম্পাদকীয় টানা হয়েছিলো উর্দূ কবির একটি কবিতার লাইন দিয়ে আর তা ছিল- "শহীদ কী জো মওত হায় ও কওম কি হায়াত হ্যায়।"- শহীদের যে মৃত্যু তা জাতির নব জীবনের সূচনা। শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে এই বাংলার মুসলিম তরুণরা মরা জীবনে নতুন করে যৌবনের সন্ধান লাভ করে। আজও সেই জীবন প্রবাহই আমাদেরকে জাগিয়ে রেখেছে। আমাদের সময়কার শিল্পীর গান বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় :

"মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের রক্ত রাঙা পথে, শাব্বির হামিদ আইয়ুব ওরা জেগেছে এক সাথে।"

১১৭ জন শহীদের কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের অসংখ্য মর্দে মুজাহিদ কর্মী মালেক ভাইয়ের রেখে যাওয়া আদর্শের পতাকা ধারণ করে প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন দিনের, নতুন বিপ্লবের জন্য। আবদুল মালেকের সাথীদের কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব জাগিয়ে তুলুক বাংলার সমস্ত ঘুমন্ত জনপদ, ওদের রক্তে ধুয়ে জেগে উঠুক এক নতুন বিপ্লবের সুন্দর সোনালী প্রভাত।

গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূচী

১. উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস; দি প্রিমিয়ার বুক হাউস, লাহোর ১৯৭৮।
২. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯।
৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, শিক্ষা ব্যবস্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ; ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৮৫।
৪. ডঃ মোহাম্মদ লোকমান, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত ও ইসলামী মূল্যবোধ : একটি তুলনামূলক আলোচনা ; স্মারক, ইসলামী শিক্ষা সেমিনার, ১৯৯২। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৫. জাতীয় শিক্ষা সেমিনার স্মারক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ১৯৮৭, ১৯৯৭।
৬. সূরা আল-আলাক : আয়াত ১-৫।
৭. হযরত ওমরের প্রশাসনিক পত্রাবলী ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।
৮. মালিক ইবনে আশতারের প্রতি হযরত আলীর চিঠি ; ইরানী কালচারাল সেন্টার, ১৯৮২।
৯. আ.জ.ম ওবায়েদুল্লাহ ; জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান, ২০০২।
১০. ছাত্র সংবাদে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধসমূহ ; ১৯৮৪-২০০২।
১১. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, 'আমার প্রিয় সাথী' আবদুল মালেক স্মৃতি সংকলন, ১৯৮৪।
১২. আবদুল মালেক স্মৃতি সংকলন, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা মহানগরী, ১৯৯৭।
১৩. রক্তে ধুয়ে আসে মুক্তি ; শাহাদাত স্মরণিকা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ, ১৯৯৮।

লেখক : ছাত্র উপদেষ্টা, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

www.icsbook.info

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ

Islamization *in* Higher Education

An Integrated Approach

M. Zohurul Islam FCA

Introduction

It is said that 'Education builds a nation'. Non can deny the truth of the statement. In fact the characteristics of a nation in its different aspects owe no more than its education system. Empirical studies and historical evidences reflect the truth of the statement in the records of the development of civilization of every nation. The decline and fall of a culture also originates from the failure of the system of education in its capacity to hold on the spirit of dynamisms and need of the social change with time. By and large it is evident that active commitment to a faith plays a very significant role in shaping the destiny of a nation. Drawing example from the Nizamia University of Baghdad which included subjects from theology to medicine during the Abbaside Caliphate it can be safely concluded that the religious basis of the learning system can produce the integrated personality required for an allround development of an individual as well as a nation. Because religious basis offers a divine philosophy of life which is followed by policy prescriptions in every aspect of pristine life and living. Denying the authority of a comprehensive code

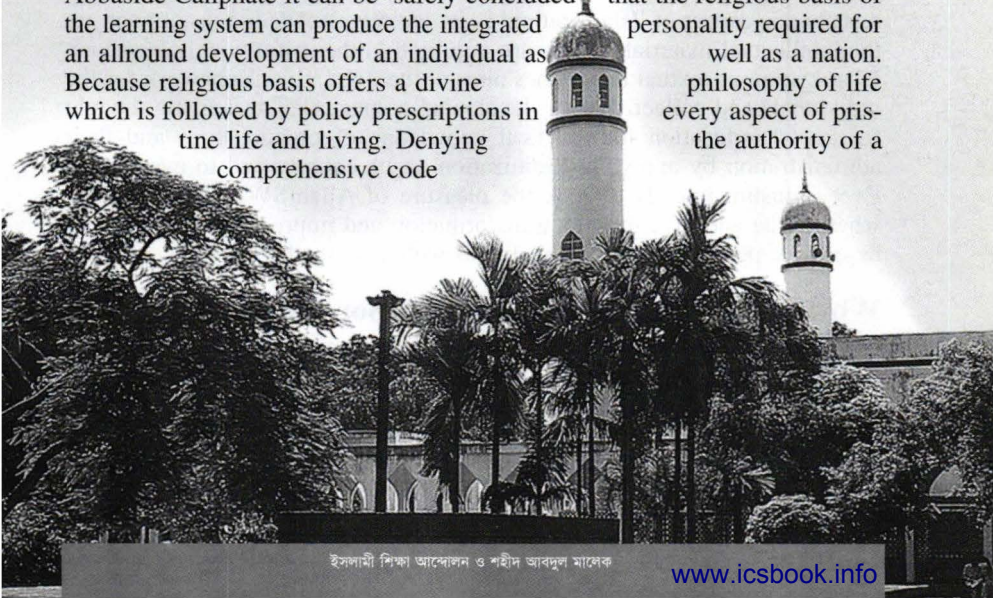

www.icsbook.info

of religion in the different walks of life is a sufficient cause for the derailment of a nation. According to Stanly Hull `If you teach your children the three R's (i.e Reading, Writing and Arithmetic) and leave the fourth R (i.e. Religion), you will get a fifth R(i.e. Rascality)'. The western socio economic and cultural anarchy demonstrate the truth of the statement.

What does Islamization mean

The term 'Islamization' is a very comprehensive one in breadth and length. From philosophical point of view, it encapsulates a process of commencement of an action program which is logical, ingenuine, puritan and welfare oriented. Anything that is good and brings about welfare of man connotes to the spirit of Islamization. The objective of Islam is the welfare of man in this world and hereafter. Imam Ibn Qayyim writes. "The objective of the shariah (Islam) is wisdom and welfare. Anything that departs from wisdom to folly, from generosity to misery, from welfare to hardship has nothing to do with the shariah".

Thus the concept of 'Islamization' makes the general impression of goodness, purity and piety. In case of Islamization of education, the concept indicates the process of organizing the thought and action of a man through education which inter-alia connotes to reorganize the system of education on the pristine philosophy and principles of Islam. The uniqueness of Islamic ethics is its capacity to organize the human personality on an universal, comprehensive and infallible path. The program of Islam is to build up a culture, a civilization and that the potential of its scope has no parallel. This unending comprehensiveness is the essence and foundation of the Islamic Shariah. In fact, the strict enforcement of shariah depends upon proper acculturation of superb qualities of man which in reality is its presupposition and without which it is unthinkable to produce the exact result. This acculturation in a process of accommodation, absorption and development reaching a pinnacle of success in the form of equilibrium of socio-politics and justice.

It should be explicit in every mind that the 'Islamization of Disciplines' represents one aspect of 'Islamization' in its entirety. Academic disciplines are the intellectual materials which are imported in the institutional classroom. Islamization of textual disciplines aims at the normative framework for the individuals and collectivity for developing a sound and systematic thought for action, education for practical knowledge of organizations and their administration by applying 'Islamization' in its entirety and to everything. Every muslim intends to seek the pleasure of Allah(SWT) by practicing what is true and just, through transformation and improvement, to achieve happiness, peace, security in this life as well as in the hereafter.

Why 'Islamization' of Disciplines is Sought for

Islamization of disciplines is of fundamental importance and is the ladder through which ascendancy to Islamization of everything is possible. It is therefore of fundamental importance and is 'concerned with thought, ideology and a normative and ideational human pattern and how such a pattern, its constitutions, its roots in reason, psyche, and conscience may be built'. This actually senses the Islamization of academic programmes as the pre-

www.icsbook.info

requisite of a foundation for building the superstructure of the ummah in order to form its individual and collective outlook on life and for developing both its ideological and practical aspects.

Unfortunately the ummah of Islam is far away from the glory of success and at present compared with the world around stands at the lowest ladder, humiliated in all respects being colonized for centuries together. And after a continuous series of bloody wars the ummah became independent bearing the legacy in education, economy, politics and even culture. The house of ummah is also divided into nation states fighting each other, divided internally, fighting sectarian fights, plunging into poverty, ignorance and backwardness of all kinds. What is the remedy of this state of colossal catastrophe?

The muslims were to be an united body in the true sense of the term. And we can look on its state of unity at the oddest ordeal of Jewish invasion on the Quds and continuous aggression and threats on Palestine and some other potential muslim countries

There can not be any doubt that the educational-intellectual and epistemological decline of the Islamic Ummah is the core of these curses. The educational institutions based on the western secular and alienated values are the breeding places of all kinds of social diseases. Schools, colleges, and universities process and practice the philosophical, social, political and cultural paradigm of the west. And thus they are in most cases against the Islamic norms and values. Muslim youths are severed from their legacy, glory and past achievement and are caught with inferiority complex, always shrunk and suspicious. Their will force is blunted with doubts and suspicion and the deviation from the ethical education system has injected in their body-politic senses of recession, inferiority, crisis and chaos.

The state of education system is the core of this worst situation. This is why Islamization of education is the serious most need of the hour as a starting point of the regeneration of the Ummah". And this is the point of time when according to Mahathir Muhammad, "We should re-organize our political, social and economic life in a way that fully incorporates the injunctions of Islam to ensure that a socially healthy, politically coherent and economically efficient and vigorous Ummah will emerge to understand the underlying dynamic relevance of these injunctions in contemporary society and to work out the process of their implications in practice, in the actual spiritual need of the Ummah. And continuing on the subject Mahathir reiterated that 'The plan for critical examination of the modern discipline in light of vision of Islam is essential for the future of Ummah."

Therefore fundamental questions need to be asked on the contemporary development of every disciplines in the west and every muslim intellectual trapped within the psycho-conceptual constraints of secular, anti-religious and somewhere antagonistic paradigms and academic disciplines- needs text books, journals, researches in each discipline that enable them to question the very basis of the present approaches of the west on the one hand and relate the teachings of Islam to modern problems ?

The assertion of Dr. Mahathir shows that the demand for Islamization of education was no longer confined in the academic circle. It has become the

www.icsbook.info

concern of all peoples, institutions and even governments as is in the case of Pakistan, Malaysia etc.

A strategy for Islamization of their education

Thus two issues come up to the root of the whole problem a) lack of strong ideological value Judgments and b) positive and constructive directions towards an ideal life. In addition, the division of education between Madrasa and Mundane has posed the most unpalatable consequence for the ummah. In such a situation, there is no alternative to a fundamental shift from the current secular system. The best alternative, Islamization in academic disciplines, has also been suggested in different Muslim education conferences. The question is how to foster the package of Islamization of disciplines? The two systems the madrasah and the modern have gone too far to combine. In academic institutions, these diverging disciplines are required to be housed in one single premise and to be organized in a systematic manner to fit into the curriculum of studies in different subjects with current relevance. The components include technical, ideological and holistic elements which form the basis of developing the paradigm of complete Islamization. These components will have two dimensions, the identification of the subjects to be undertaken for studies; the areas to be covered in all such subjects to meet the ideological, practical and spiritual needs. In this connection, the current level of paradigm in different disciplines can be studied for pragmatic assimilation of thoughts and ideas of different streams. Since Islam is action-oriented, the disciplines are to be so designed that can actualize the goal of Islam in making the mind of the pursuant of the disciplines to implement the mission of Islam.

In the paradigm of Islam, the studies of Anthropology, Sociology, Psychology, Economics and Business Studies and even natural sciences will have to be integrated to produce a man with human, technical, administrative and spiritual qualities so that the concepts of economic man, social being and rational man are reduced into one -the Islamic man.

The experience of the west in re-organizing their system may offer a fillip to these efforts. The western liberal civilization has given on surface such surmomentable malaise that are warranting a major shift of their education towards moral, spiritual and religious basis. Meanwhile the primary education of England has been placed under the sponsorship of churches. The secondary education is accordingly expected to follow on. If this trend continues in Great Britain, the example will be ultimately followed in other nations of the west.

This trend has given a positive edge to the reformists of education in the Muslim countries of the ummah including Bangladesh.

For the realization of the Islamization moves in Bangladesh, like any other country of the Ummah in order to yield the full benefit of it, certain strategy must be laid down. The work is a stupendous and ambitious one. Therefore a phase wise program may be rational and proactive. We are in need of mastering the fundamental principles of Islam, the Islamic legacy and acquire the proper knowledge of contemporary development in social and applied sciences. We used to be adequately acquainted with the Islamic

www.icsbook.info

vision, its ideological and methodological notion before confirming any stage of educational action program can be visioned in a foreseeable future. Nonetheless, in the phasing of Islamization of disciplines, several stages can be contemplated.

a. Mastery of modern sciences. This means that Muslim students and scholars of modern sciences must have command over those sciences. They are required to understand the historical circumstances in which they flourished in order to know their methodology. They will have to know the critical, analytical and objective aspects of those sciences in their Western perspective and in the light of actual Islamic view point.

b. Mastery of legacy: This is required to squeeze benefit from the common human heritage, to assimilate those disciplines and represent them in their proper perspective, so that they should serve Islamic ideology, Islamic vision and ideals in the current age.

To achieve this purpose the Muslim scholars must have to acquire mastery over the fundamentals of Islam as embodied in the Quran and sunnah. They must have an adequate understanding of the various issues of Islamic texts that relate to their respective fields. Such command may be achieved by studying selections from the legacy to all branches of sciences, art and culture, society and civilization. In this way, it will also be possible to integrate diverging streams and disciplines to achieve the objectives of education.

Defining the work Plan

If can be conceived well that such an achievement as stated above is not an easy job. It is hard, arduous, evolutionist in nature and comprehension. It requires a fundamental transformation of objectivity, methodology, subjective issues from the beginning. The work-plan is therefore should be carefully defined, developed and implemented. It requires a long term plan with short run components.

The work plan may be developed as follows:

1. The development of Curriculum should be actualized from an integrated approach and from the beginners' course.
2. Development of courses and preparing of study materials as class room texts containing due ethical value judgments and technology.

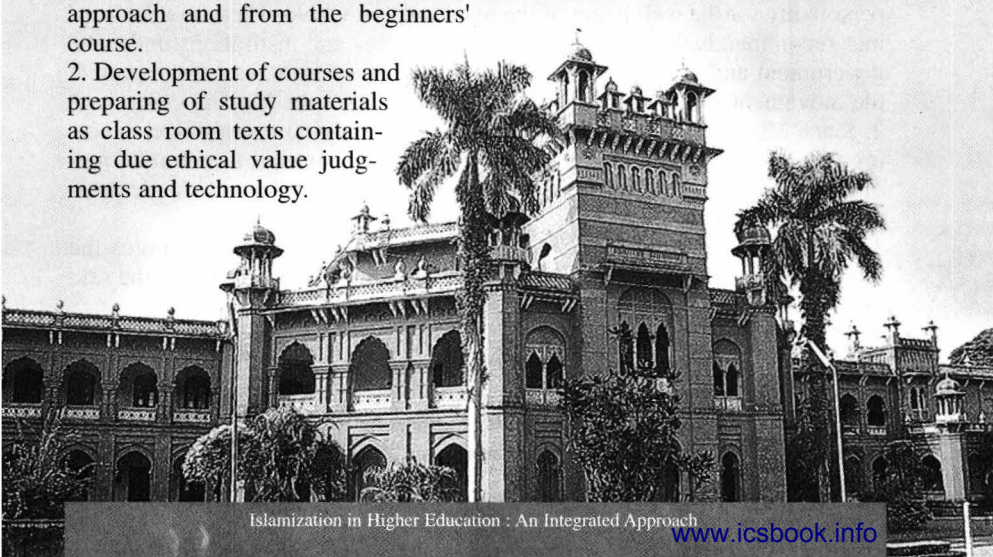

www.icsbook.info

3. Training the teaching faculties of all levels and for this purpose comprehensive courses for different levels are required to be developed for application in the teachers training institute.
4. Provisioning of institutional facilities for those activities in order to reach the objectives of the Islamization of education program should be carried out. Since the total activities require a determined political commitment and the governments can only provide those facilities, this seminar should aim at emphasizing the role of govt. creating awareness among the people as well as of its officials to rise to the issues with utmost seriousness. This is very vital for planning by the government to foster required change and transformation not only in infrastructure but also in courses, training methods and all other concerned issues.
It is encouraging to note that the present government constituted an 'Education Reforms Committee' to address the urgent issues. The Committee have submitted a report. It is hoped that the outcome of report will lead to go a long way towards the Islamization efforts.
This seminar also hopes to create awareness among the teachers and faculties to understand the depth of their problems and their responsibilities to take initiatives in order to create an environment for implementing the work plan as a real antidote to the social diseases. They are expected to be imbibed with necessary Islamic vision related to their fields.
For quite a few years the educational institutions in Bangladesh particularly in higher education the Universities are found to be marred with violence, strikes creating an atmosphere of restlessness resulting in the loss of huge teaching-hours and session jams. This issue needs to be seriously noted. Serious thinkers and educationists are emphasizing on banning politics in the educational institutions by both the teachers and the students . The issue should be seriously discussed and arrive at a plan for the solution.

Recommendations

1. From the above discussion we can safely conclude that Islamization of education movement can only ensure the development of balanced human personality for the well being of the mankind as a whole. Therefore the seminar recommends that all the concerned agencies and institutions under the government and non-government sectors should sponsor, assist and protect the movement for Islamization of education all over the Muslim countries.
2. Since Mecca declaration in 1979 incorporates a vital resolution concerning the introduction of Islamic education in OIC countries, the seminar recommends that all the Muslim governments should implement the declaration in the respective countries.
3. Bangladesh being a signatory to the declaration, the seminar urges the government of Bangladesh in particular to comply with the terms of the said declaration.
4. The seminar also recommends that there should be a National Education Commission in each muslim country constituting of highly reputed academicians from both private and public sector universities including madrasha to watch and monitor the development of the implementation of Islamization of education in all the Muslim countries.

www.icsbook.info

5. The seminar recommends that the dual system of education in Muslim countries should be abolished and integrated comprehensive education system including technical, general, madrasha should be introduced. The establishment of international Islamic University of Malaysia should be replicated in all other Muslim countries on national basis.
6. The seminar opines that the politics by students and teachers in the educational institutions particularly in higher education has been responsible for violence, killing, strike and consequent session jam jeopardizing the purpose of education and inflicting heavy financial and teaching hour loss .Therefore the seminar recommends the banning of teacher-student politics as working part of national political parties.
The seminar urges the government to implement the recommendations of the Education Reform Committee recently constituted by the government.

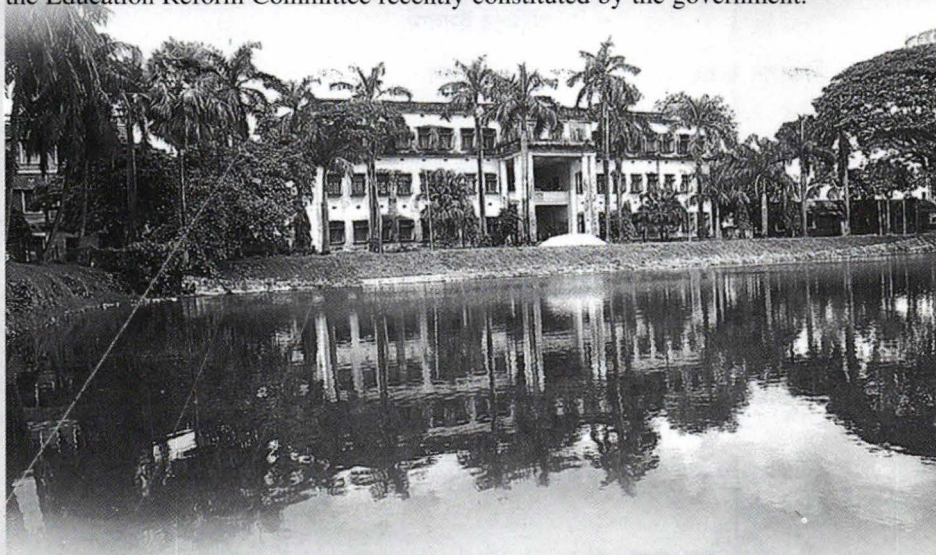

Conclusion

The situation in the educational institutions of the Muslim countries, particularly in Bangladesh, specially in higher learning centers such as universities and colleges as stated above immediately call for rethinking over the whole issue as outlined above. The conscious cross-sections are realizing the gravity of the situation. But, seemingly, due to the lack of vision, ignorance of the means of action, no serious initiative for over all change is forthcoming. Since the problem is stupendous, this cannot be solved easily and instantly. Yet initiatives should be forthcoming both from the people and the government immediately, so that the dawn of an Islamic revival throughout the ummah can be dreamed in a foreseeable future.

Writer : Secretary General, Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka.

www.icsbook.info

প্রেরণার বাতিঘর

স্মরণিকা উপ-কমিটি

লেখা সংগ্রহ	:	মাকসুদুল হক কানন শেখ মাহাবুব রহমান আল্লামা ইকবাল সাইফুল ইসলাম
অর্থ	:	মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন আমিনুর ইসলাম
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ	:	সগীর হোসেন হামিদুল হক আফতাবুজ্জামান আবু সাঈদ সরদার
প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ	:	শরীফ উদ্দীন এস.এম নূর-ই-ইলাহী আনোয়ার সা'দাত
স্মৃতিচারণ সংগ্রহ	:	মোহাম্মদ আখতার হোসেন সাইমুদ্দিন খন্দকার হাসিব
প্রেস	:	রফিকুল ইসলাম মাহবুবুল আলম আশিকুজ্জামান

www.icsbook.info

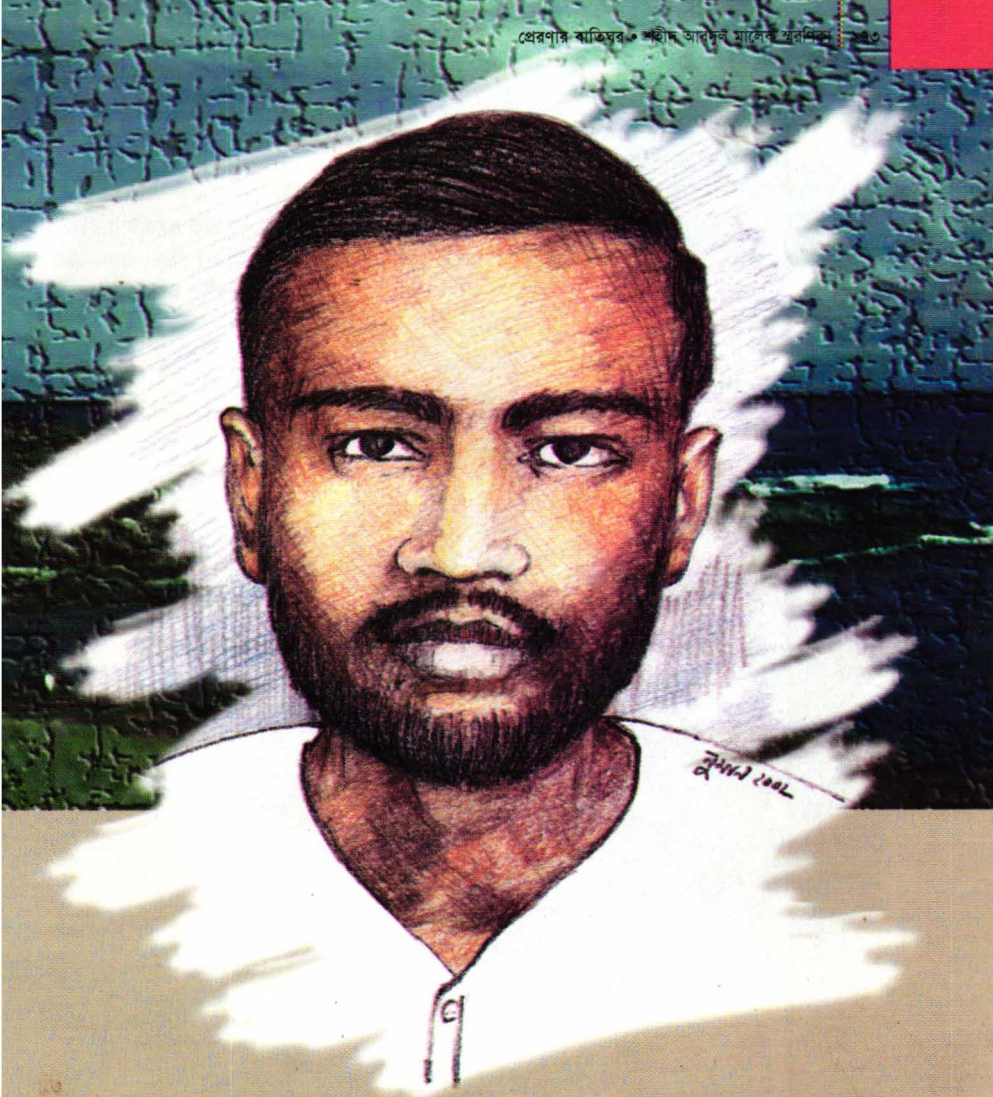

শহীদ আবদুল মালেক

স্মৃতি এ্যালবাম

www.icsbook.info

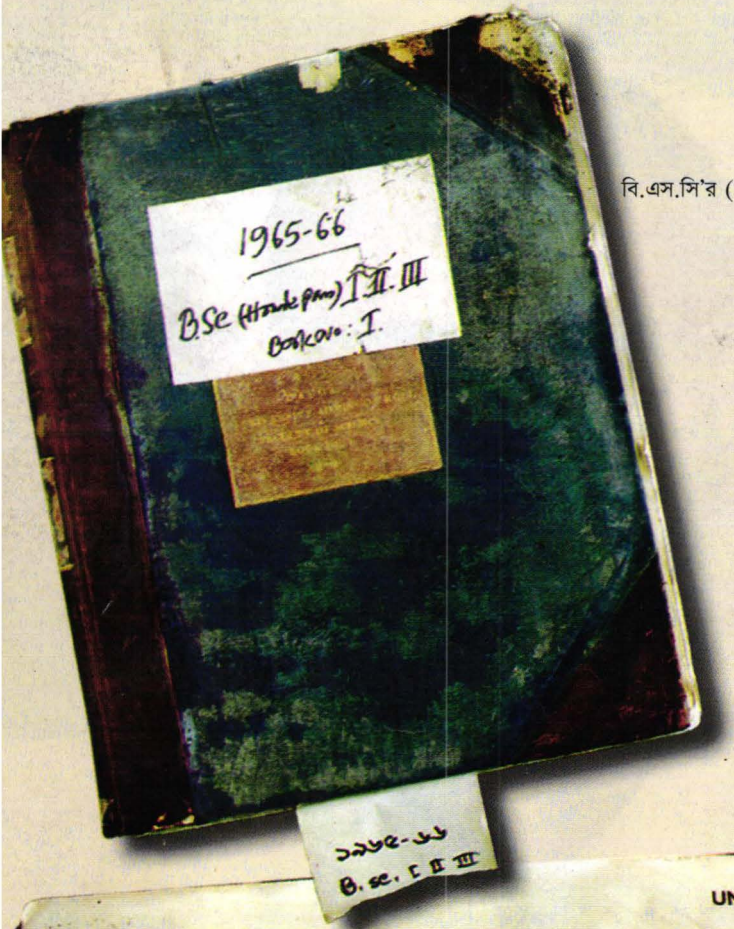

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ভর্তি রেজিস্টার বইয়ে
বি.এস.সি'র (১৯৬৫-'৬৬) প্রথম ছাত্র
শহীদ আবদুল মালেক

www.icsbook.info

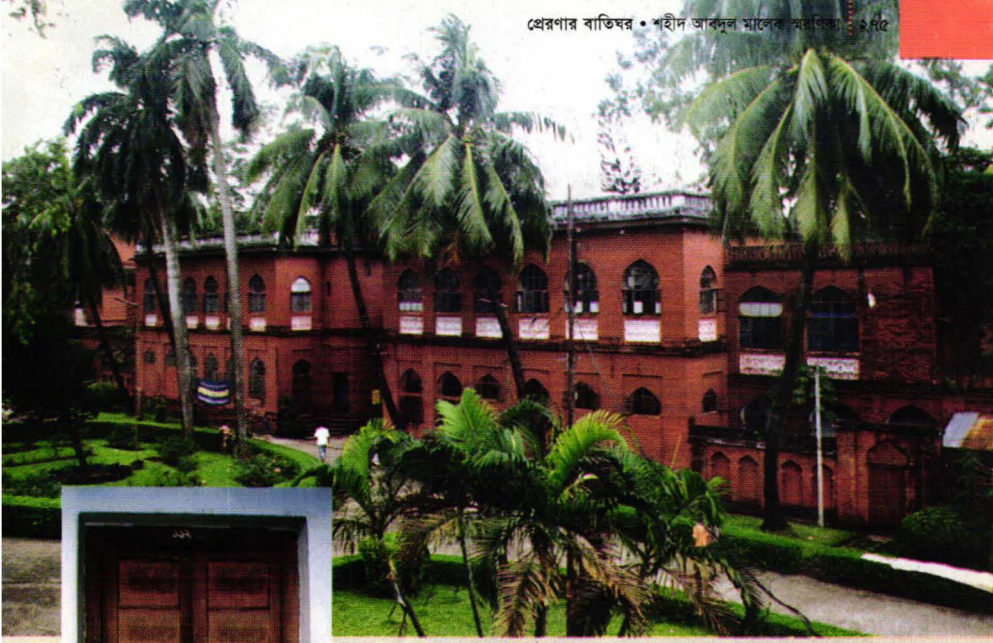

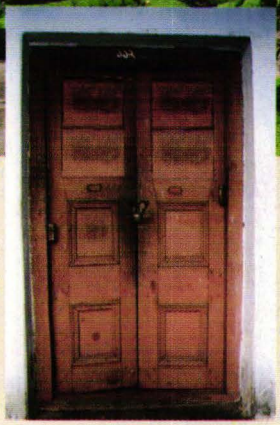

শহীদ আবদুল মালেক ছিলেন ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র, ইনসেটে তাঁর ১১২ নং রুম যে রুমের তিনি তাঁর জীবনের বিশেষ একটি সময় অবস্থান করেছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিজনেস স্ট্যাডিজ ভবন, তৎকালীন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নিপা) ভবন। এখানেই তিনি ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন

www.icsbook.info

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন (টিএসসি)

মালেক ভাইয়ের স্মৃতি বিজড়িত প্রাণ-রসায়ন বিভাগ

টিএসসি অডিটরিয়াম, এখানেই শহীদ আবদুল মালেক তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন

www.icsbook.info

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান)

রেসকোর্স ময়দানের ঠিক এখানেই তথাকথিত প্রগতির দালাল ইসলামের শত্রুদের হামলায় আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণকালের অন্যতম মেধাবী ছাত্র শহীদ আবদুল মালেক

www.icsbook.info

মানিকপটল গ্রাম, শহীদ আবদুল মালেকের গ্রাম

খোকশাবাড়ি গ্রামের এই বাড়িতে শহীদ আবদুল মালেক জন্মগ্রহণ করেন

www.icsbook.info

মানিকপটলে শহীদ আবদুল মালেকের বাড়ি (পুনঃনির্মিত)

শহীদ আবদুল মালেকের বাড়ির সামনের দৃশ্য

www.icsbook.info

খোকশাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানে শহীদ আবদুল মালেক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অধ্যয়ন করেন। (স্কুলটি ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত)

গোসাইবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পুনঃনির্মিত) যেখানে শহীদ আবদুল মালেক তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন

www.icsbook.info

গোসাইবাড়ি এ.এ. উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে শহীদ আবদুল মালেক ষষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণী অধ্যয়ন করেন

বগুড়া জেলা স্কুল। যেখানে শহীদ আবদুল মালেক ৮ম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেন

www.icsbook.info

বগুড়া জেলা স্কুল মুসলিম ছাত্রাবাস

শহীদ আবদুল মালেকের জায়গীর বাড়ি (মহিউদ্দিন সাহেবের বাড়ি)

www.icsbook.info

মানিকপটলে শহীদ আবদুল মালেকের বাড়ির পাঠকক্ষ

এখানেই চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবদুল মালেক (খোকসাবাড়ি গ্রামে শহীদ আবদুল মালেকের কবর)

www.icsbook.info

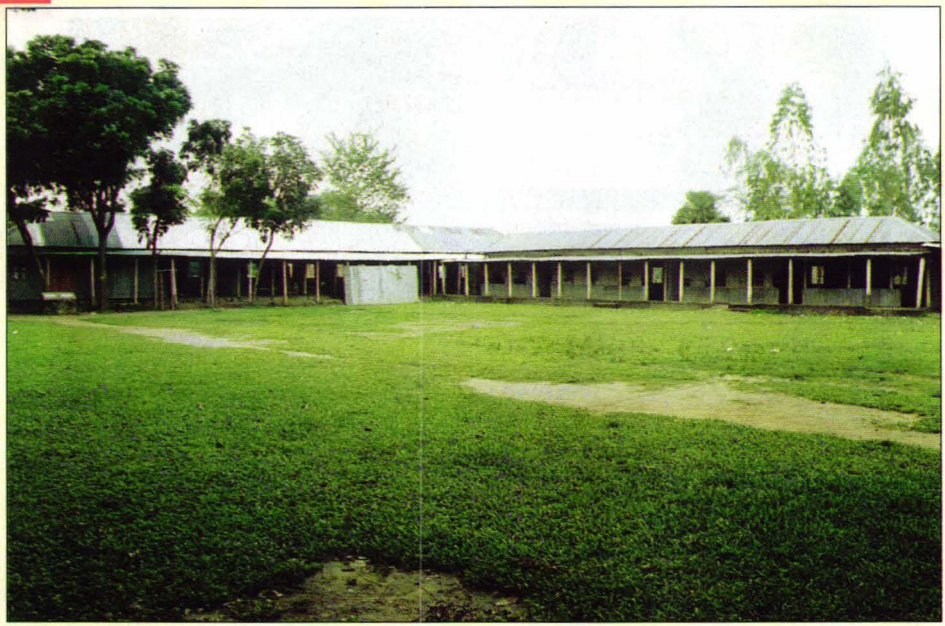

শহীদ আবদুল মালেক ট্রাস্ট পরিচালিত ধুনট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

বাড়ির পাশের মাদ্‌রাসা (মানিকপটল দাখিল মাদ্‌রাসা)

www.icsbook.info

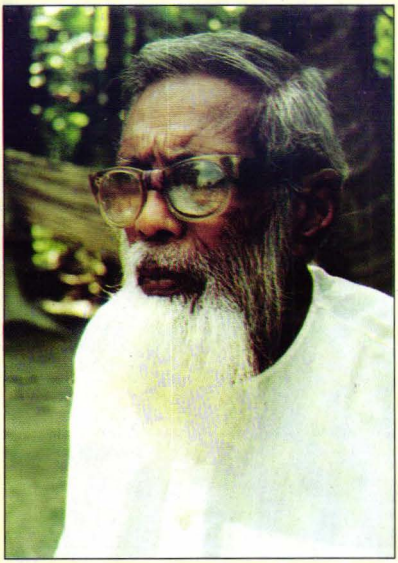

মোহাম্মদ আবদুল খালেক
(শহীদ আবদুল মালেকের বড় ভাই)

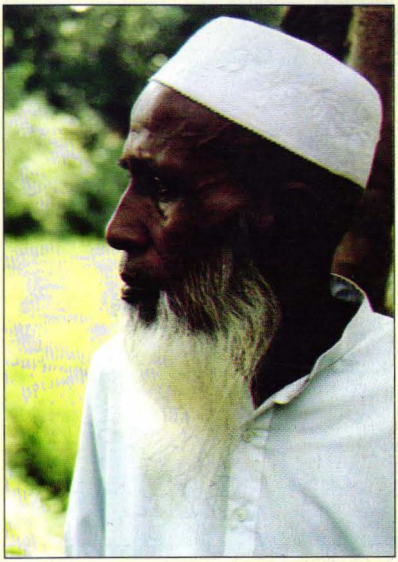

মোহাম্মদ আবদুল কাদের
(শহীদ আবদুল মালেকের বড় ভাই)

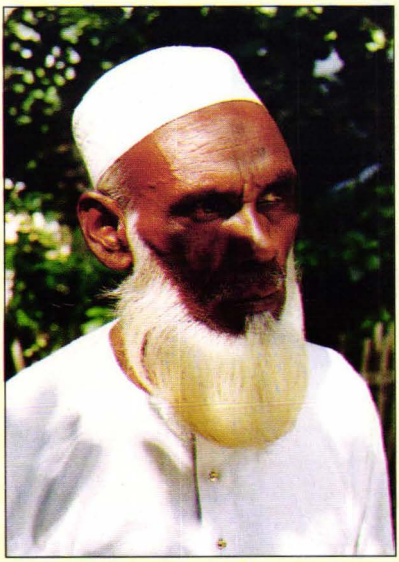

মোহাম্মদ আবদুল বারী
(শহীদ আবদুল মালেকের বড় ভাই)

আয়েশা খানম
(শহীদ আবদুল মালেকের ছোট বোন)

www.icsbook.info

মোহাম্মদ আবদুল জলিল সরকার
(খোকশাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

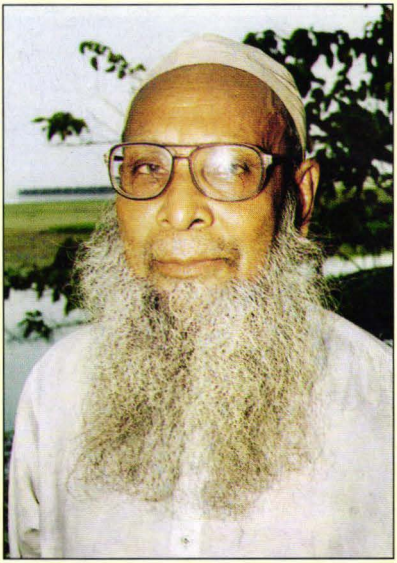

মোহাম্মদ তসলিম উদ্দিন বি.এসসি
(গোসাইবাড়ি এ.এ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

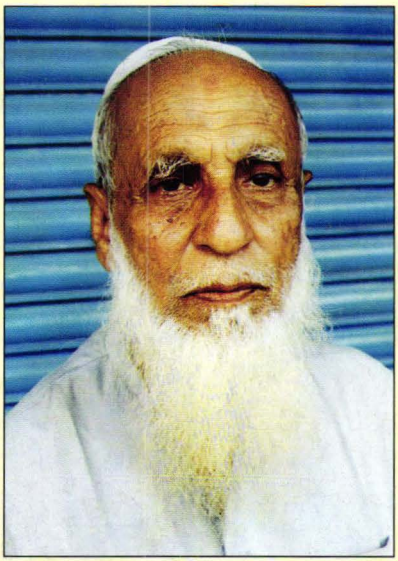

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বি.এড, বি.পি.এড
(গোসাইবাড়ি এ.এ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

www.icsbook.info

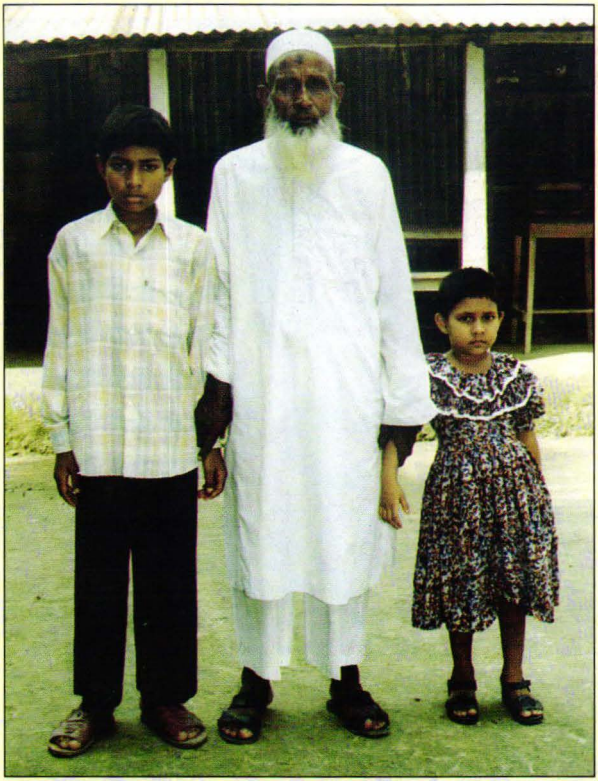

দুই নাতির সাথে শহীদ আবদুল মালেকের বড় ভাই মোহাম্মদ আবদুল খালেক

শহীদ আবদুল মালেকের বড় ভাই মোহাম্মদ আবদুল বারী (পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে)

www.icsbook.info

শহীদ আবদুল মালেকের ছোট বোন, তার স্বামী এবং দুই পুত্র

শহীদ আবদুল মালেকের দুই ভাতিজা বামে আবদুল বাসেত (বগুড়া জেলা সভাপতি '৯৩-'৯৫), ডানে মোহাম্মদ ফজলুল হক (বর্তমান জেলা সভাপতি-বগুড়া দক্ষিণ)

www.icsbook.info